আলো আঁধার

ভদ্রেশ্বর মন্ডল

-ঃ প্রাপ্তি স্থান ঃ-

সাহা বুক ষ্টল

৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

●

অমরজ্যোতি বুকষ্টল

ষ্টল নং ৬৯ই, ১নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

●

অভয়া বুক এ্যাণ্ড গিফ্‌ট সেন্টার

আমতা চৌরাস্তা, রামসদয় কলেজের সামনে

পোঃ - আমতা, জেলা - হাওড়া-৭১১৪০১

❑ **প্রথম প্রকাশ ঃ**
২৫শে মার্চ, ১৯৬০

❑ **প্রকাশক ঃ অভয়া বুক এ্যাণ্ড
গিফ্‌ট সেন্টার**, আমতা চৌরাস্তা,
রামসদয় কলেজের সামনে,
পোঃ আমতা, জেলা - হাওড়া,
পিন - ৭১১৪০১

❑ **মুদ্রণ ঃ কম্পিউটার হাউস**,
আমতা সাহাপাড়া,
আমতা, হাওড়া।

❑ **প্রচ্ছদ ঃ সন্দীপ দেয়াসী**
আমতা, হাওড়া।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতের মহান সৈনিকগণের উদ্দেশ্যে

ভদ্রেশ্বর মণ্ডল

সূচিপত্র

আলো আঁধার

"সুলতানের মা, ওকে কই ঘরে দেখছি না তো, আজ কারুর মজুর লাগবে নাকি?"

হাসল মতিবিবি। "ছেলে তোমার খুব লায়েক হয়ে উঠেছে। বিয়ে দাও না এবার। দেখছনি ভোর হতে না হতেই চলে গেছে কেস্তে নিয়ে।"

স্ত্রীর কথায় হাসল রসিদ মিয়া। "তোরে শুধু ঐ চিন্তে। মরাইয়ে ধানটা উঠতে দে। সাধ আহ্লাদ কি মোরও নেই। কলিমুদ্দিন মিয়ার মেয়েটাকে তো দেখেই রেখেছি।"

খুশির সকালটা ছড়িয়ে পড়ল মতিবিবির মুখে। "কোরবানি করে পাড়া খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

"বাপ্ রে বাপ্, যতদিন যাচ্ছে তোর ফিরিস্তিও তত বাড়ছে। বলছি নয় মনে যত আশ আছে সব মিটিয়ে নিবি।" আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রসিদ। কিন্তু চরের দিক থেকে ভীষণ হাঁকাহাঁকির আওয়াজে উদ্বিগ্ন হয়ে বৌকে বলল, "সাত সকালেই কাদের আবার হল্লা লাগল বল দিকিন?"

বাইরের শব্দটা কান পেতে শোনে মতিবিবি। "মুই কিছু বুঝতে পারছি না। একটু এগ্গেই দ্যাখো না।"

"দূর তুই বুঝিস্ না, পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে শেষে গালমন্দ খাই

আর কি।"

"না গো, একবার এগ্‌গে গিয়ে দ্যাখো না। ভীষণ হল্লা হচ্ছে যেন, ছেলেটা যে বাইরে আছে।"

কিন্তু বাইরে আর যেতে হ'ল না রসিদকে। সামনে যে দৃশ্যটা দেখল তাতে শিউরে উঠল দুজনেই। অমন জোয়ান ছেলেটা টলতে টলতে ফিরছে বাড়ির দিকে।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রসিদ একেবারে বাকহীন। মতিবিবি ডুকরে কেঁদে উঠল, "ওগো দ্যাখো না গো, হায় আল্লা! মোর ছেলে সাতে নেই পাঁচে নেই তবু কে অমন দুশমনি করলে গো।"

সুলতানের কপালের কাটা অংশটা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। পিঠের উপর লাঠির লাল লাল দাগগুলো স্পষ্ট। সুলতান টলছিল। তার চোখদুটো যন্ত্রণার অস্থিরতায় তখনো কাঁপছিল, কখনো বা তার থেকে বেরিয়ে আসছিল আগুনের হলকা। বাপের মুখের দিকে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ওরা জোর করে ধান কাটতে এসেছিল। মুই আপত্তি করেছিনুন বলে - - - -।"

লেঠেল দিয়ে চরের জমি দখলের কাহিনিটা আগাগোড়া বর্ণনা করছিল বিনোদ দোলুই। "পঞ্চাশ ষাট্‌জন লোক নিয়ে ভাগচাষি উচ্ছেদ করতে এসেছে উৎপল সামন্ত। সারা চর জুড়ে পাহারা দিচ্ছে পঁচিশ ত্রিশ জন লাঠিয়াল। ধানগুলো কেটে নিয়ে গিয়ে নৌকায় বোঝাই করছে বাকি সকলে মিলে। দুজন বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে নৌকো দুটোকে। একা একা কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না চরের দিকে। ওরে বাপ্, গেলেই বিপদ। সুলতানের দশাখানা কি করেছে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ তো মিয়া। কোন মতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।"

"প্রাণ বাঁচিয়ে - - - -" অর্ধস্ফুট উচ্চারণের মাঝে মিলিয়ে গেল বাকি কথাগুলো। যেন চার বছর ধরে গড়ে তোলা স্বপ্নের সমাধির উপর দাঁড়িয়ে আছে রসিদ।

হাঁ, বাদাবনের চর। দামোদরের বয়ে আনা বালিতে গড়ে ওঠা একটা দ্বীপের মত জায়গা। ঘন জঙ্গলে ভরা। দূর থেকে মনে হয় নদীর বুকের উপর

সবুজের একটা মিনার। মাথা উঁচু করে আকাশটার পানে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের বেলাতেও রাতটা লুকিয়ে থাকে গাঢ় ছায়ার গভীরে। পাশে দাঁড়ালে গাটা ছম্ ছম্ করে উঠে।

ঐ জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে একদিন উৎপল বাবু বলেছিলেন — "এবার সত্যিই জমিদারি প্রথা উঠে গেল রে রসিদ। তোর লেঠেলিগিরিও তো গেল। খাবি কি করে? তার চেয়ে দ্যাখ্ না চেষ্টা করে বন কেটে জমি বানাতে পারিস্ কিনা। বানাতে পারলে দেখবি সোনা ফলবে।"

"সেই ভাল বাবু, মুইও বাঁচব। নিরীহ্ মানুষের মাথায় লাঠি মেরে পাপ তো মুই কম করিনি। একেবারে একটা কসাই বনে গেসনু। মনের ভিতর জ্বালা কি কম।"

সত্যিই তাই। জমিদাদারের তাঁবেদারিতে এই সেদিন পর্যন্ত মানুষের সর্বনাশ করেছে। দেনাদার মানুষকে ঘাড়ে ধরে নামিয়ে দিয়ে এসেছে বাস্তু থেকে। নাম শুনেই ভেগে গেছে কত অসহায় চাষি। জমির ধারে গিয়ে আর লাঠি ধরতে হয়নি। একটা দুটো নয়, অমন কত শত ঘটনা। সেই স্মৃতিটা এখন বোঝার মত চেপে আছে বুকটার উপর। এর বিনিময়ে কি পেয়েছে সে? হ্যাঁ পেয়েছে বৈকি। অভাগা মানুষের বুকভাঙা হা হুতাশ আর একরাশ ঘেন্নার বদলে উৎপল সামন্তের কিছু প্রশংসা। সেই সঙ্গে এক বোতল মাল, দুটো টাকা। মদ আর পিঠ চাপড়ানির মোহে অন্ধ ছিল কত কাল। মতিবিবি তার উপর রাগ করেছে। তবু জাহান্নামের পথ থেকে সরে আসতে পারেনি। রাতের কত তিন সত্যি মিথ্যে হয়ে গেছে মতিবিবির কাছে। পরের দিনই পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে লাঠি নামিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়েছে উৎপল সামন্তের কাছে। জমিদারি প্রথা রদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। কিন্তু উপার্জন নেই একটা কানাকড়িও। দিনের পর দিন সংসারে অভাবের চেহারাটা বড় হয়ে উঠেছিল।

বার বার শুনতে হয়েছে মতিবিবির খোঁটা। "সারাজীবন লোকের সাথে দুশমনি করেছ খেয়াল নেই? পরকে খুব বড় লোক করে এলে, অপরের জন্য কাটা গোরে এখন নিজেকে ঢুকতে হবে না। খোদার বিচারের নড়চড়

নেই।"

অজানা ভয়ে বুকের দীর্ঘশ্বাসটা পাথরের মত জমাট বেঁধে রয়ে গেছে বুকের ভিতরেই। মতিবিবির মত খেদ করে জানাতে পারেনি মনের কথা। তবুও বলেছে, "বিবিরে তুই যা বলিস্ তা মিথ্যে নয়। পরের লেগেই সারাটা জনম খোয়ানু। প্যাট ভরলো কই।" সংসারের করুণ অবস্থাটা শেলের মত বিঁধছে দিনের পর দিন।

অগত্যা এগিয়ে যেতে হ'ল বাদাবনের চরে। কামাল আর সুলতানকে নিয়ে রাতদিন কী ভীষণ পরিশ্রম। অসংখ্য গাছ কেটে, রাশি রাশি বালি সরিয়ে চাষ করার মত জমির সীমানা বাড়াতে লাগল একটু একটু করে। ঐ চরের বুকে একদিন দেহ রাখল কামাল। বন কাট্তে কাট্তে চেঁচিয়ে উঠেছিল 'বাপজান' বলে, তারপরেই সব শেষ। হাঁটুর কাছে ছোবল মেরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সাপটা। মৌলবির পানি পড়াতেও রক্ষা হ'ল না।

মনটাকে চাঙ্গা করার জন্য উৎপল সামন্ত বলেছিলন, "দুঃখ করিস্ না রে। সবই নসিব। নইলে অমন সোমত্ত ছেলেটা ....।"

মালিকের কথায় দু'হাতে মুখ ঢেকে ছোট ছেলের মত কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রসিদ। "অমন কালের চরে মোকে কেন পাঠালে কত্তা। জনমের মত মোর মানিক হারিয়ে এনু।"

"ছেলে হারানোর ক্ষতি আমি কি পূরণ করতে পারি। তবে হাঁ, তোকে কথা দিচ্ছি যত খানি জমি সাফ করবি ততখানি তোর।"

ছেলে হারিয়ে বুকের পাঁজরখান ভেঙে গিয়েছিল রসিদের। চরের দিকে তাকালেই মনটা হু হু করে উঠত। বাদা বনের নাম শুনলেই মতি বিবি ডুকরে কাঁদত। কিন্তু সব দুঃখের স্মৃতি মুছে দিয়ে পরিষ্কার করা এক ফালি জমিতে এক সময় সবুজ ধানের চারা মাথা দোলাতে শুরু করল। উঠতি মেয়ের মত সুরমা পরা দুটি চোখে রোদ্দুরের পানে চেয়ে যেন হাসতে লাগল। এ দৃশ্য মনের দুঃখ শোক মুছে দিল। প্রথম প্রথম একাই যেত মতি বিবিকে না জানিয়ে। সুলতানকে সঙ্গে নিতে সাহস করেনি।

ছেলে হারানোর পরও নতুন করে জঙ্গল সাফাই করতে দেখে সবাই তাকে ঠাট্টা করত — "জঙ্গলে নগর বসাবে নাকি মিয়া?" কথায় কান দেয়নি রসিদ। গাছের গুঁড়িতে কোপ মারতে মারতে পিছনের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিয়েছে —"ঠাট্টা করছ বটে কিন্তু একদিন এখানে সোনা ফলবেই। আজ কথাটা বলে রাখলুম, দু'বছর পরে দেখে নিও।"

সেই থেকে পাকা চার বছর ধরে সুলতানকে নিয়ে কি ভীষণ পরিশ্রমটাই না করেছে। তৈরি করতে পেরেছিল মাত্র চার বিঘা জমিন। দেখতে দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল পাড়ার অনেকে। শেষে একফালি জমির জন্যে কাড়াকাড়ি রেষারেষি। এত কষ্ট করে তৈরি করা জমিনের কিছুটা গ্রাস করে ফেলল ষাট সালের রাক্ষুসে বানটা। কিন্তু ফসল ফলল বটে। হাঁ, ঠিক মনের মত, সোনালি ধানে মরাই ভরিয়ে দিয়ে মতিবিবির মনটাকে কিছুটা ঠান্ডা করতে পেরেছিল বৈকি।

ফসলের ভাগ দিতে গিয়ে থ বানিয়ে দিয়েছিল মালিককে। বিস্ময়ে স্বীকার করেছিলেন উৎপল সামন্ত — "এ যে তুই জাদু করে দিলি রসিদ। ওতে ধান ফলাতে পারবি এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হেসে বলেছিল রসিদ, "মাটি তো মা বাবু, খাটলে পরে মেহনত দিলে মা কি কখনো মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে?"

"তুই কেমন মাটির মানুষ হয়ে গেছিস্ রসিদ। আগে যে লেঠেলগিরি করতিস্ এ কথা মনেই হয় না। কিন্তু আবার তোর ডাক আসতে পারে। সেটেলমেন্টের মাপ এল বলে।"

হাসতে হাসতে কথাটা বললেও শুনে শিউরে উঠল রসিদ। "না বাবু'ই বরং বেশ আছি। আর কেন লজ্জা দ্যান।" আপন মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রসিদ।

সেই থেকে মালিককে কোন বছরই ফাঁকি দেয়নি। বরং প্রথম বছর থেকেই ফসল ভাগ দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে তর্ক করেছিল সুলতান। কিছুতেই রাজি হয়নি অর্ধেক ভাগ দিতে। "তৈরি জমিন নিয়ে লোকে অদ্দেক দ্যায়, আর মোরা জমিন তৈরি করনু তাতেও অদ্দেক।" কত বোঝাতে হয়েছিল

সুলতানকে — "দ্যাখ বাবা ও নিয়ে তক্কো করিস্ না। মালিককে ফাঁকি দিয়ে কি লাভ? ওতে কি খোদার দোয়া মেলে?"

না — ও নিয়ে আর কোনদিন তর্ক করেনি সুলতান।

পরের কয়েক বছরে বাদাবনের চরের জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। জমির নিশানা নিয়ে বিবাদ এড়াবার জন্যে ছুটে আসতে হয়েছে উৎপল সামন্তকে। সঙ্গে সে ছিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল গোটা চরটা। কিন্তু চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে কলিজার ভিতরটা কেঁপে উঠল, উপস্থিত চাষিরাও বুঝতে পারছিল ও চোখের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে দুষ্ট শয়তান। অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হতে দেরি লাগেনি। ইচ্ছামত দু'এক জনের জমির সীমানা রদবদল করে দিলেন। আরও হয়ত কিছু করতেন কিন্তু অনুনয় বিনয়ের জন্যেই মনটা বুঝি বা একটু নরম হয়েছিল। ভালর মধ্যে উৎখাত হল না কেউ। কিন্তু যাবার সময় সকলে শুনল সেই সতর্ক করে দেওয়া কথাগুলো—"ভাগ চাষি আইনের সুযোগ যদি কেউ নিতে যাস্ তাহলে দেখবি পরের দিনই কী করি। জমিদারি গেলেও এখনও তিন তিনটে কারবার চলছে কলকাতায়। মনে রাখবি আমি উৎপল সামন্ত, হিম্মত রাখি।"

না—ভয়ে কেউ সামন্তবাবুর কথা ডিঙিয়ে যায়নি বা যাবার সাহস করেনি। বরং প্রতিদান দিয়েছে। ইলেকশানের সময় ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছিল।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে চরের বুকে নতুন খাল কেটে জল আনবার প্রস্তাব রাখলেন উৎপলবাবু। প্রস্তাব ভাল, সবাই সম্মতি জানাল। চাষিদের জমি পিছু হিসাব মত লোক নিয়ে কাটা হ'ল নতুন খাল। সাধারণ চাষিদের ভয়টা কেটে গিয়ে এমন একটা ভাল কাজের জন্য ওনার সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। নেই বা কিছু আনলেন সরকারের কাছ থেকে। এত বড় একটা কাজ কজনই বা করতে পারেন। কিন্তু কাল ঘটাল ঐ সরকারি লোকগুলো। খাল মাপতে এসে যখন তারা সরকারি খরচে খাল কাটানোর আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল তখন সবাই বুঝল কনট্রাকটের দু'লাখ টাকা কার বাক্সে উঠেছে। সেই থেকে বিরোধ। সবাই মজুরি না নিয়ে কাজ করেছিল, এখন

তাই ঘৃণায় মুখ ফেরাল সবাই। এমন হারামিপনা কি কেউ করতে পারে গরিব দুঃখী মানুষের সঙ্গে। শুধু জমি কেড়ে নেওয়ার ভয়ে মুখ ফুটে কেউ বলল না একটা কথাও।

ভণ্ডামির মুখোশটা খুলে যেতেই দপ্ করে জ্বলে উঠলেন উৎপল সামন্ত। ঠিক ছিপি খোলা বোতলের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড এক দত্যির মত। অজান্তে যে দু এক জন চাষি নিন্দে মন্দ করেছিল তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে বুঝিয়ে দিলেন তার শক্তির দাপট। চোখের জল ফেলে সরে আসতে হ'ল করিম সেখ, সামসের মিয়া এবং বিনোদ দোলুই এর মত নিঃস্ব চাষিদের। একমাত্র মেহের মিয়াই এগিয়ে গিয়েছিল জে. এল. আর. অফিস পর্যন্ত। কিন্তু সেখনেও সুবিধা করতে পারেনি। টাকা চায়। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কানে পোঁছে দিয়েছিল বিজয় ওঝা। বিজয় ওঝার স্বার্থ ছিল বৈকি, কালো বাজারির টাকায় ফেঁপে উঠে চরে কিছু সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখছিল। উৎপল সামন্তের দোসর হতে তার সময় লাগেনি। এক্ষেত্রেও তাই ফল ফলল হাতে নাতে। পরের দিনই জমি থেকে উৎখাত করা হ'ল মেহেরকে।

এমন অন্যায় ভাবে চাষিদের উৎখাতের ব্যাপারটা সহজে হজম করতে পারেনি রসিদ। বিজয় ওঝাকে মেহের মিয়ার জমি চাষ করতে দেখে মাথার ভিতরটা জ্বলে উঠেছিল। স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা কড়া কথা— "মুখের গেরাস কেড়ে নিয়ে এমন শয়তানি করলে কোনদিন ভাল হবে না চাচা?" এক কথা দু কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বেশ খানিকটা ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

সেই থেকে রসিদ অনুমান করেছিল আবার হয়ত একটা ঝড় উঠবে। পরের মরশুমে হয়ত কেড়ে নেবে জমিনটুকু। কিন্তু কোনদিন ভাবতে পারেনি কাঁচা ধানের উপর এমন জঘন্য বেইমানি করতে পারবেন ঐ সামন্তবাবু।

গতকালই গিয়েছিল বাদাবনের চরে। সোনালি ধানের নুয়ে পড়া শিষে গোটা চরটা যেন হাসছে। ঘন সবুজের জাজিমের উপর মুক্তার মত শিশির বিন্দুগুলো চিক্ চিক্ করছে সকালের রোদ্দুরে। দামোদরের কোল ঘেঁসে বাহারি কাশফুল দুলছে বাতাসে। কী মন ভোলানো রূপ! গোটা মাঠটাই

যেন মতিবিবি। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারা যায় না। বাড়ির দিকে ফিরতে ইচ্ছা করে না। ভাল লাগে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে। কিন্তু এবার এখানে ঢুকে পড়েছে দস্যুরা। সব কিছু তছনছ করে দিচ্ছে।

বিনোদের মুখের দিকে অসহায়ভবে তাকায় রসিদ। প্রবল উত্তেজনায় সারা শরীরটা থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে।

বিনোদ এবার রাগে ফেটে পড়ে। "মিয়া, এখনো তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে। ওরা চিরকালটা মাথায় বাড়ি মারবে। আমরা বসে বসে শুধু ব্যাণ্ডেজ বাঁধব। ওরা কি সাধে বলে আমরা ভেড়ার জাত। বলবেই তো, আমাদের যে ঐক্য নেই।"

"কি বললি মোরা ভেড়ার জাত?" বাঘের মত আওয়াজে সকলকে কাঁপিয়ে দিল রসিদ। মুহূর্তে রসিদ মিয়ার সে কী ভয়ঙ্কর মূর্তি!

স্বামীর পানে তাকিয়ে চমকে উঠল মতিবিবি। বিনোদ দেখল তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে শেয়াল নয়, শের।

বহু দিনের পুরানো লাঠি গাছটা নিয়ে উঠোনের উপর দাঁড়াল রসিদ। "আজই দেখে নেব বেইমানদের লাঠির জোর কতখানি। কেমন করে জমি বাঁচাতে হয় তা মুইও জানি।"

মতিবিবি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। "মোর মাথা খাও, হুট্ বলতে ঝোঁপপে পড়ে অমন সব্বোনেশে পথে খবরদার একা একা যেওনি গো।"

"সব্বোনাশ, তুই বলছিস্ সব্বোনাশ। তোর চোখ আছে বলতে পারিস্? একবার চেয়ে দ্যাখনা ছেলেটার পিঠখানা। সবাই মুখ বুজে সহ্য করছে বলেই এ্যাতো বড় আসপদ্দা। রক্তে লাল হয়ে যাবে তবু মুই ছাড়বুনি এক ইঞ্চি জমিন। মোর কথা যদি মিথ্যে হয় তবে জানবি মেহের মিয়া মোকে পয়দা দেয় নে।"

পাড়ার ছেলে বুড়ো হুমড়ি খেয়ে পড়ল সারা উঠোনটায়। সবাই দেখল তাদের সামনে একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। মতিবিবি স্বামীর হাতখানা ধরে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিল। "খোদার কসম্, যেওনি গো অমন খুন খারাবি

করতে।”

স্ত্রীর মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিল হাতখানা, “ছেড়ে দে তুই। গোরে যেতে রসিদ মিএগা ভয় পায় না। হালিমকে যেখানে রেখে এইচি মোকেও তার পাশে রাখবি।”

চোখ দুটো জ্বলতে লাগল আগুন লাগা আকাশটার মত। “ডরাস্ ক্যানো সুলতানের মা; জমিদারের তাঁবেদারিতে এ লাঠি অনেক মাথা নিয়েছে। এবার দেখিয়ে দেব লড়াই কাকে বলে। এ লড়াই খাঁটি লড়াই। প্যাটের জ্বালা না থাকলে কোন হারামির বাচ্ছা জান খোয়াতে যেত অমন বাদাবনের চরে।”

এবার উত্তেজনা চরমে। বুকের আগুনটা দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পাড়ায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে আজ সবাই যেন অনুভব করছে অদ্ভুত উল্লাস। বেরিয়ে পড়েছে সকল চাষি। “চল, এগিয়ে চল মিয়া। সবাই লড়ব। দুশমনির জবাব দিতেই হবে। মোরা মরিয়া।”

লিক্‌লিকে মানুষগুলো তীরের মত ঝক্‌মক্ করে উঠল রোদ্দুরে।

মতিবিবি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু চিৎকারের মাঝে হারিয়ে গেল ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। দরমা ঘেরা উঠোনের এক কোণ থেকে দেখল লাঠি হাতে অগণিত মানুষের মিছিল বাদাবনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

উপস্থিত জনতা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ওদের পানে।

শিশির ভেজা ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে অগণিত মানুষ। আকাশের কোল ঘেঁসে উঠছে রক্তলাল সূর্যটা। আগে আগে চলছে রসিদ। লাঠিগুলো ঝক্‌মকিয়ে উঠছে সূর্যের পাহারায়। ওরা সত্যিই মরিয়া। মতিবিবি নজর ফেরাতে পারল না।

জমির খুব কাছাকাছি বালিয়াড়ি। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উৎপল সামন্তের লোকজনদের। এমনকি কথাবার্তাগুলোও বাতাসে ভেসে আসছে। কিছু ভেবে থমকে দাঁড়াল রসিদ। হয়ত বা কি বলছে শোনার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে থামল গোটা দলটা। “কি মিয়া, ওদের দেখেই সব জারিজুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেল নাকি?”

চোখের ইশারায় রসিদ চুপ করতে বলল ওদের। বড় করুণভাবে তাকিয়ে রইল মাঠটার দিকে।

কাঁচা ধান কাটছিল সামন্ত বাবুর লোকজন। জমির চারপাশ ঘিরে রেখেছে লেঠেলরা। বড় বড় দুটো নৌকায় বোঝাই করছে আধ পাকা ধানের বোঝা। দুজন বন্দুকধারী নিয়ে নৌকা দুটো পাহারা দিচ্ছে বিজয় ওঝা। উৎপল সামন্ত নৌকার উপর দাঁড়িয়ে। "নে তোরা কেটে যা। বাপ কেলে জমি পেয়েচে শয়তানের বাচ্চারা। বর্গা রেকর্ড করাবে, রেকর্ড করা ঘুচিয়ে ছাড়ব।"

মাতাল মানুষগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছিল বিজয়, মুখে বিজয়ীর হাসি। "শুনলি তো বাবু কী বলছেন।" দাঁতে দাঁত ঘসলো সামসুদ্দিন, "মিয়া, শুনতে পাচ্ছো নি শুয়োর বাচ্চাদের কথা?"

রসিদ তবু দাঁড়িয়ে। যেন একখানা পাথর। চোখের সামনে ভাসতে লাগল অতীতটা। মতিবিবির কথাগুলো বাজতে থাকল কানের কাছে-- "জমিদারের লেঠেলি করে ভাল করনি মিঞা। এ পাপের যোগ্য সাজা একদিন তোমাকেই পেতে হবে।" সেদিন প্রতিবাদ করেছিল রসিদ, "তুই বড় বাজে বকিস্। মোরা তো নেড়ি কুত্তার জাত। কুঁই কুঁই করে লেজ গুটিয়ে পিছু হটতে জানি। কই একজনও তো লাঠি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালনি।" মতিবিবি সেদিন যা বলেছিল তা সে বুঝতে পারেনি। আজ বুঝল নিজের গরিব জাতটারই কী ভীষণ ক্ষতি করেছে সে।

উৎপল সামন্ত অভয় দিচ্ছিলেন দূর থেকেই "কোন ভয় নেই। চালাও, ধান কাটার কাজ।"

"কি মিয়া মোদের মজা দেখাতে আনলে নাকি? মোরা যে বুড়বাক বনে গেনু।" মাটির উপর সজোরে লাঠিটা ঠুকে গর্জে উঠল করিম।

করিমের চোখে চোখ রাখল রসিদ। আগুন জ্বলা চোখ। "এবার এগোও, কিন্তু ঐ মানুষগুলোর মাথায় বাড়ি মেরনি কেউ। শুধু নৌকো দুটো ঘিরে ফেলে নদীতে চুব্‌বে মার।" গম্ভীর গর্জনে থর থরিয়ে কেঁপে উঠল বাতাস।

বালিয়াড়ি টপকে হু হু করে এগিয়ে চলল গোটা দলটা। ঠিক যেন বন্যার মত। কাটিয়ে লোকগুলো আকস্মিক আক্রমণে থতমত খেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা ঠিক করতে পারল না। বাবুর নির্দেশের অপেক্ষায় লেঠেলের দল মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। ততক্ষণে রসিদ মিঞা এবং সামসুদ্দিনের লাঠি বন্ বন্ শব্দে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে তাল রেখে অন্যদেরও।

"ধান লুটে নেবে কোন শয়তানের বাচ্চা, বুকের পাটা থাকে তো এগিয়ে আয়।"

ভাড়া করা লেঠেলের দল ছত্র ভঙ্গ হয়ে প্রাণ ভয়ে মিলিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। উৎপল সামন্ত একেবারে অবাক। এমনটা ঘটে যাবে ভাবতে পারেননি আদৌ। নৌকো দুটো তর্‌তর্ করে সরতে আরম্ভ করল মাঝনদীর দিকে। ক্রোধে ফুলতে লাগলেন উৎপল সামন্ত, যেন কেউটের ফণা। "শুয়োরের বাচ্চারা, তোদের দেমাক আমি ভাঙবই। সব কটাকে হাজতে পাঠিয়ে জল খাব। জানিস্ থানা আমাদের হাতের মুঠোয়।"

তখনও হাত উঁচিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বিজয় ওঝা—"বাবু, ঐ সামসুদ্দিনটা পালের গোদা। দেখছেন না নৌকো ডোবাবার জন্য জলে নামছে।"

"বটে, ফায়ার করে লুটিয়ে দাও।"

"কিন্তু আমাদের লোক ভয়ে এখনো যে ওদের মধ্যে ছুটছে। বন্দুক চালাব কেমন করে?" ভয়ার্ত বিজয় তাকাল সামন্তের মুখের দিকে।

"দেখছ না, লড়াই না করে ঐ শালা লেঠেল গুলোও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা সব একজাত। এখনো ভাবছিস্ ওদের কথা।" স্বরে প্রচণ্ড তিক্ততা ফুটে উঠল উৎপল সামন্তের। "চালাও গুলি - - - ।"

দুটো বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের ফুলকি। নিরাপদ দূরত্ব থেকে নৌকো দুটো দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল বাদাবনের চরকে পিছনে ফেলে রেখে। সারা বছরের স্বপ্ন সাধ লুটে নিয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল নদীর বাঁকে।

নৌকা ধরার অনেক চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে তীরে এসে দাঁড়াল রসিদ।

গায়ের জল মুছে সামসুদ্দিন বলল, "কুত্তার বাচ্চার আবার লাফানি। হাত কড়া পরাবার ভয় দেখায়। জলের টান কম থাকলে মুই কি সহজে ছাড়তুন মিয়া।"

বাদাবনের চর জুড়ে আবার নেমে এলো স্তব্ধ করুণ নীরবতা। একা দাঁড়িয়ে রইল রসিদ। দূর হতে পিছন ফিরে সামসুদ্দিন ডাকল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মিয়া? চল সবাই মিলে থানায় যাই।"

মনে হ'ল এ কথা শুনতে পায়নি রসিদ। ঝাপসা দুটি চোখে তাকিয়ে রইল ধর্ষিতা মাঠটার দিকে।

আবার ফিরে আসছি

চারপাশের দেওয়ালে অসংখ্য নোটিশ, কোথাও এমনি আঠা দিয়ে লাগানো, কোথাও বা কাঁচের ফ্রেমে বন্দি করা। নির্মাল্য খুঁজছিল তার রেজাল্টটা। পুলকের মুখে শুনেছিল সে ফিফ্‌থ পজিশন্‌ পেয়েছে। তবুও নিজের চোখে একবার না দেখলে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আধ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এক একটা বোর্ড শুধু দেখেই চলেছে। কিন্তু কিছুই পাত্তা করতে পারেনি। পুলকের কথাগুলো এখন যেন বিশ্বাসের দোরগড়া থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ভীষণ ডিসাপয়েন্টেড হ'ল নির্মাল্য। মনে হ'ল একরাশ ক্লান্তি তাকে একটা কফিনের মধ্যে শুইয়ে রাখতে চায়। সামনের ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসে উৎসুক দুটি চোখে দেখতে লাগল মানুষের আনাগোনা।

দশটায় অফিস। রক্ষী গেট খুলে দিয়েছে সাড়ে নয়টায়। কিন্তু এই আধ ঘন্টা ধরে কাকের চীৎকার, আর কয়েকটি বিড়ালের মিউ মিউ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায়নি। ঘড়ির কাঁটাটা দশটা ছুঁয়ে গেল। চারপাশে প্রেত পুরীর নির্জনতা। নির্মাল্য অবাক হয়ে ভাবছিল বর্তমান অবস্থার কথা। অনিয়মটাই কি এখানকার নিয়ম! আরো পাঁচ দশ মিনিট কেটে যাবার পর এক এক করে আসতে লাগল আরদালির দল। কিন্তু বাবুরা বা অন্য সব কর্ম্মচারীদের দেখা নেই। জেনেছিল তাদের আসা না আসাটা নাকি সময়ের ধার ধারে না, সবটাই মর্জ্জির উপর নির্ভর করে।

অকারণ চিন্তায় নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করতে চাইল না নির্মাল্য। জলের কুঁজো হাতে একজনকে আসতে দেখে জানতে চাইল—'আচ্ছা দাদা, অফিসাররা কখন আসবেন বলতে পারেন?'

চোখে মুখে খেলে গেল অদ্ভুত হাসি। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে স্বগতোক্তি করল—'স্বাধীন ভারতকে কৃতজ্ঞ করতে বড়লাটের বাচ্চারা কখন আসবেন কে জানে। এরা তো সরকারের কাছ থেকে বেতন নেন না।'

মানুষটার এ ধরণের কথায় কিছুটা সাহস পেল নির্মাল্য। বুঝল অন্যদের মত এখনো ফুটে যাননি, এখনো মানুষের জন্যে কিছুটা দরদ আছে।

সাহস করে এগিয়ে এল কাছে। 'আমাকে একটু সাহায্য করবেন দাদা।'

অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে একবার দেখে নিল সারা শরীরটা। আবার সেই হাসি। --'সক্কাল বেলাই, বলেন কি করতে পারি।'

'আমাদের রেজাল্টটা কোথায় পাব বলতে পারেন?'

'আরে রাজ্যজুড়ে লোক তো আমাদের কত কথাই কয়। বোকার মত কইছেন কেন? ঠিক ঠিক কয়েন।'

বেশ বিনয়ের সঙ্গে নির্মাল্য বলল, 'ভুল হয়েছে দাদা, আমি জানতে চাইছি ইউ ডি ক্লার্কসিপের রেজাল্ট।'

প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল মুখ। 'তাই বলেন, আসেন, আমার সঙ্গে আসেন, নীচে খুঁজলে কেমন কইর‍্যা পাইবেন। ও তো আমাদের সেক্‌সন। আসেন।'

নির্মাল্য ঠিক এক বন্দির মতো ওর পিছু পিছু তিন তলায় গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল।

ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল। 'দ্যাখেন ঐ লিষ্টে আপনার নাম আছে কি না।'

চরম উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। দেওয়ালে চোখ ফেলতেই খুশিতে ভরে উঠল মুখ। মিথ্যে বলেনি পুলক। পাঁচ নম্বরে জ্বল জ্বল করছে নাম। প্রথম সাফল্যের স্বাদে অপূর্ব্ব আনন্দ এবং উত্তেজনায় ভরে উঠল মন।

ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই আর্দালি। 'কি মশাই, নামটা আছে তো?'

খুশির চিহ্নই উত্তরটা দিয়ে দিয়েছিল, মাথা নেড়ে সেটা জানাল। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বলল, 'আসুন, চা খাই একসঙ্গে।'

'নো, নো, ব্রাদার, খরচ করতে যাবেন না, এখন সবে সন্ধ্যে, রাত শেষে দ্যাখেন কি হয়। তারপর না হয় খাওয়াবেন।' মুখে ফুটে উঠল একটা অর্থপূর্ণ হাসি।

'রাত শেষ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?' বিস্ময়ে তাকাল ওর পানে।

'আরে মশাই পজিসনে ফিফ্‌থ হলেই চাকরি হয় না। আসল খেল তো ওর‍্যালে, ওই যাকে ভাইবা ভসি বলে। তারপর নামটা থাকে কি দেখুন। তবে তো চাকরি।'

'মনে হয় ওতে আমি পাশ করে যাব', বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল নির্মাল্য।

তীব্র ভ্রুকুটিতে নেচে উঠল ওর দুচোখের তারা। 'থাকেন কোথায়? দেশেটেশে মনে হয়।'

'হাঁ'

'মুখ দেখেই বুঝেছি। এ যুগের গেঁড়াকল বোঝেন না তো দাদা, পরীক্ষা টরীক্ষা বিলকুল ঝুট। আসল খেলা ভিতরের খেলা।'

আরো কিছু বলত। রিক্রুটমেন্ট অফিসার আসার পরিচিত শব্দে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে গেল এবং হাত তুলে স্যালুট্ দিল। কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের অফিসে ঢুকলেন ঐ অফিসার।

নির্মাল্য ঘড়িটা দেখল। এগারটা কুড়ি।

আর্দালির কাছ থেকে আরো কিছু জানলে ভবিষ্যতে সুরাহা হবে মনে করে নেমে আসতে পারল না নির্মাল্য। সুযোগের অপেক্ষায় সামনের করিডোরে ফাঁকা বেঞ্চটায় বসল। সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখির মত ডানামেলে বাড়ির একরাশ চিন্তা মনের উপর মেঘের সামিয়ানা বিছিয়ে দিল। বাবা শুয়ে আছেন অন্তিম শয্যায়। মৃত্যুর শেষ ছোঁয়াটা যে কোন মুহূর্তে মুক্তি দিতে পারে। বোন দুটো চলে গেছে টিউশানি করতে। অক্টোপাশের মত দেনা

ছেঁকে ধরেছে নানা দিক থেকে। এইবার চাকরি হবেই — এই কথাটা সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে ক্লান্তি ধরে গেছে। আরো কতদিন তাকে অভিনয় করতে হবে জানে না। সবাই ভাবছে কিছু একটা হবে। ছ'টা প্রাণ তার পানে তাকিয়ে ভীষণ অপেক্ষায়। একটা চাকরি, হ্যাঁ, একটা চাকরি তার কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের চেয়েও বড়।

কৌতুহলী দুটি চোখে অদূরে অফিস রুমটার দিকে তাকিয়ে ছিল নির্মাল্য। এক ভদ্রলোক অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে দাঁড়াল পর্দার কাছে। সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে ভিতরটা দেখল একবার। অফিসার ভদ্রলোকের মুখে ভারিক্কি চালের হাসিটা তখনো লেগে আছে — 'বলুন কি ব্যাপার।'

অসম্ভব কৌতুহল দমন করতে না পেরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কান পেতে রইল ওদের কথাবার্তা শোনার জন্য। আর্দালি নীচে চলে যাওয়ায় বাধা দেবার কেউ ছিল না।

'বিপুলবাবুর কথা মত সব কিছু করেছি স্যার। এবার আপনার দয়া।'

'ওর নাম, নাম্বারটা দিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে আসুন। ভাবনার কারণ নেই।'

'দেখবেন স্যার, কিছু না হলে একেবারে পথে বসব।' করুণ মিনতিতে লোকটির কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল।

'সব ভাবনা আমার'।

বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক। স্বস্তির একঝাঁক রোদ যেন মেঘমুক্তির পর খেলা করছে সারা মুখে।

এতক্ষণের অনুসন্ধিৎসা এদের আসল স্বরূপটা বুঝে নিতে কিছুটা সাহায্য করেছিল। বুঝেছিল লোক চক্ষুর অগোচরে চোরাবালির দুরন্ত একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে সহজে বোঝবার বা চেনবার উপায় নেই। শুধু যারা জানে তারাই সন্তর্পণে বালি সরিয়ে পথ করে নেয়। এ সব ভাবতে ভাবতে হাত পা ক্রমশ অবশ হয়ে আসে। প্রশ্ন জাগল — তার উপায় কি কিছু

হবে না? ভবিষ্যৎ আশার দীপটা যেন পলকে নিভে এল।

আর নতুন করে কোন কিছু শুনতে ভাল লাগল না। নীচে নেমে এসে সেই পুরানো জায়গাটায় বসল। উদ্দেশ্য যদি আবার সেই আর্দালির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আরো কিছু জানার সুযোগ মিলে যাবে।

বিপরীতমুখী বেঞ্চিটায় বসেছিলেন এক বৃদ্ধ এবং এক যুবক। খুব সম্ভব পিতাপুত্র। আপনা হতেই ওদের কথাবার্তায় তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে পড়ল নির্ম্মাল্য।

বৃদ্ধের মুখে বিষণ্ণতার অগ্নিবলয়। 'আমাদের দু বিঘে জমি বেচলেও আশি হাজার টাকা হবে না। কোত্থেকে পাব এত টাকা।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল যুবক। 'আজ তো সাফ বলে দিল, না দিলে চাকরি হবে না।'

'সে তো জানি বাবা। ঐ ক্লার্ক নেগোসিয়েটারটাকে বিশ্বাস করে অতো টাকাই বা দেওয়া যায় কি করে।'

'চলুন বাড়ি যাই, চাকরি না হয় কি আর করা যাবে।'

'কার চাকরি দাদা, আপনার?' প্রশ্ন করল নির্মাল্য।

'কোথায় চাকরি দেখলেন। চেষ্টা বলতে পারেন।' দুচোখে সহজভাবেই ধরা পড়েছে গভীর হতাশা। 'এদেশে চাকরির স্বপ্ন দেখা পাপ।'

'লিষ্টে নাম ছিল?''

প্রশ্ন শুনেই আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়লেন বৃদ্ধ। 'জানেন আমার ছেলে ফাষ্ট ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার। রিটিনে থার্ড পজিশন। ওর‍্যালে সব উত্তর দিয়েছে। দেখবেন ফাইনাল লিষ্টে ওর নাম থাকবে না।'

'কারণ?'

"কারণ আবার কি। বললেই কি প্রতিকার হবে। সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ। এখানে পদ্মলোচন কানা হয়।" তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক, দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক বৃদ্ধ জটায়ু।

সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবকটিও হতাশ মনে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

তেমনই বসে রইল নির্মাল্য, উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নেই। চোখের সামনে অন্ধকার পর্দায় হরেক রঙের বস্তুগুলো অনবরত ঘুরতে লাগল। মনে হল এখন পৃথিবীতে রাত। মাথার ভিতর দিয়ে এখনই কোন সুয়জ অথবা স্কাইলাব ছুটে যাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে। একটা প্রশ্ন অনবরত আঘাত করতে লাগল — কি হবে তাহলে?

ঠিক তখনই পিঠের উপর আলতো করে সেই আর্দালি হাত রাখল, 'শুনছেন'।

প্রায় আধবোজা চোখ দুটো মেলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্দালিকে যেন দেবতার মত মনে হচ্ছিল, কিছুটা আশা জেগে উঠল। ত্রস্ত মিনতির সঙ্গে বলল, — 'বলুন খবর কি?'

'পাঁচজন যা করেন আপনি তা পারবেন?'

'বলুন কি করতে হবে।'

'আমার কথা মত চললে ঠকবেন না, চাকরি পেতে হলে কিছু খরচ করতে হবে, বোঝেন তো যুগটা কেমন।'

'কতো?'

'বেশি নয়, মাত্র হাজার সত্তর। রাজি থাকলে আমি নিয়ে যাব ওনাদের বাড়িতে।'

কোন উত্তর দিতে পারল না নির্মাল্য। বোকার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে যোগ বিয়োগ করেও পরিমাণটা কোন মতে পাঁচশো টাকার অঙ্কটাও ছুঁতে পারল না। শেষে দান ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হতাশার সঙ্গে বলল — 'কোথায় পাব অত টাকা, শাকভাতই জোটাতে পারি না'।

তাহলে হ'ল না, চললাম। চলে যাবার আগে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আর একবার ঘুরে দাঁড়াল। "আপনি দেখছি নিতান্ত বোকা, একদম হিসাবি নন। আরে মশাই, চাকরি হলে ও টাকা তো এক বছরেই উঠে যাবে।"

'কিন্তু এখন পাই কোথায়?'

'তবে রাস্তায় গিয়ে কাঁদুন।' আর পিছন ফিরে তাকাল না আর্দালি।

নির্মাল্যের মনে হ'ল সে যেন দ্বিতীয় কোন হিরোশিমার মাঝে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র বাঁচার নিষ্ফল চেষ্টায় একটুখানি নিশ্বাস পেতে চাইছে। সব অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে। দূষিত কার্বনে বাতাস নাচছে। মা, বাবা, বোনেদের মুখগুলো কেমন বীভৎস হয়ে উঠেছে। তীব্র যন্ত্রণায় মাটি আঁচড়াচ্ছে, লেখা হচ্ছে যুগের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিবাদ।

ইতিমধ্যে কতখানি সময় পেরিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল করেনি। হঠাৎ কিছু উত্তেজিত কথাবার্তায় সম্বিৎ ফিরে পেল। দেখল কয়েক জন যুবক সেই অফিসারটিকে ঘিরে ধরেছে, 'স্যার, বেকার সংঘের বিলটা রাখুন'।

অনিচ্ছার সঙ্গে বিলটা হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন, 'হাজার টাকা চাঁদা!'।

'হাঁ স্যার, অল্পই নেওয়া হচ্ছে আপনার কাছ থেকে।'

'এটা অরাজকতা।'

'তা একটু বলতে পারেন। আপনারাই এর স্রষ্টা।'

'তোমাদের মত শিক্ষিত যুবকেরা এমন পথে নামতে পারে কি করে?'

নায়কোচিত ভঙ্গিতে একজন যুবক উত্তর দিল, 'চাকরি দেবার নামে অত টাকা কামাচ্ছেন তার উপর চব্বিশ'হাজার টাকা মাহিনে। কিছু দিতে অত দ্বিধা কেন?'

দ্বিতীয় জন বলল, 'ছেলেকে সাউথ পয়েন্টে পড়াচ্ছেন টিউটরদের দু'হাজার টাকা দিচ্ছেন, এয়ার কণ্ডিশন রুমে বাস করছেন। বলুন তো স্যার, এত টাকা আসে কোথা থেকে?'

তৃতীয় জন বলল, 'আমরা অনেকেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় আপনার সমান। আপনার আয়ের কিছু অংশ নেওয়ার অধিকার আমাদের আছে।'

'আমি তোমাদের পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করতে পারি, সেটা খেয়াল আছে?' বিরক্তির ভিতর দিয়ে গর্বোদ্ধত ভাবটা ফুটে উঠল মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'সেটা আমরা জানি। আরও জানি আপনার বাঁচার চাবিটা কেমন করে কেড়ে নিতে হয়। আমরা আপনাকে সোস্যালি বয়কট করব, বন্দি থাকবেন ঘরের মধ্যে।'

"তোমরা স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে গেছ, আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।"

দ্বিতীয় জন বলল, আমাদের বেকার বাহিনী নীরব থাকবে না। আপনার সুন্দর মুণ্ডটা বড়োদিনের কেক করে পাঠিযে দেব আপনার স্ত্রীকে।

তৃতীয় জন হেসে উঠল, "ঘুমন্ত বাঘেরা জেগে উঠেছে স্যার। আমরা বাঁচতে পারিনি; আপনাদেরও বাঁচতে দেব না।"

মুহূর্তে অদ্ভুতভাবে বদলে গেলেন অফিসার, 'অত চটছো কেন । দেখছিলাম তোমাদের ষ্ট্যামিনা। তোমরা জেনে রেখো উই, দি অফিসারস্ আর অলয়েজ্ কনসিডারেট্।' কথাগুলো বলতে বলতে নোট ক'খানা ওদের লিডারের হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন প্রায়।

কিন্তু ছন্দপতন ঘটাল দ্বিতীয়জন। এগিয়ে এসে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, কিন্তু আমার সেই দশ হাজারটা ব্যাক করতে হবে যে।'

'আমি ....! কি বলতে চাও তুমি!'

'কিছু না স্যার, স্রেফ সত্যিকথা, আমি নিজে হাতে ঐ টাকাটা দিয়েছি আপনাকে। বাকি কুড়ি হাজার দিতে না পারায় চাকরি হয় নি। দেখুন না স্যার মুখখানা, ঠিক চিনতে পারবেন। মনে করুন না ৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাটা।'

'আমাকে ভয় দেখিয়ে অপমান করা হচ্ছে।'

'মহামান্য যুধিষ্ঠির, আই এ্যাম্ রেডি টু এমব্রেস ডেথ্ ফর দি লাষ্ট টাইম।'

নির্মাল্য এতক্ষণ উপভোগ করছিল মজাটা। ভাগ্য ভাল যে এ সময়টায় এখানে কেউ নেই। থাকলে বিরাট একটা জটলা বেঁধে উঠত, সাহস ফিরে আসছিল মনে। মনে হচ্ছিল অনেক অন্ধকার পেরিয়ে নতুন দিনের ইঙ্গিতে

একটা ভোর তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত কিছু মুখ বুজে হজম করে নিরীহ ভদ্রলোকের মত অফিসারটি অন্য কামরায় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখগুলিতে ফুটে উঠল অদ্ভুত হাসি। 'যাবে কোথায় বাছাধন, এবার সব বদমাশের ঘুম কেড়ে নেব।' তীব্র প্রতিহিংসার আগুনে ওরা জ্বলছিল। পলকে অভিযান শেষ করে ওরা চলে গেল।

ওদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আশার দীপটা কেমন নিস্প্রভ হয়ে গেল। একটা ঢিল পড়ার পর কিছু সময় বাদে হ্র দের যেমন নিস্তরঙ্গ চিত্রার্পিত অবস্থাটা ফিরে আসে ঠিক তেমনি। তবু সামান্য এই ফাঁকটুকুতেই নিজের ভবিষ্যৎ চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে গেল নির্মাল্যর কাছে। আবেদন কোথায় করবে, কার কাছে? ভাবতে ভাবতে শরীরের সমস্ত শক্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। জীবনের, যৌবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জিত সার্টিফিকেট, বাবা মার ত্যাগ, বোনেদের ভবিষ্যৎ -- সব কেমন মৃত্যুর মত নীল।

তবুও আশা ছাড়তে রাজি নয় নির্মাল্য। পায়ে পায়ে উঠল উপর তলায়। উদ্দেশ্য আর্দালিটার সঙ্গে দেখা করে শেষবারের মত বোঝাবার চেষ্টা করবে।

খুব আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। আমার শেষ কথাটা শুনবেন দাদা।

'আমার যা বলার তো বলেছি, আর কি শুনব কয়েন। আপনি তো রাজি নন।' কথায় বিরক্তি প্রকাশ পেল।

সংযত বিনয়ের সঙ্গে পার্টিশানটার আড়ালে আশার জন্য অনুরোধ জানাল নির্মাল্য।

কাজ হল কথায়। উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। 'বেশ চলুন'।

আসার সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর দু'হাত রেখে তাকাল ওর দিকে। 'বলেন কি বলতে চান।'

হাত দুটো জড়িয়ে ধরল নির্মাল্য। আমার একটা অনুরোধ রাখুন।

চাকরি হলেই আমি প্রতি মাসের বেতন থেকে ঐ টাকা শোধ করে দেব।

"ও তাই কয়েন, আপনি আপনার গ্যারান্টি চাইতাছেন। চাকরি হলে আপনি নাও দিতে পারেন, তখন কেউ কিছু করতে পারবে না।"

"না, না ও কথা বলছেন কেন। আমি কথা দিচ্ছি সব শোধ করে দেব। দরকার হয় শর্তটা স্ট্যাম্প পেপারে লিখে সই করে দেব।"

"ও কথার কোন মূল্য নাই।"

'তাহলে হবে না?'

'আমারে ওসব কথা কয়েন কেন। আমি কি অফিসার, আমার হাত দিয়ে লেনদেনটা হয় বলে বাবু আমাকে একটু খাতির করেন।'

'ঠিক আছে আর বিরক্ত করব না।'

কয়েক ঘন্টার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করল নির্মাল্য। না--এইভাবে হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে গেলে চলবে না। আর্দালির পথটা আদৌ কোন পথ নয়, যদিও ওটাই বাস্তব। চলে যাওয়া যুবকদের মাঝে বিদ্রোহের যে আগুন দেখেছে, তা আরও বেগে ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে। ক্ষমতার সিংহাসনে বসে যারা জনগণের সমস্যা সম্পর্কে নীরব তাদের ঘুম সত্যিই কেড়ে নিতে হবে। ওদের অর্থের একটা অংশ যদি বেকার যুবকেরা নেয়, তবে অপরাধ কোথায়? বেকারদের মিলিত শক্তি নিয়েই তৈরি করতে হবে বারুদঘর। তারপর অভিযান। মিথ্যা, শোষণ, আর ভাঁওতার আবর্জনা না সরালে যুব সমাজের মুক্তি নেই। বোঝাতে হবে একজন না বাঁচলে অপর জনও বাঁচবে না। দেশের আইন, সে কেবল কিছু হতভাগ্য মানুষের জন্য, বাবুদের জন্য নয়।

চিন্তার লাভাস্রোত রক্তের মাঝে বইতে বইতে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হ'ল নির্ম্মাল্য। এখন যে আর কোন ভয়ই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। পর্দার সামনে উঁকি মেরে একবার দেখল। যদিও উপরে লেখা আছে 'নো এনট্রান্স' তবুও বলল—'ভিতরে আসতে পারি স্যার।'

কোন উত্তর নেই। অফিসার ভদ্রলোক শুধু একবার মুখ তুলে সামনের দিকে তাকালেন।

পর্দাটা সরিয়ে সরাসরি সামনে এসে দাঁড়াল নির্মাল্য। 'স্যার, আমাদের ভাইভাটা কবে হবে বলতে পারেন?'

'নোটিশ থেকে দেখে নিন। এখানে আসতে দিল কে?'

"কেউ দেয়নি, আমি নিজেই এসেছি।"

"কোন কথা শুনতে চাইনা। চলে যান আগে।"

"খানিক আগে এক ভদ্রলোককে এখানে আসতে দেখেছি, তাকে তো এ কথা বলেন নি। সব দেখেছি, সব শুনেছি। তাই এলাম।" উত্তেজনায় কাঁপছিল সারা শরীর।

"ওসব কথা শুনিয়ে লাভ নেই। যাবেন কি না বলুন।"

"হাঁ যাব তার আগে জানতে চাই নিয়োগটা নিরপেক্ষভাবে করা হবে তো?"

"আচ্ছা পাগল তো, এ প্রশ্ন কেন?"

"আমার চোখের সামনে একটু আগের নাটকটা কি এক্ষুণি ভুলে যেতে পারি।"

চোখমুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল অফিসারের, কলিং বেল টিপে চেঁচিয়ে উঠলেন।

—'হরিশ, এই বদ্‌মাশ্‌টাকে বাইরে বের করে দাও।'

হাঁপাচ্ছিল নির্মাল্য। 'গালাগাল দেবার অধিকার আপনার নেই। ভাল করে শুনে রাখুন, আজকের সব কথাবার্তা আমি টেপ করে রেখেছি।'

তাড়াতাড়ি হাতে ফোনটা তুলে নিলেন অফিসার। "দেখাচ্ছি মজাটা, স্কাউন্ড্রেল কোথাকার, আমাকে ব্লাকমেল করার আগে এ্যারেষ্ট করাব।"

"তারপর আর কি করবেন?" মরিয়ার মত কথাগুলো বলল নির্মাল্য।

আর কিছু বলার আগেই সিকিউরিটি গার্ড হরিশ এসে জামার কলারটা ধরে সজোরে একটা চড় কশিয়ে দিল গালে।

"আগে উদ্ধার কর টেপ রেকর্ডারটা, গুণ্ডা ওটা লুকিয়ে ফেলেছে।"

উত্তেজিত অফিসারের চোখ দুটো তখন বাঘের মতো জ্বলছে।

'মিথ্যে কথা।' চেঁচিয়ে উঠল নির্মাল্য। গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ সিঁদুরের রেখার মতো ফুটে উঠেছে।

সবল পেশিতে জামার কলার ধরে সিকিওরিটি গার্ড ওকে টানতে টানতে আনল বাইরে। এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল। 'দে শালা, আগে টেপ রেকর্ডারটা দে। নচেৎ এক্ষুণি জানে খতম করে দেব। ভয় দেখিয়ে চাকরি নিতে চাস্।'

কোথায় পাবে টেপ রেকর্ডার। একটা বুদ্ধিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে সত্যের প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে গিয়েছিল নির্মাল্য। এমনি করে প্রতিদান জুটবে আশা করে নি। অসহ্য যন্ত্রণায় পা দুটো জড়িয়ে ধরল, 'বিশ্বাস কর, ও সব আমি নিই নি।' ঠোঁটের একদিক কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল মুখ।

শরীরের নানা জায়গায় টেপাটেপি করেও কিছুই খুঁজে পেল না গার্ড। ওর কান্না ঝরা মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোবার মত হয়ে গিয়ে অস্ফুটে বলল—'তাহলে!'।

বাইরে ইতিমধ্যে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলে কানাকানি করছিল — 'লোকটা হয়তো সন্ত্রাসবাদী, অফিসারকে খুন করার জন্য এসেছিল।'

পুলিশের ভ্যানে তুলছিল নির্মাল্যকে। অত্যাচার শরীরের নানা অংশে ফুটে উঠেছে।

কয়েক শ'চোখ দেখছে শ্যেন দৃষ্টিতে, মুখে বিদ্রুপের হাসি। মনে হয় ছোঁড়াটা ইন্‌স্যানিটিতে ভুগছে।'

হাতে হাতকড়া, এসব কিছুই শুনতে পাচ্ছে না নির্মাল্য। গাড়িটা স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে সিংহের মত গর্জন করে উঠল— "আবার ফিরে আসছি।"

সারাটা দিন কোন খাবার জুটুক বা না জুটুক বিকাল বেলা এক কাপ চা অন্ততঃ চাই। জীবনের অনেক কিছুই বদলে গিয়েছিল কিন্তু বদলায় নি কেবল এই চায়ের নেশাটা। এরই জন্য প্রায় একটি ঘন্টা ওত পেতে বসেছিলেন সুকান্তবাবু। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ এল না তাঁর কামরার দিকে। ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার ঘর ছুঁয়ে গেল। কিছুটা অভিমান জাগল মনে। একজন রিটায়ার্ড ম্যানের জন্য এ সংসারে কেউ নেই। অথচ সারাটা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গাড়ি, বাড়ি, সম্পত্তি সব কিছু করেছেন। যতদিন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন তত দিন কোন অভাব বা সমস্যার মুখে পড়তে হয় নি। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আসল ছবিটা ফুটে উঠল ধীরে ধীরে। ছেলে বা বৌমারা আসে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় কথা বলতে, নাতি-নাতনিরা আসে পেনসনের টাকাগুলোয় ভাগ বসাতে। কিন্তু কেউ প্রকৃত সাথির মত বসে দুটো মনের কথা বলে না, তাড়াতাড়ি পালায়। বলা যেতে পারে সুকান্তবাবু এখন ভীষণ ভাবে একা। মনে হয় সাধু সন্ন্যাসীদেরও এমন একা একা থাকতে হয় না। সামান্য চাট্টি ভাতের আশায় দুপুরটা কেটে যায়। ভাগের ভাত, বৌমারা পালা করে মাস-কাবারি যোগান দেয়। সারাক্ষণ নিজেই নিজের সঙ্গী, পুরানো স্মৃতিগুলো উলটে পালটে সকাল সন্ধ্যা ও দুপুর কাটানো। কিন্তু সেগুলোও কেমন ফিকে হয়ে আসছে। বাইরে গেলে তবু কিছুটা স্বস্তি মেলে।

ভগবানকে ধন্যবাদ দেন সুকান্তবাবু। এই বাহাত্তর বছর বয়সে হাত-পা চলছে, এখনও অবশ হয়ে যায় নি। হলে কি হ'ত। ভয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলেন।

নেই আসুক চা। রাধা বোষ্টমির দোকানে খেয়ে নেবেন। জামা-কাপড় পরে ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুকান্তবাবু। চিরকালের অভ্যাসমত একটু ফিট্‌ফাট থাকেন বলে বাড়িতে আড়ালে আবডালে আলোচনা কম হয় না। বলে হিরোইন্‌ জুটলে আর একটা রোমান্টিক নোভেল তৈরি হয়ে যেত। সব কিছুই আসে কানে। দুঃখ শুধু একটি জায়গায়, এতখানি বয়সেও পৃথিবীর অদ্ভুত গতিপ্রকৃতির কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না।

সন্ধ্যা নামতে দেরি আছে। তার আগেই মুণ্ডেশ্বরীর দু'তীরের ঝাউবনে সোনালি আলোর মেলা শুরু হয়ে গেছে। ঝির ঝিরে বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলছে। বাঁধের কোল ঘেঁসে বইছে নদী, ছোট ছোট ঢেউ, তার মাথায় আলোর দোল দোলানি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন সুকান্তবাবু। ভাবেন মানুষ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী চির নতুন, সর্বত্র তার যৌবনদীপ্ত রূপ। এই সব দেখার জন্যই মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। এর মাঝেই আছে মনের যাবতীয় খোরাক।

খেয়াঘাটের কাছাকাছি রাধা বোষ্টমির চায়ের দোকান। বোষ্টমি নিজ হাতে চা বানায়। বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। ওর জীবনের সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পান সুকান্তবাবু। স্বামিহারা হওয়ার পর ছেলেমেয়েদের মাধুকরী করে মানুষ করেছে। কিন্তু সব স্বপ্ন এবং আশা ভাঙচুর হয়ে গেছে। ছেলেরা বিয়ে করে বউ নিয়ে কেটে পড়েছে হাওড়ায়, কোলকাতায়, দুর্গাপুরে। মেয়েরা চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ কারও নেই। বৃদ্ধা মায়ের দায়িত্ব কেউ নেয় নি, কেউ নিতেও আসে না। বাঁচতে তো হবে, তাই এই ছোট চায়ের দোকানটা খুলে বসেছে। যারা খদ্দের হিসাবে আসে তারা সবাই ওর আপন। ও যেন আজও দুঃখের কাছে হার মানে নি।

'নাও, বোষ্টমিদি, তোমার ব্রজের ঠাকুরের নাম করে এক কাপ চা করে ফেল।' তাড়াতাড়ি টুলটা এনে দিল রাধা। 'বসুন মাষ্টার মশাই, আমি খুব ভাল করে চা করে দিচ্ছি।' মুখে সেই দুঃখজয়ী অপূর্ব হাসি।

'আমি রোজই তোমাকে দেখি। তুমি আপন আনন্দেই থাক, সবাই যেন আপন।'

'কি নিয়ে বাঁচবো বলুন। নেই বা কেউ আপন হ'ল, আপন বলে মেনে নিতে দোষ কোথায়? আপনারাই আমার ঠাকুর।'

সুকান্তবাবু রাধার কথাগুলো শুনতে শুনতে অবাক হয়ে মুখখানার দিকে তাকান। মনে হয় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আপন আনন্দে ওর ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে এক মহাপ্রেমের ধারা। মনে মনে তারই সন্ধান করতে চেষ্টা করেন।

'মাষ্টারবাবু চা।' চায়ের কাপ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রাধা।

সম্বিৎ ফিরে পান সুকান্তবাবু। চায়ের কাপটা নিয়ে একটা চুমুক দেন। মনটা জুড়িয়ে যায়, সারা দিনের ক্ষোভ অভিমান এখন আর মনের উপর দাগ কাটে না। 'রাধাদি, তোমার চায়ে যেন জাদু আছে। দ্যাখো না, আমি ঠিক এই মুহূর্তে আরও এক মাইল হেঁটে যেতে পারি।'

রাধা বিনীত হাসি হাসে। কোন কথা বলে না।

মুহূর্তে বদলে যান সুকান্তবাবু। বাড়ির সবার আচরণগুলো মনে পড়ে যায়। কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করেন, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

'বাবু রাগ করলেন?'

'না রাধাদি, আমি রোজ আসব।'

কথা শুনে খুশি হয় রাধা। 'ঠিক আসবেন বাবু। আমি রোজ এই রকম করে চা তৈরি করে দেব। তাছাড়া মনটাও তো বাঁচবে। আমরা মেয়েমানুষ, মুখের দিকে তাকালে অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

সুকান্তবাবু বিস্মিত হন। মনে হয় জীবনের শেষ বেলাটায় মেঘের ভীষণ জটলা, তবু তারই বুক চিরে জেগে ওঠা শুকতারা নতুন করে দিন শুরু করার আমন্ত্রণ এনে দিচ্ছে।

সন্ধ্যার ছায়া নামছে। ধীর পায়ে বাড়ি ফিরছেন সুকান্তবাবু। আবার সেই মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হন। এতক্ষণ তবু অন্য জগতে ছিলেন। আবার সেই নিঃসঙ্গ খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়া। ভাবেন রাধা বোষ্টমির ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁকে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বা ডায়ালেক্‌টিক্

মেটিরিয়ালিজমে যারা বিশ্বাসী তারা ঈশ্বর মানেন না কিন্তু জীবনের সব প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেন না। মনে হয় ঈশ্বরচিন্তা মানুষের বুড়ো বয়সে বন্ধুর মত কাজ করে। তার অসম্ভব শক্তি, সব দুঃখ দু'হাত দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। চিন্তার বোঝাটা অনেকখানি হালকা হয়ে যায়। বোষ্টমি তার প্রমাণ।

বাড়িতে ফেরার কিছুক্ষণ পরে মেজ বৌমা চা নিয়ে আসে। 'আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বিকালে আসতে পারিনি।'

মুখখানা ফেরানোর আগেই সুকান্তবাবু দেখেন বৌমা চলে গেছে। চায়ের কাপটা নিয়ে চুমুক দেন যন্ত্রচালিতের মত। একটু আগের চায়ের মত সুন্দর স্বাদটা এর মাঝে খুঁজে পান না।

বোষ্টমির দোকানে চা খাওয়ার খবর বাড়িতে পৌঁছে যায়। ছোট ছেলে এসে আপত্তি জানায়। 'আপনি বাইরে ওভাবে চা খেলে আমাদের কি সম্মান থাকবে? আর খাবেন না।'

রাগে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠে সুকান্তবাবু। 'মান সম্মান জ্ঞানটা আমারও আছে। তবে কি জান, ঐ বোঝাটা আমার পক্ষে এখন ভীষণ ভারী। তুমি এখন নিজেকে নিয়ে ভাবতে পার।'

এই ঘটনার পর থেকে শুরু হল হাসাহাসি আর কানাকানি। সব কিছু জানেন সুকান্তবাবু। জানেন বলেই ঘেন্না ধরে গেছে সংসারটার উপর। এ যেন আপন হাতে গড়া ফাঙ্কেন্স্টাইন, এতদিন পরে গলা টিপে মারতে আসছে।

এই তো সেদিন অভিমানে খাননি সারাদিন। সবাই এর জন্য গরম কথা শুনিয়ে গেল। 'ভাল না লাগলে অন্য কোথাও যান। আমাদের অত সাধাসাধি করার ক্ষমতা নেই।' পরাজয়, ভীষণ পরাজয়। চোখে জল এসে গেল। সম্পূর্ণ অভুক্ত থেকেই বেরিয়ে পড়েছিলেন মুণ্ডেশ্বরীর দিকে।

ক্লান্ত পায়ে বোষ্টমির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'এক কাপ চা দাও রাধাদি।'

'একি মাষ্টারবাবু, মুখ এত শুকনো কেন? সারাদিন কিছু খাননি মনে

হচ্ছে!' কথাগুলো আর্ত চীৎকারের মত শোনাল।

মনে হ'ল দিনের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। এ আত্মীয়তার পরশ একমাত্র স্ত্রী সুতপার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। 'না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। দাও, এক কাপ চা দাও।' বিষণ্ণ হাসিটা কোনমতে গোপন করতে পারলেন না।

বোষ্টমি চায়ের কাপটা হাতে তুলে দেবার আগে বোয়েম থেকে চারখানা বিস্কুট নিয়ে দিল। ম্লান হাসি নিয়ে বলল, 'মাষ্টারবাবু, এগুলোর দাম আমি কিন্তু নেব না।'

'তুমি গরিব মানুষ, দাম না দিলে অন্যায় হবে।'

'আমরা গরিব, এটাই আপনাদের অহঙ্কার, মনে রাখবেন আমরাও মানুষ।'

কিছু বলতে পারেন নি সুকান্তবাবু। কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারেন নি। ইচ্ছে করেই অন্য দিনের থেকে আজ একটু বেশিক্ষণ বসলেন। মনের ব্যথাটুকু এই রাধাদি ছাড়া আর কেউ বুঝতে চায়নি।

'এ সব তোমাকে শেখালে কে?'

'আমাকে কেউ এ সব বলে দেয়নি গো বাবু, আমি নিজেই এসব জেনেছি।'

ফেরার সময় বার বার মনে হচ্ছিল বোষ্টমির কথা। মানুষ যদি কাঠ, পাথর বা কোন মূর্তিকে দেবতা মনে করে এতবড় সান্ত্বনা পায় তবে তার মূল্য কম কিসে। ভালবাসা, দয়া, মমতা নিয়ে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয় তবে অকারণে তাকে বিসর্জন দেবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

বাড়ি ফিরে দেখলেন সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন থমথমে। কারণ অনুসন্ধান করতে হ'ল না। ছোট বৌমা এসে জানিয়ে গেল, 'আমরা সব শুনেছি, বোষ্টমির প্রেমে হাবুডুবু খেলে ঘরের খাবারে অরুচি ধরবেই। ছিঃ! ছিঃ! শেষপর্যন্ত এই!'

কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন সুকান্তবাবু। কিন্তু বলা হ'ল না, ঠোঁটটা

কয়েকবার কেঁপে উঠল মাত্র। মাথা ঘুরে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন মেঝের উপর।

সেই অবস্থাতেই কাটল সারাটা রাত। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত চলল জীবন মৃত্যুর পাঞ্জা কষাকষি। ঠিক বিকালবেলায় সব চাওয়া-পাওয়াকে পিছনে ফেলে চলে গেলেন সুকান্তবাবু। সারা বাড়িটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে ভিতরে ভিতরে খুশির জোয়ারে ভেসে গেল। কিন্তু লোকে যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য শোকের মাত্রাটা একটু বেশি করে দেখান হল। প্রতিবেশীরা সবার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দেখে অবাক হল।

কেবল বাড়ির সেই আধপাগলা কিষাণটা জামাকাপড় বেঁধে দেশে ফিরে যাবার সময় মনের ভাবটুকু গোপন করতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলল--'অমন ভাল মানুষটাকে কেউ দেখতে পারত না।'

বড় মানুষদের বাড়িতে সামান্য চা খাওয়া নিয়ে এত কাণ্ড ঘটতে পারে এটা এক প্রকার অনুমানের বাইরে ছিল। আজ বুড়ো মানুষটাকে খায়াবার আশায় একটুখানি সুজি বানিয়ে রেখেছিল বোষ্টমি। কিন্তু অন্তিম যাত্রার দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলল। চাপতে পারল না মনের আবেগ। 'তুমি চলে গেলে মাষ্টারবাবু। সব দিয়ে কি পেলে তুমি?'

মুণ্ডেশ্বরীর তীরে চিতার আগুনে চিরতরে বিলীন হলেন বৃদ্ধ সুকান্তবাবু। ওরা দাহ কার্য শেষ করে চলে গেল।

দিনান্তের শেষ আলো নিভে আসছে। আকাশে ধরা পড়ছে চাঁদ তারার উপস্থিতি। হিন্দুদের মাঝে একটা ধর্মীয় সংস্কার আছে। তারা মনে করে অন্তিম সংস্কারের দিনে মৃতের জন্য প্রিয়তম খাদ্যদ্রব্যগুলো চিতার পাশে রেখে আসতে হয়, এতে আত্মার শান্তি হয়। বোষ্টমি ভাবল সে পর হলেও মনের দিক থেকে আপন। অতএব এই সন্ধ্যার নির্জনতায় ঐ চিতার পাশে যেতে বাধা কোথায়? সেই সুজিটা একটা পলিপ্যাকে ভরল, বোয়েমে যতগুলো নোনতা বিস্কুট ছিল সব নিল, এবার শুধু দুধ দিয়ে ভাল করে এক কাপ চা তৈরি করল।

তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল নির্জন জায়গাটিতে। দেখল একটা মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়েছে চিতার পোড়া মাটি এবং কয়লা দিয়ে। চতুর্দিকে ফুল আর ফুলের মালা। তখনো ধূপকাঠিগুলো পুড়ছে। সুজি, বিস্কুট এবং

চায়ের কাপটা রাখল মাথার কাছে। প্রতিদিনের মত তার ব্যবহার আজও সেই একই রকম। 'তুমি বড় দুঃখী মাষ্টারবাবু, শেষ বয়সে কেউ কোনদিন আদর করে তোমায় কিছু দেয়নি। কেউ তোমাকে বুঝতে চায়নি। তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু তুমিও যে গোপীনাথ। আমার এগুলো তুমি খেয়ে নিও।'

বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির উপর দিয়ে এলোমেলোভাবে চলতে চলতে কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়ল। কেউ জানল না, শুকনো বালি নিমেষে তা মুছে দিল।

অভিসার

তীরের ফলার মত জল এসে গায়ে বিঁধতেই তাড়াতাড়ি লাফ মেরে ফাটলটা পেরিয়ে গেল অনন্ত। হ্যারিকেন আর কোদাল যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। নেবার সময়টুকুও মিলল না। মরি বাঁচি করে বাঁধের উপর উঠে এসে চিৎকার করে উঠল--'বাঁধ ভেঙে গেছে।'

সরাসরি ভাঙনের মুখে যে পড়ে একমাত্র সেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা কী ভয়ঙ্কর। নিতান্ত বরাত জোর তাই বেঁচে গেল এ যাত্রায়। বিপদটা কাটিয়ে উঠলেও ভয়ে বুকখানা ঘন ঘন ওঠানামা করছিল। নীলিমার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ভিজে মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। মুণ্ডেশ্বরীর জল ধাক্কা মেরে না জাগালে কোথায় তলিয়ে যেত কে জানে।

এতখানি মৃত্যুভয় দেখে অবাক হচ্ছিল অনন্ত। একটু আগেই তো সে চাইছিল জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে যাক। প্রতিদিন অজস্র দুঃখকে সঙ্গী করে বেঁচে থেকে কী লাভ। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেও তো কিছু হ'ল না।

দিন মজুরের ছেলে হয়ে জন্মেছিল, দিন মজুরই রয়ে গেল। যে নীলিমাকে ঘিরে জীবন অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখত তাকেও আপন করে নিতে পারে নি। সরে আসতে হয়েছে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। চোখের জলে বিদায় নিয়েছে সে। তার মত মানুষের জীবনে ভালবাসা নামক নরম বস্তুটার কোন মূল্য নেই। যাক্, সব ভেসে যাক্, কী আসে যায় তার। তীব্র এক অভিমানে বন্যার ভয়াবহতাকে স্বাগত জানাল মনে মনে।

বাঁধ ভাঙার দুঃসংবাদ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শেষ রাতের বাতাসে। গাঁয়ের মানুষ জেগে উঠল ভয়ার্ত চিৎকারে। জ্বলে উঠল শত শত আলো। ভয়ঙ্কর রাত্রির সে এক অপরূপ রূপ। মনে হল ঐ চাঁদ সমেত তারায় ভরা উপরের আকাশটা নেমে এসেছে মাটির বুকে। এমন দৃশ্য অনেকদিন সে

দেখে নি।

অনেকখানি স্বাভাবিক হ'ল অনন্ত। সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগল মুণ্ডেশ্বরীর তাণ্ডব। মেঘ গর্জনে জল আছড়ে পড়ছে সম্মুখে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে যে শিমূল গাছটার তলায় শুয়ে সে নিজস্ব চিন্তার মাঝে ডুবে গিয়েছিল অতি সহজেই সেটা লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। প্রবল জলস্রোত গাছ সমেত বাঁধের বিরাট এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল। কতকালের বিরাট গাছটা পাক খেতে খেতে পলকে উধাও। গত পাঁচদিন ধরে এই বাঁধ রক্ষার সব চেষ্টা শেষ।

যারা আলো নিয়ে বাঁধ পাহারা দিচ্ছিল অবস্থা বুঝে তারা সবাই প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুটছিল। কারণ তারা জানে এই বন্যার জল গ্রাস করবে গ্রামের পর গ্রাম। তার আগে মালপত্র নিয়ে দামোদরের উঁচু বাঁধে না উঠলে নিস্তার নেই।

কোন রকমের ব্যস্ততার শিকার হ'ল না অনন্ত। পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে, উঠতেই চায় না। মুণ্ডেশ্বরী এখন তার সামনে এনে দিয়েছে অফুরন্ত অবসর। স্মৃতির আলপনায় ক্ষতবিক্ষত মনটাকে নতুন করে সাজাবার এমন সুযোগ তো আর বারে বারে আসবে না। সবার অলক্ষ্যে চাঁদনি রাতের এই প্রসন্ন আলোয় নদীর আসল রূপটা সে একবার দেখে নিতে চায়। নীলিমার কথাগুলো আজ যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। বিশাল জলস্রোত দশবার ফুট উঁচু হয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে। কী দুরন্ত গতি। লক্ষ লক্ষ ঢেউ। লাখো লাখো চাঁদ খেলা করছে তার মাথায়। শুকতারা জেগে উঠেছে পূব আকাশে। সেও যেন নীরবে দেখছে মদমত্তা মুণ্ডেশ্বরীর অভিসার। এ নদী কোন বাধা মানবে না, মানতে চায় না। বর্তমানকে ঘিরে সেই দুরন্ত অতীত এই বন্যার মতো প্রবল উচ্ছ্বাসে আবার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এ যেন তাকে ডাকছে।

তখনো ছিল ঠিক এই রকমই দিগন্ত জোড়া প্লাবন। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু জল আর জল। জীবজন্তু, মানুষ সবাই আশ্রয় নিয়েছিল দামোদরের বাঁধে। অতীতের সেই দিনগুলোতে কী ভীষণ অসহায় অবস্থা সবার। যারা দুর্বৃত্ত

তারা কিন্তু তখনো দুর্বৃত্তগিরি ভুলে নি। কেউ নৌকা নিয়ে, কেউ বা ভেলায় চড়ে চুরি করে বেড়াচ্ছিল জেগে থাকা নারিকেল গাছের সমস্ত ফল, আরো অন্য কিছু।

সেদিনের সেই মধুর স্মৃতি আবার ভেসে উঠে সামনে। শিরায়, শিরায়, রক্তের প্রতিটি কণিকায় জাগে আনন্দের থৈ থৈ প্লাবন। মন যেন ভেলা নিয়ে আবার পাড়ি জমাতে চায়।

"অনন্তদা ভেলা নিয়ে তোমাকে একবার যেতেই হবে আমাদের ভিটেয়। না গেলে বন্যার হাত থেকে কিছুই আর রক্ষা করা যাবে না।" সম্মতির অপেক্ষায় করুণভাবে তাকাল মুখের দিকে।

লগিটা হাতে তুলে নিতেই মুখে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ হাসি। "বাবা ঠিকই বলেছিল, তুই একবার যা না, বললেই আসবে।"

কপট অভিমানে লগিটা ফেলে দিল অনন্ত।

"তোমাদের খেত মজুর বলে আমি কি চাকর নাকি যে সব সময় হুকুম মেনে চলব।"

'আমি কি তাই বললুম? আগে চল দেখি, পরে যা বলার আছে বলবে।' একরকম জোর করেই টানতে টানতে ভেলার কাছে নিয়ে গেল নীলিমা। 'নাও, লগি নিয়ে ভাল মানুষটির মত ভেলায় উঠে পড়।'

ভেলা বাইছিল অনন্ত, নীলিমা ভেলার উপর বসে ছিল। মোটা মোটা বীচি কলার গাছ দিয়ে তৈরি ভেলা। বন্যার সময় সাধারণ মানুষের কাছে এটাই নৌকা, ব্যালান্স রেখে চললে কাতিয়ে যাবার বা ডুববার কোন ভয় নেই। চারপাশ সমুদ্রের মত, বাতাসের হিস্ হিস্ শব্দ প্রাণে ভয় ধরিয়ে দেয়, ঠিক যেন লক্ষ সাপের কানাকানি। সাবধানে না আগালে বিপদ যে কোন মুহূর্তে।

স্রোত কাটিয়ে ভেলা খুব ধীর গতিতে আগাচ্ছিল। প্রশ্ন করেছিল অনন্ত, 'তোমার ভয় করে না?' 'কেন, তুমি তো আছ, ভয় কিসের?' নির্মল হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল ওর সারাটা মুখে। দিনশেষের আলোয় সে যেন আরও

বেশি সুন্দর।

'যদি ভেলা উলটে যায়?' পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সাহস পরখ করার জন্যে।

'তুমি তুলতে পারবে না জল থেকে?' উত্তরের অপেক্ষায় নীলিমা অপলক।

'পারব না মানে।' ভুবনবিজয়ী সম্রাটের মত দীপ্ত হাসিতে সেদিন সে কথাগুলো বলেছিল। আবেগে এ মন তখন এক উচ্ছ্বসিত নদ। 'তুমি দেখে নিও, আমি সারা জীবন তোমার পাশে আছি।'

নীলিমা কথার মর্মটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিল। সুন্দর এক লজ্জায় ওর শ্যামবর্ণ মুখখানা দূরের আকাশটার মত সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

বাঁধনহারা মুণ্ডেশ্বরীর রূপটা দেখছিল অনন্ত। জলের ভাষায় কেমন সুন্দর করে লিখছে যৌবনের কাব্যকথা। গাইছে বিরহের গান, প্রার্থিত মিলনের আশায় কী ভীষণ চঞ্চল, দুর্বার। ভালবাসা সবাইকে বুঝি এমন ভাবেই পাগল করে তুলে।

সেদিনও ধাবিতা ছিল এই উন্মত্তা নদী, আকাশে ছিল আলোছায়ার দৃষ্টিনন্দন রূপ। ভেলা চলছিল। কাঁপছিল বাতাস। কাঁপছিল তার যৌবনভরা নিটোল বুক। কোন কথাই কেউ বলছিল না। অথচ সব বলা হয়ে যাচ্ছিল।

ওর দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'কী দেখছো ওদিকে অমন করে?'

'জল।'

খুশিতে ভরে উঠল নীলিমা। 'দ্যাখো চারপাশ কেমন একাকার হয়ে গেছে। এপাশে মুণ্ডেশ্বরী ওপাশে দামোদর—দুজনে মিলেমিশে একাকার। এখন আর আলাদা করে চেনাই যায় না।'

'বেশি বৃষ্টি হলে বন্যার সময় ওরকম হয়।'

'তুমি কিচ্ছু জানো না' বিজ্ঞের মতো হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল। 'ভীষণ বোকার মত উত্তর দিলে।'

'অতই যদি জান, বল না দেখি কারণটা কি?'

'বুঝেছি রাগ করলে আমার কথায়।'

লজ্জাবতী লতার মত নীলিমা নিজেকে গুটিয়ে নিল মুহূর্তে, আর কিছু বলল না।

মান ভাঙানোর জন্য তাকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল, 'কারণটা না বললে আমি কিন্তু রাগ করব।'

কিছুটা অভয় পেয়ে আবার মুখে ফুটে উঠল হাসি। 'বিশ্বাস করলে বলব, নচেৎ নয়।'

'বিশ্বাস করব না মানে! বলতেই হবে তোমাকে।' অজানা কারণটা জানার জন্যে প্রচণ্ড একটা জিদ্ চেপে গিয়েছিল তখন।

'তা হলে বলি, শোন।' অন্তরঙ্গতায় নীলিমা যেন নিবিড়। ইতস্তত ভাবটা কেটে গিয়ে বলতে শুরু করল—'ঠাক্মা আমায় বলেছিল দামোদর আর মুণ্ডেশ্বরী—এরা দুজনে স্বামী স্ত্রী। বর্ষায় জল পেলে মুণ্ডেশ্বরী রূপ ফিরে পায়। তখন আর একা থাকতে চায় না। মানুষের তৈরি বাঁধ ভেঙে, স্বামীর সঙ্গে মিলবার জন্য ছুটে আসে। মিলনের পর শান্ত হয়।

এমন একটা রূপক কোন দিনই কল্পনায় জাগেনি তার। গল্প হলেও শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে।

'কেমন লাগল?'

'কল্পনাটা মন্দ নয়।'

'না গো এটা গল্প নয়, সত্যি কথা।' সংশয় দূর করার মত সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ে ওর সারাটা মুখ জ্বল জ্বল করছিল।

অনন্তর হাতের লগির নড়াচড়া স্তব্ধ হল। আপন অগোচরে দেখছিল ওকে। ওর বুকের গোপনে লুকিয়ে আছে কোন এক দুরন্ত মুণ্ডেশ্বরী, অতলের ডাকে সাড়া দিতে পারে।

'নীলিমা!' স্বরটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। জলের সেই অন্তহীন

কানাকানিও তখন যেন নীরব।

ডাক শুনে মাথা নীচু করে রইল নীলিমা। সাড়া দিতেও ভুলে গিয়েছিল।

নিজেরই তপ্ত প্রশ্বাসগুলো বুকের উন্মত্ত প্রদেশ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। নীলিমাকে ঘিরে এই চোখদুটো সেদিন এঁকেছিল এক অনিন্দ্য প্রতিমা।

দূরে হৈ চৈ ক্রমশ বাড়ছিল। গরুবাছুরের হাম্বা রবও কানে আসছিল। নিকটে প্রবল জলস্রোতে বাঁধ ভাঙার গুম্ গুম্ শব্দ। ভয়ে একজনও এদিক পানে আসে নি। ভালই হয়েছে তার। একা একা প্রাণভরে দেখবে জীবন মৃত্যুর অপরূপ খেলা। দেখবে ভালবাসা কেমন প্রবল আকর্ষণে দূরকে নিকট করে নেয়।

আবার পূর্বচিন্তায় ফিরে আসে অনন্ত। চোখের সামনে ভেসে উঠে নীলিমার ছবি। বিপুল জলরাশি যেন অনুরাগের গানে ভরিয়ে রেখেছে চার পাশের বাতাস। তারা চলছে কথামালার দেশ পেরিয়ে নীরব কোন সুদূরে।

হঠাৎ জলের উপর কিছু একটা পড়ার জোর শব্দে উভয়েই সচকিত হয়ে উঠেছিল। বৃত্তাকারে ছলকে উঠছিল জল। ভেলা তখন ভিটের প্রায় কাছাকাছি। ত্রাস্ত হয়ে উঠল নীলিমা, 'দ্যাখো, ঠিক কেউ আমাদের নারিকেল গাছের কাঁদি নামিয়েছে।'

ঘন ঘন লগি ফেলছিল অনন্ত। কিন্তু ভিটে পৌঁছাবার আগেই দেখল একটা ছোট পান্‌সি তীরবেগে কিছুটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঝুনো নারিকেলের ভাসমান বিরাট কাঁদিটা দেখা গেল পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে। উপস্থিতি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি চম্পট দিয়েছে, নিয়ে যেতে পারে নি। সফল অভিযানের আনন্দে উভয়ে তখন মুখর।

সবার অলক্ষ্যে আজ মুণ্ডেশ্বরী লিখছে তার সাধনার কাব্যকথা। এ দৃশ্য তাকে মাতাল করে দেয়। শুরু হয় প্রেমের পূজা। সমস্ত পরাজয় মুছে ফেলে আবার সে নতুন করে নীলিমাকে আবিষ্কার করে। এ নীলিমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ক্ষণে ক্ষণে মেঘের আর্বিভাবে আকাশজুড়ে আলোছায়ার লুকোচুরি

খেলা। যেই মেঘ সরে যায় অমনি চারপাশে দৃশ্যমান হয় অপরূপা ভয়ঙ্করী মুণ্ডেশ্বরী। অঙ্গে তার করাল রূপের অলঙ্কার। শাণিত কৃপাণ হাতে হা হা করে হাসছে। উন্মাদিনীর মতো নাচছে নৃমুণ্ডমালিনী, হরমনোমন্মোহিনী। সৃষ্টি রসাতলে যাক, কী আসে যায় তার? মিলনের পথে বাধার প্রাচীর গড়েছিল যে সব উদ্যত মানুষ' তাদের সৃষ্টিকে চূর্ণ করে দিয়ে, তাদেরই শবদেহে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে আজ সে দুর্বার গতিতে চলছে মিলন অভিসারে। এ দৃশ্য তাকে নতুন করে জাগায়।

ভাঙন বাড়তে বাড়তে দীর্ঘতর হয়। নিরাপত্তার কথা ভেবে ভেঁড়ি বাঁধ ছেড়ে দমোদরের পশ্চিমতীরের বাঁধে উঠে আসে অনন্ত। এখানের দৃশ্য কিছুটা অন্য রকম, কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর, আরো মনোরম। বাঁধের পূর্বদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মহারুদ্রের মত দামোদর। পশ্চিম দিকে আছড়ে পড়ছে বিরহিনী মুণ্ডেশ্বরী। কত বাধা পার হয়ে এসেছে সে। আর মাত্র চল্লিশ মিটারের ব্যবধান। শুনতে পাচ্ছে প্রিয়তমের ডাক। এতটুকু দেরিও আর সইছে না, তবুও কাছে যেতে পারছে না। অসহনীয় ব্যথায় শিবানীর বেশ ছেড়ে সে এখন ভীমা ভৈরবী। এ যে তার কান্না। এ কান্নার মর্ম বোঝে অনন্ত।

মনে পড়ে অতীতের সেই মুহূর্ত। সারাটি দিন আগুন জ্বলা রোদ্দুর! দামোদরের জলরেখার কোন চিহ্নই নেই। এখানে ওখানে বালিয়াড়ি আর সবুজ ঘাস। বিরাট টিয়াবনের পাশে হিজল গাছটায় হেলান দিয়ে দিন শেষের ক্লান্তি ঘুচাবার উপক্রম করছিল অনন্ত। নীল আকাশের কোল ঘেঁসে কালবোশেখির মেঘখানা এগিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। ভয়ে লুকিয়ে পড়ছিল আলোর ক্ষীণরেখা। দেখছিল অনন্ত।

প্রায় ছুটতে ছুটতে এলোচুলে উন্মাদিনীর মত এসে দাঁড়াল নীলিমা। দু'চোখে আগুনের ঝিলিক। 'খুব আনন্দে আছ, নয়। আগে বল আমাদের বাড়ি আর যাও নি কেন?'

আকস্মিক ঝড়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে অনন্ত শান্ত গলায় বলল, 'দেখছ না এখন যে ভীষণ কাজ।'

'তুমি কি মনে করেছ আমি কি একেবারেই বোকা, কিচ্ছু বুঝি না।

টিয়াবনের পাশে বসে দিব্যি হাওয়া খাওয়াও একটা কাজ।' তীব্র বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল ওর মলিন বিষণ্ণ মুখে। 'আচ্ছা ধরে নিলাম তোমার কথা সত্যি' কিন্তু কাজটাই কি সব, বাকি সব মিথ্যে।' উত্তরের আশায় মুখের দিকে তাকাল নীলিমা।

'না, তা নয়।'

'তা নয় মানে! আচ্ছা সত্যি করে বল তো তুমি কি আমাকে ভুলে যেতে চাইছ?'

উঠে পড়ে একেবারে ওর কাছটিতে এসে নিবিড় হবার চেষ্টা করতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীলিমা। 'আমাকে কষ্ট দিতে বুঝি খুব ভাল লাগে। জোর করে আমায় যদি সরিয়ে দাও, দেখবে আমি তখন বাঁচব না।'

এ মুণ্ডেশ্বরীকে দেখে বার বার মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা।

অলক্ষ্যে দৃষ্টি কেড়ে নেয় দামোদর। এ যেন আরো ভয়ঙ্কর। সতীহারা শিবের মতো উন্মাদ। বিপুল জলরাশি কঠিন আক্রোশে বারে বারে ফুলে উঠছে তা থৈ তা থৈ শব্দে। ধূম পিঙ্গল জটাজাল যেন ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। নাচছে শিব, নাচছে রুদ্র, নাচছে ভয়ংকর। পাহাড় ভেঙে চারিদিক ধ্বসে পড়ছে। চরাচর কাঁপছে। সতীকে তার চাই। সে যেন চিৎকার করে বলছে —দে দে সতী দে। কিন্তু সতীকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে নি। শেষে নিজেই গিয়ে সতীদেহ তুলে নিয়েছে কাঁধে। প্রবল ডমরু ধ্বনিতে নাদিত হচ্ছে বাতাস। এ যে তার দুঃখের তপস্যা।

তাপিত বিরহের আলোকে বড় সুন্দর মনে হচ্ছে দামোদরকে। অনন্ত ভাবতে থাকে সাধনা ছাড়া কখন মিলন হয় না; হতে পারে না। নীলিমাকে ভালবাসতে গিয়ে অনেক মূল্য দিয়েছে সে, আরো দেবে। ভালোবাসার স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেবে সম্পূর্ণ রূপে। নীলিমাকে সে ভুলতে চায় না, ভুলতে পারে না। যেমন সে ভুলতে পারে না নদীজল ছোঁয়া অসংখ্য প্রশ্নেভরা ঐ নীল আকাশটাকে। মেঘের কানাকানিতে ও আকাশ হারায় না, ক্ষণিক অদৃশ্য থাকে মাত্র।

একসময় এই দামোদরের দিকে তাকিয়ে নীলিমা প্রশ্ন করেছিল অনন্তকে, 'মানুষ কেন বুড়ো হয় বলতে পার?'

আকস্মিক এই অদ্ভুত প্রশ্নের চট্ পট্ উত্তর দিয়েছিল অনন্ত। 'বয়স হলে বুড়ো হবে, এটাই তো নিয়ম।'

উত্তর মনোপূত হয় নি নীলিমার। বলেছিল, 'আমার মনে হয় অন্য রকম। মানুষ বুড়ো হয় নতুন করে জন্ম নেবার জন্যে। কি, ঠিক না।'

আজও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। তবে মনে হয় নীলিমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

গ্রীষ্মে মৃত্যুর সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে যৌবনদীপ্ত এ দামোদর অন্য এক ইঙ্গিতবাহী।

সুদূরের প্রিয়াকে ঢেউয়ের শত হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

মনটা বড় ভারী হয়ে উঠে অনন্তর। আজ কেউ আর তাকে ডাকবে না। কিন্তু একদিন ডেকেছিল। মনে পড়ে নীলিমার শেষদিনের সেই মিনতিটুকু। 'কাল আমার বিয়ে। এখনো বলছি তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চল। তোমার জন্যে আমি সব অপমান সইতে পারি।'

কাল বৈশাখির ঝড়ে ডানা ভাঙা পাখির মত ছট্ পট্ করছিল। কালিপড়া দুটি চোখে অনেক ঘুমহারা রাতের ছাপ। শীর্ণ শরীর। এ কী দশা নীলিমার! উজ্জ্বল শ্যামের সেই অপূর্ব লাবণ্য কোথায়! একবার তাকিয়েই শিউরে উঠেছিল অনন্ত, দ্বিতীয়বার সাহস করে নি।

তবু নীলিমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পরাজিত নায়কের মত মাথা নীচু করে ধীর এবং শান্ত গলায় বলেছিল, 'জান তো আমি বেকার। এত বছর চেষ্টা করেও সামান্য একটা চাকরি জোটাতে পেরেছি কি? আমার দুঃখের মাঝে তোমাকে সারা জীবন বন্দি করে রাখা কি উচিত হবে?'

কান্নায় দুচোখ ভরে উঠল জলে। প্রতিটা শ্বাস পড়ছিল দীর্ঘশ্বাসের মত। "মেয়েরা কি চায় সে তুমি বুঝতে পারবে না। বোঝার ক্ষমতাও তোমার নেই। এতই যদি ভীরু তবে ভালোবাসতে গিয়েছিলে কেন?"

ক্ষণিক নীরবতা। তারপরেই তার সেই দপ্ করে জ্বলে উঠা আগুন যেন হঠাৎ নিভে গেল। অসহায় বোকার মতো একবার মুখের দিকে তাকাল। 'বেশ', আমি চলে যাচ্ছি। মনে রেখো তোমার নীলিমা মরে গেছে।'

আর দাঁড়ায় নি নীলিমা। পিছন ফিরেও তাকায় নি।

পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার পরও সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে নি। এক সময় সে আবিষ্কার করল তার চোখেও জল।

পারল না নীলিমার মনের সারথি হতে। যথাসময়ে শাঁখ বাজল, সানাই বাজল, নীলিমা চলে গেল পরের ঘরে।

জীবনটা যে এমন গভীরভাবে হাহাকার করে মরবে এতটা কিন্তু তখন বুঝতে পারে নি। অর্থহীন পৃথিবীর নীরব বাসিন্দার মত চলছিল দিন। গ্রীষ্মের কত সন্ধ্যায় দামোদরের শুকনো বালি ভিজে গেছে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে। ভুলতে পারে নি অতীতের সেই স্মৃতিগুলো। পারবেও না। বাঁচার মত অনেক কিছু উপহার দিয়ে গেছে নীলিমা। তার প্রত্যেকটি কথা জীবনের কাছে নতুন অর্থ বয়ে নিয়ে আসে।

ফরসা হয়ে আসছিল পূব আকাশ। একখানা রক্তিম মেঘের উপর উষার জন্য কে যেন আসন পেতে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল উভয় নদ-নদীর রূপ। ইচ্ছা হচ্ছিল আর কোথাও যাবে না। এইখানেই বসে থাকবে সারাটা বেলা।

সহসা মেঘগর্জনে স্তম্ভিত হল দিক। এ গর্জন রাতের দ্বিগুণ। চিন্তায় ছেদ পড়ল। আকাশ পানে তাকিয়ে দেখল ঠিক এ মুহূর্তে আকাশে ডেকে ওঠার মত মেঘের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। উল্লসিত কোলাহলের মাঝে কারা শাঁখ ঘন্টা বাজাল। ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না অনন্তর। সর্বশেষ বাধা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মুণ্ডেশ্বরী মিশে গেল দামোদরের সঙ্গে।

সকালের নরম আলোয় দেখা দিল মিলিত ধারার চোখ জুড়ান রূপ। দামোদরের গৈরিক বর্ণের স্রোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আবির মাখানো লাল জল। দিগন্তজোড়া দামোদর সার্থক নায়কের মত হাসছে। অপার বিস্ময় এবং

আনন্দে অপূর্ব এ মিলনদৃশ্য দেখতে লাগল অনন্ত।

অদূরের কোলাহল আবার তাকে ফিরিয়ে আনল ব্যস্ততার জগতে। দেখল ইতিমধ্যেই বাঁধের দুপাশে তৈরি হয়ে গেছে অসংখ্য কুঁড়ে। এখনো তৈরি হচ্ছে। চলমান সংসারগুলো এই সামান্য সময়টুকুর ফাঁকে নতুন এক কালোনি গড়ে তুলেছে। সামান্য একহাত জায়গা নিয়ে বিভেদ এমনই যে রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। মনে মনে হাসল অনন্ত। এত বিপদের মাঝেও মানুষ মনের আদিম চেহারাটা আদৌ বদলাতে পারেনি।

এই কোলাহলের মাঝে ক্ষুদ্র এক দ্বীপের মত অবস্থান করছিল দক্ষিণপাড়ার বুড়িটা। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল বুড়োটার জন্যে। ছেলেপুলে কেউ নেই। বিপদ বুঝে শুধু একটা হ্যারিকেন সম্বল করে বাঁধের দিকে দুজনে আসছিল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। খরস্রোতা মুণ্ডেশ্বরী লুফে নিল বুড়োটাকে। আর আসা হলো না। সুতীব্র হাহাকারে ভারী হয়ে উঠছিল বাতাস।

স্পিড্ বোটগুলোর আনাগোনা কদিন থেকেই ছিল। সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছিল বাঁধের সদ্যখোলা ত্রাণ শিবিরে। সেই সঙ্গে ভেসে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার, আবার কখনো বা জলবন্দি মানুষকে সাহায্য করার জন্য তারা ছিল ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। কোথাকার মড়া, কাদের মড়া—এসব নিয়ে ঔৎসুক্যও কম ছিল না। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠছিল নিজস্ব চিন্তা ভাবনায়।

বিশাল নদীবক্ষে ধ্বংসের অজস্র চিহ্ন, কোথাও ভেসে যাচ্ছে ঘরের চাল, জীবজন্তুর দেহ, গাছপালা, ফেণার স্তূপ, আরো কত কি। ধ্বংসের এই ক্লান্তিহীন মিছিল দেখতে দেখতে মনটা কেমন আলাদা হয়ে যায়, বৈরাগ্য জাগে। তবুও এরই মাঝ দিয়ে অসংখ্য যাত্রী নিয়ে তির্যকগতিতে ওপারের নৌকাগুলো আসছিল এপারে। বিপদ জেনে আপন জনের সংবাদ নিতে এগিয়ে আসছে আত্মীয় স্বজনের দল। অনন্ত জানে কেউ তার সংবাদ নিতে আসবে না। আপন নির্জনে সে চিরকালই একা থেকে যাবে। নীলিমা তাকে ভালোবাসা দিয়ে সম্রাট করে সাজিয়েছিল, আজ তার ফকিরের দীনবেশ মুছে দিতে কেউ নেই। উদাস মন অর্থহীন জীবনটাকে আর যেন বইতেই চায় না। মাঝে মাঝে

বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ভাবে ঐ দুরন্ত স্রোতে ঝাঁপ দিতে পারলেই আসবে তার মুক্তি। কী প্রয়োজন অন্যদের মত তাঁবু খাটাবার। মুণ্ডেশ্বরীর জল তার ঘরবাড়ি সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক্। কোন কিছুই সে উদ্ধারের চেষ্টা করবে না। ওদের মিলন উৎসবে ওগুলি তার উপহার। ওরা নতুন করে সাজুক।

চিন্তার জগতটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল অনন্ত। আজ নীলিমা কাছে থাকলে বলত, 'তোমার কথাই ঠিক। সত্যিই কোন বাধা মানে নি মুণ্ডেশ্বরী। একবার চেয়ে দ্যাখো কেমন বিজয়িনীর রূপ।' সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠে দূরের কোন এক গৃহকোণে বন্দিনী নীলিমার অন্য এক ছবি। শিউরে উঠে অনন্ত, সারা শরীর সঙ্কুচিত হয়। না—না, ঐ নীলিমাকে সে ভালবাসে না, বাসতেও চায় না, তার নীলিমা অনুরাগে, অভিমানে, আন্তরিকতায় ঠিক ঐ মুণ্ডেশ্বরীর মত। বেনো জলের বাতাস রক্তে যখন কাঁপন তুলে তখনই সে অভিসারে আসে।

বিয়ের পর অনন্ত আর কোন যোগাযোগ রাখে নি। সে চায় নীলিমা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। ভুলে যাক অনন্তকে। তার চলার পথে সে কাঁটা হতে চায় না। কিন্তু সময়ের ফাঁকে যে তথ্য তার কাছে এসেছিল তা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে কঠিন নির্য্যাতনে বিষিয়ে গেছে নীলিমার জীবন। প্রথম প্রেমের অনেক ক্ষতিকর কাহিনি নিয়ে কিছু ঈর্ষাকাতর মানুষ পরিকল্পিতভাবে পৌঁছে দিয়েছিল ওর শ্বশুর বাড়িতে। ফলে নীলিমাকে কেউ ভালমনে গ্রহণ করতে পারে নি। সিঁদুর মুছে, শাঁখা ভেঙে, বদনাম দিয়ে, চরম নির্যাতন করে বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছিল।

বন্যার জল ক্রমশ ফুলে উঠছিল। অশ্বথতলে বসে মুণ্ডেশ্বরীর ধাবমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাতের জাগরণ ক্লিষ্ট দেহটা এলিয়ে দেবার চেষ্টা করল অনন্ত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হারিয়ে গেল গভীর ঘুমের মাঝে।

ঘুমের ভিতর মধুর এক স্বপ্নের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল সারাটা মন। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নীলিমা। সারা মুখে আনন্দের ঢেউ। কী অপূর্ব হাসি হাসছে। 'কই উঠ! এখনো ঘুমাচ্ছ! বাইবে না তোমার ভেলা? আজ

কিন্তু ওদিকে নয়। আজ আমরা ভাসতে ভাসতে এ গ্রাম ছাড়িয়ে চলে যাব অনেক দূরে?

লগি হাতে নিজেই উঠে পড়েছে ভেলায়। টলমল করছে ভেলা, টলছে ওর শরীর, টলমল করছে জল। হাসিতে আর আনন্দে উপচে উঠছে নীলিমা। ডাকছে, 'এই' উঠে এসে লগি নাও।'

ওঠার আগে শপথ করিয়ে নিচ্ছিল নীলিমাকে—'আগে বল, তুমি আর কখনও হারিয়ে যাবে না।'

গলাটা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি চুপি বলছে, 'না, গো না, আমি তোমার মুণ্ডেশ্বরী, আমি কি তোমায় ভুলে থাকতে পারি।'

'ওঠো বাবা অনন্ত, তোমাকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

ডাক শুনে জেগে উঠল অনন্ত। নীলিমার হাসিমাখা মুখখানা তখনো স্পষ্ট। কিন্তু সামনে মাধব রায়কে যে বেশে দেখল তাতে স্বপ্নের সামান্য রেশটুকুও অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কাকাবাবু, আপনি এমন সময়!'

'তোমাকে যেতেই হবে বাবা। আমাদের নীলিমা আর নেই।' ''স্বামীর ঘরও জুটল না অভাগীর।'' কান্নায় ভেঙে পড়লেন মাধব রায়।

মুহূর্তে কেঁপে উঠল পৃথিবী। চোখের সামনে নেমে এল নিকষকালো অন্ধকার। 'কী বলছেন আপনি!'

'হ্যাঁ, বাবা সত্যি। ওর সাধের গরুটাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারল না।'' সেনাবাহিনীর লোকে মৃতদেহ উদ্ধার না করলে আমরা কি আর কোনকালে মায়ের খোঁজ পেতাম। মুণ্ডেশ্বরী সব কিছু কেড়ে নিল আমার।' আর কথা বলতে পারলেন না। চোখ দুটো কাপড়ের খুঁটে ঘন ঘন মুছতে লাগলেন।

দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সারা আকাশ জুড়ে মেঘের উৎসব। এতটুকুও নীলের চিহ্ন নেই। গুরু গুরু শব্দের মন্দিরা বাজছে চৌদিক কাঁপিয়ে। তালে তালে নাচছে মুণ্ডেশ্বরী। জলের উপর আঁধারের আস্তরণ। সমুদ্রের মত

কঠিন আক্রোশে ফুলে উঠছে জল।

আর সবার মত বাঁধে আশ্রয় নেন নি মাধব বাবু। উঁচু বাস্তুতে বিরাট মাচান বেঁধে থেকে গিয়েছিলেন।

প্রিয়জনেদের কান্না দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। অনন্ত জানত মা হারা এই মেয়েটির জন্য মাধববাবুর দুর্বলতা। সারাটা সময় একটাও কথা বলেনি, বলার মত শক্তিও ছিল না। ভেলা এসে ঠেকল ভিটেয়। মাচানের একপাশে শোয়ানো ছিল নীলিমার দেহ। এলায়িত চুল। উন্মিলিত দুটি চোখের সে কি বিস্ময়কর রূপ। যেন এখনো সে কারও অপেক্ষায় অপলক।

বৃষ্টি নামল মুষল ধারায়, বাতাসে ঝড়ের গতি। দুপুর পেরিয়ে বিকাল এল, সন্ধ্যা আর বেশি দূরে ছিল না। তবুও থামল না কোন কিছু, বরং প্রকৃতির রূপ আরও ভীষণ হয়ে উঠল। জেগে থাকা গাছের মাথাগুলো মাঝে মাঝে জলের উপর লুটিয়ে পড়ছিল।

'এ অবস্থায় কী করা যায়?' অসহায় চোখে অনন্তের দিকে তাকালেন মাধববাবু।

সারাক্ষণ চোখে জল নেই, মুখে বাক নেই। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছিল। "কি বাবা, কিছু বলছ না যে!"

এ ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল অনন্ত। 'একটা কথা রাখবেন?' করুণ মিনতি ঝরে পড়ল স্বরে। 'বল কি বলবে?'

'আমি বলি নতুন একটা ভেলা তৈরি করে ভাসিয়ে দেওয়া হোক মুণ্ডেশ্বরীর জলে। সাজানো শবদেহ কেউ স্পর্শ করবে না।'

পরিস্থিতি অনুযায়ী কেউ দ্বিমত করেন নি। লজ্জা, ভয় সমস্ত কিছু দূরে সরিয়ে দিয়ে এতদিন পরে সোজা হয়ে দাঁড়াল অনন্ত। "আপনাদের জানিয়ে রাখি নীলিমা আমার। আমি আজ ওকে আমার মনের মত করে সাজাব।"

"হ্যাঁ বাবা, আজ আমি ওকে তুলে দিলাম তোমার হাতে। ওর আত্মাও শান্তি পাবে।"

ঘনঘোর বৃষ্টির মাঝে কাঁপছে উন্মত্ত আকাশ, কাঁপছে প্লাবিত দিগন্ত। তবুও সাহসে বুক বেঁধে সাঁতার কেটে তুলে আনল শ্বেত শুভ্র কেলে লতার ফুল। নীলিমাকে ভেলার উপর শুইয়ে নিজ হাতে সধবার বেশে সাজিয়ে দিল পরিপাটি করে। তার পর ভেলাটা টানতে টানতে নেমে এল ভিটে থেকে।

বুক জলে এসে থামল অনন্ত। চারপাশে বৃষ্টির দেওয়াল। অতি নিকটও আর দেখা যাচ্ছে না। এখন নীলিমা সম্পূর্ণ তার একার। সিঁথি ভরে আছে তারই দেওয়া সিঁদুরে, কপালে সিঁদুরের টিপ্। এটাই তো চেয়েছিল নীলিমা। বহুক্ষণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল অনন্ত। চোখের জল এবার আর বাধা মানল না। এক সময় ভেলাটা স্রোতের দিকে ঠেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল।

নাগমণি

তিন মরশুম বাদ, নাগমণি এল ওদের দলের সঙ্গে। পিঠের পোঁটলায় একটি ফুটফুটে ছেলে। কাজল দুটি চোখে দেখছে পৃথিবীকে। ওরা এল, এল অঘ্রাণের শুরুতে।

বেড়াচ্ছিলাম একা একা। দূর থেকে দেখতে পেয়ে কাছে এল নাগমণি। 'কেমন আছিস্ বাবু, ভাল?'

কচি কচি দাঁতের সেই ঝকঝকে হাসি এখনো অটুট, তবে শান্ত, সংযত।

প্রশ্ন করলাম 'গত দু'মরশুম এলি না কেন?'

পিঠ থেকে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদরে চুমা দিল নাগমণি। মুখে সেই অদ্ভুত সুন্দর হাসি। 'সে তুই বুঝবি না বাবু, শুধু এর লগে।

'তুই খুব খুশি না রে?

'হব নাই!' চোখ দুটো নেচে উঠল নাগমণির। 'মোর বেটা ভদ্দর লোক হবে, দেখিস্ বাবু, ঠিক তোর মত।' কথাটা বলেই লজ্জায় মাথা নোয়াল।

'তাহলে তো বেশ সুখে আছিস্ দেখছি।'

মুখ তুলল নাগমণি, 'কেনে বাবু, তোর তো সব কিছু আছে, তবে দুঃখ কিসের?'

কত সহজে পৃথিবীকে আপন করে নিতে পেরেছে নাগমণি। জীবনটাও তাই সহজ। দেওয়া নেওয়ার জগতে বাধা নেই, সংস্কার নেই, আনন্দ আছে। একদিন ডানা মেলে উড়ে বেড়িয়েছে, আজ ঠোঁটে করে খড় কুটো জড়ো করে বাসা বাঁধছে। আবার চলে যাবে কোন অচিন মুলুকে ঠিক উড়ো পাখির

মত।

'কী ভাবছিস রে বাবু, লুকোস্ কেনে?'

নাগমণির কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। 'না, কিছুই নারে।'

'এ মিছে কথা কইলি, লুকোস্ কেনে তুই?' যেন ধরে ফেলেছে এমনি একটা ভাব, হাসল নাগমণি।

'তুই কদ্দিন থাকবি নাগমণি?'

'কেনে, ডর লাগছে তোর? থাকব তো গোটা মরশুম, আসিস্ না রোজ।'

তেমন কিছু বলল না দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। চলে আসছিলাম। হঠাৎ পিছু ডাকল নাগমণি, 'বাবু'। 'কিছু বলবি?' ঘুরে ওর দিকে তাকালাম।

আবার সংকোচে মাথা নোয়াল। কী যেন বলতে বাধো বাধো লাগছে।

'কি রে বল, অত লজ্জা কিসের?'

কিছুটা অভয় পেয়ে মুখখানা উজ্বল হয়ে উঠল নাগমণির। 'স্কুলের খাতায় তোর নাম লিখালে আপত্তি করবি নাতো? বেটা বড় হলে ইস্কুলে যাবে। ভদ্দরলোক হবে তোর মতন'। বিরাট আশায় তখনো ওর দু চোখে আনন্দের অবুঝ তুফান।

'কী বললি, জংলি কোথাকার।' ঘেন্নায় পা থেকে রক্ত যেন মুখের উপর উঠে এল।

ভীষণ ভয় পেল নাগমণি। মুহূর্ত্তে চোখের তারা নিস্প্রভ। তবুও বলল, 'ডর লাগল তোর, কেউ তো কিছু জানবেক নাইরে।'

ছুটে পালাল নাগমণি। কাঁদল না হাসল বোঝা গেল না, আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। সারা শরীরটা কেমন হিমশীতল হয়ে গেল।

নাগমণি যে দাবি করেছিল, সে দাবি কোনমতেই মেটান যায় না। সংসার, সম্মান, প্রতিপত্তির শিকড় বহুদূর চলে গেছে, গড়ে উঠেছে শক্ত বনিয়াদ। তাকে ভেঙে ফেলা যায় না। কিন্তু সেই রাত, আলোর মাঝে ক্ষণিক

অন্ধকার, সেই প্রতিশ্রুতি, সে কী শুধু খেলা? সে কী সব মিথ্যে? সে দিন বাধা মানে নি দুরন্ত যৌবন। নিজের থেকে ধরা দিতে গিয়েছিল নাগমণির কাছে। এ স্মৃতি তো মিলিয়ে যাবার নয়। সেদিনের সমস্ত ছবি এক এক করে সামনে এসে দাঁড়াল।

'এ বাবু, তুই লোভির মত দেখছিস্ কেনে?' সেদিন সাবধান করেছিল নাগমণি।

"দেখব না। আমি যে তোকে ভীষণ ভালোবাসি।"

"আমাকে বিয়া করতে পারবি?"

উত্তর দিতে পারি নি কিন্তু পরের দিন আবার গিয়েছিলাম। দেখে নাগমণি হাসছিল। 'এ বাবু, তুই আবার এলি কেনে, লোকে বলবে কী!' হাসছিল ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে। খোঁপায় একরাশ বেলফুল। পাহাড়ি নদীর মত তর তর করে নেমে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুই মানা করিস্ কেন, আসতে নেই বুঝি?'

চোখের ভাষা বুঝে গেল নাগমণি। আঙুল তুলে দেখাল ওদের ডেরা। 'দেখছিস্ না ওরা আছে।'

'ওরা তো মাতাল রে, হাড়িয়া খেয়ে নাচছে।'

'ও কথা কইছিস্ কেনে, জানলে পরে মন্দ সইতে পারবি?'

'আমি ওদের ভয় করি না' তুই বিশ্বাস কর।'

হাসল নাগমণি, 'তুই মরদ আছিস্ রে। তুর ডর নাই! হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হতে পারবি? ঢোলক বাজাতে পারবি? মাঠে মাঠে ঘুরতে পারবি? পারবি এসব? তুই বিয়া করলে নতুন বৌ আসবেক রে, তখন তুই আর আসবি না।' তার সেই হাসি মিলিয়ে গেল না। 'তুই পারবিক নাই বাবু, মিছে আসিস্ কেনে।,

'তোর জন্যে আমি সব কিছু পারব নাগমণি।'

ফুটফুটে জোছনা নাগমণির গলার পুঁতির হারের উপর ঠিকরে পড়ছে।

ওর উঁচু বুকখানা উঠছে-নামছে।

হয়ত রক্তের গভীরে আদিম জোয়ার। সুগঠিত যৌবন আঁটসাঁট কাপড়ে ঢাকা থাকছে না।

হঠাৎ মাথার উপরকার এক ফালি মেঘ হারিয়ে যাবার সুযোগ করে দিল। নিপুণ হাত ওর শরীরের ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে এল। ওর শরীরটা আলতোভাবে কয়েকবার শিউরে উঠে - মিশে গেল আমার শরীরের সঙ্গে। দুজনেই শুয়ে পড়েছিলাম ঘাসের উপর। তারপর গভীর অবসাদ।

আবার আলো। নাগমণির চোখেমুখে দুরন্ত তৃপ্তির ছাপ। উঠে দাঁড়িয়েছে নাগমণি।

'কাউকে বলবি নাতো?'

কাপড় ঠিক করে নিতে নিতে হাসল নাগমণি, 'এ বাবু, তুর ডর লাগে কেনে?'

আশ্চর্য প্রত্যয়ে নাগমণি ভরপুর। ধরা দিয়েছিল নাগমণি। তারই পরিণতি হিসাবে যাবার সময় ও বলেছিল, 'শুধু উঁকি লাগে রে বাবু, কিছু রুচেক নাই, ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল কথাটা শুনে! সেটা জানতে পেরেই নাগমণি বলেছিল, 'তুই ভাবিস্ কেনে, ক্ষতি করবোক নাই, তুকে না ভালোবাসি।,

সত্যি নাগমণি ক্ষতি করে নি। তবু আজ ফিরে গেল অভিমান নিয়ে। ও হয়ত ভাবত ওদের সমাজে মাথা উঁচু করে সন্তানের পরিচয় দেবে। ছেলে ভদ্দর লোক হবে, আরো কত কী। এখন কিন্তু বুঝে গেছে এ শুধু ছলনার স্বর্গ।

মাত্র কয়েক দিন পরের ঘটনা, ওদের দলের সর্দার জানাল, 'আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি রে কিরণ বাবু।"

'কেন রে, কি হ'ল তোদের ?'

'নাগমণি পাগল হয়ে পালিয়েছে বাবু।"

'সে কী!' চমকে উঠলাম সর্দারের কথায়।

"হাঁ বাবু", সর্দারের স্বরটা কেঁপে উঠল। রুদ্ধ আবেগে চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে চাপা আতঙ্ক।

'নাগমণি খুনি বটেক। টিপির উপর থেকে ছেলেটাকে ছুঁড়ে দিলে বাবু। মরে গেল বাচ্ছাটা।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এ কী করল নাগমণি!

'আসি রে বাবু, খেরেস্তান হয়ে গেলেও ও বেটি কিন্তু এমন ছিল না। কী যে হয়ে গেল।'

কারণটা অন্ধকারেই রয়ে গেল। চলে গেল সর্দার। দাঁড়িয়ে রইলাম নির্মম শ্মশান ভূমিতে।

সোমনাথে আমাদের গাইড ছিলেন হরমোহন দেশাই। মানুষ হিসাবে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুন্দর। তিনি একজন পুরাতত্ব গবেষক এবং ঐতিহাসিকও। মহামেরু প্রাসাদ বা বর্তমান সোমনাথ মন্দিরের দ্বিতলে রক্ষিত চিত্রাবলী তিনি এমনই মনোময় ভঙ্গিতে বর্ণনা করছিলেন যে সমগ্র অতীত জীবন্ত হয়ে উঠছিল আমাদের সামনে। দুঃখ বেদনা এবং অশ্রুময় আনন্দের মহাদোলায় আমরা প্রতিমুহূর্তে দুলছিলাম। তাঁর আবেগমথিত কণ্ঠস্বরে আমাদের অনুভূতির জগতকে ভরিয়ে দিচ্ছিলেন কানায় কানায়। ধর্মবিদ্বেষীদের অত্যাচার, নিপীড়ন, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তকরণের অজস্র কাহিনি আমাদের চোখে জল এনে দিয়েছিল। শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস, শুধু হত্যা আর হত্যা — এ সব শুনতে শুনতে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সেটা লক্ষ্য করে হরমোহনজী বললেন, "আমরা প্রায় দু'ঘন্টার মত উপরে আছি। ক্লান্তি এড়াতে এই বার দ্বিতল থেকে চলুন নীচে যাই।"

উপর থেকে নেমে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। যাত্রীদের ক্লান্তি দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষ কিছু পাথরের বেঞ্চি পেতে রেখেছেন। আমরা সেগুলো দখল করলাম। বিশ্রামের ফাঁকে দেখছিলাম পড়ন্ত বিকালে সাগরের নয়নাভিরাম রূপ। নীল জলে নানান রঙের কী অপূর্ব আলপনা। এই সাগর অনন্ত অতীতের সমস্ত কাহিনির মহাসাক্ষী। দেখতে দেখতে কিছুটা আত্মমগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। হরমোহনজীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ওনার স্বভাব বৈশিষ্ট্য হ'ল ফাঁক পেলেই পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু একটা আমাদের শোনাবেন। হরমোহনজী বলতে শুরু করলেন, "এবার আপনাদের শোনাব এক নারীর অসামান্য আত্মত্যাগের কাহিনি। আপন ধর্ম এবং সোমনাথ রক্ষার্থে এই নারী

সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।"

আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসলাম। মন দিয়ে শুনতে লাগলাম ওনার কথা। তখন ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ। গুজরাটের যাযাবর সুলতান মহম্মদী বেগড়া এগিয়ে চলেছেন বিশাল বাহিনী নিয়ে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করার জন্য। তিনি আসছিলেন যাত্রাপথের সমস্ত দেব মন্দির ধ্বংস করতে করতে। হত্যা লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তকরণ ছিল তাঁর অভিযানের অঙ্গ। এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা সৌরাষ্ট্রে। আহমদশাহ্ সোমনাথ ধ্বংস করে যাওয়ার পর সোমনাথে পুজো পাঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জুনাগড়ের রাজা তৃতীয় মাণ্ডলিক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিকে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় ধরে সংস্কার সাধন করলেন। নতুন করে লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় পুজোর ব্যবস্থা হতেই টনক নড়ল মহম্মদী বেগড়ার। পৌত্তলিক হিন্দুদের দেবপুজোর ঔদ্বত্য চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। কেঁপে উঠল সমগ্র গুজরাট।

ধর্মবিদ্বেষী মহম্মদের সোমনাথ আক্রমণের খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল লাঠি গ্রামে। রাজপুত ভীমজী গোহিলের ছোট ছেলে হমীরজী তখন বাড়িতে ছিলেন। তাঁর কানে এল যাযাবর দস্যু মহম্মদী বেগড়ার কথা। ধর্মের নামে বারে বারে সোমনাথকে ধ্বংস করা আর কতকাল সহ্য করা যায়। হমীরজীর রক্তে আগুন জ্বলে উঠল। অত্যন্ত অস্থিরতার মাঝে কেটে গেল সারাটা দিন। রাতে খাবার সময় ভাবীজীকে এ কথা শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজপুতানী। "তুমি তো রাজপুত, মন্দির রক্ষার জন্য এগিয়ে যাও।"

"মহম্মদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার একার শক্তি কতটুকু কাজে লাগবে। আমি বুঝে উঠতে পারছি না আমাকে কী করতে হবে।"

"এত ভীতু তুমি! তুমি না রাজপুত বীর! রাজপুত বীরেরা মরতে এত ভয় পায় জানতাম না। সব ভয় মুছে ফেলে অত্যাচারীকে রুখতে তুমি একাই এগিয়ে যাও। রাজপুত জাতির মুখ উজ্জ্বল হবে।"

রাজপুত হমীরজীর মনে প্রবল ঝড় উঠল এইবার। হ্যাঁ, তিনি যাবেন সোমনাথ রক্ষার্থে জীবন দিতে। রাতের মধ্যেই তিনি লাঠি গ্রামের যুবকদের

এই মহা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য আবেদন জানালেন। "ভাই সব, সোমনাথ চলো, আর আমরা নীরব হয়ে থাকতে পারি না। আমাদের ধর্ম, নারী, মন্দির সব কিছু আক্রান্ত। আমরা প্রাণ দেব তবু মান দেব না।" এ আবেদন মন্ত্রের মত কাজ করে গেল। গর্জে উঠলেন দু'শত যুবক, "আমরা জীবন থাকতে মন্দির কলুষিত হতে দেব না।"

লাঠি গ্রামের মানুষের জীবনে এ যেন নতুন এক জোয়ার। ভীতির শিকল খুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন শত শত মানুষ। বাবা মায়ের দল আনন্দে সম্মতি জানালেন আপন সন্তানদের যুদ্ধে পাঠাবার জন্য। হমীরজীর দাদা বৌদি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঐ সব যুবকদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনলেন।

প্রভাতে নতুন সূর্য উঠল আকাশে। স্নান সেরে দেবতার পুজো দিয়ে তাঁরা বাবা সোমনাথের জয়ধ্বনি করতে করতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠলেন। তারপর বাবা মা এবং অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে রওনা হলেন প্রভাসের পথে। বিদায়ের সেই অপূর্ব দৃশ্য আজও মানুষ ভুলতে পারে নি।

সারাদিন হেঁটে সন্ধ্যায় হমীরজী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সরোড পাহাড়ের পাদদেশে শিহোর গ্রামে পৌঁছালেন। যাযাবর গ্রামবাসীদের সর্দার বেগড়া ভীল তাঁদের অতিথি হিসাবে সাদরে বরণ করে নিলেন।

রাতে খেতে বসে সর্দারজী হমীরজীর কাছে জানতে চাইলেন, "এ ভাবে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁরা কোথায় চলেছেন? কারণ এখন চারপাশে কোথাও তেমন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই।"

হমীরজী বুঝতে পারলেন শিহোর গ্রামের মানুষ এখনও সোমনাথ আক্রমণের খবরটা পান নি। তখন হমীর তাঁদের সব কিছু খুলে বললেন। আরও বললেন, "দস্যু মহম্মদী বেগড়াকে বাধা দেবার জন্য আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।"

এমনিতে সর্দার বেগড়া ছিলেন দিলখোলা মানুষ। মুখে সব সময় মধুর হাসিটি লেগে থাকত। কিন্তু মহম্মদের সোমনাথ আক্রমণের খবর শুনে হাসিখুশি ভাবটি মিলিয়ে গেল। একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাজপুতের বীর রক্তে শুরু হ'ল হিন্দোল দোল। "সেই শয়তানটা মন্দির ভাঙতে আসছে।

সোমনাথে আমি তারসঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হতে চাই।" একথা বলার পরেই চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন বেগড়া। "কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাই কি করে। মা হারা মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে আমি যে কোথাও যেতে পারছি না। মৃত্যুশয্যায় সরোজিনীর মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম মেয়ের বিয়ে না দিয়ে কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব না।"

খাবার পরিবেশন করছিল সরোজিনী। সমস্ত আলোচনাই তার কানে আসছিল। হ্মীরজীকে দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল। এমন সুন্দর যুবক, যেন কোন রাজকুমার, সেই সঙ্গে বীর যোদ্ধবেশ রাজপুতানীর মন কেড়ে নিয়েছিল। এই রকম বীর এবং আদর্শবাদী যুবককেই সে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। নারী না হলে সেও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে হ্মীরজীর সঙ্গে হিন্দু ধর্ম এবং সোমনাথ রক্ষার জন্য এগিয়ে যেত। কিন্তু সে সম্ভবনা খুবই কম। তাই অন্যভাবে সাহায্য করার জন্য মনটা তৈরি করে নিল।

বাবার কাছে এগিয়ে এল কিশোরী রাজপুতানী। "বাবা, হ্মীরজীকে জিজ্ঞাসা কর না, উনি যদি আমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চান আমি রাজি আছি।"

বেগড়া সর্দার মেয়ের কথা শুনে চমকে উঠলেন। হ্মীর বীর কিন্তু মহম্মদের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করে ফিরে আসার সম্ভবনা যে খুবই কম। এ বিয়ে হলে জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে চিরবৈধব্য স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু মেয়ের চোখে মুখে যে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দেখলেন তাতে করে তিনি কোন প্রতিবাদই করতে পারলেন না। বরং দেশের জন্য আত্মত্যাগে প্রয়াসী কন্যাকে বললেন, "তোর জন্য গর্বে আমার বুকখানা ভরে উঠেছে রে মা। হ্মীর রাজি থাকলে আমার কোন আপত্তি নেই।"

দু'শত রাজপুত যুবক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন হ্মীরের মুখের দিকে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন হ্মীর কী বলেন তা শোনার জন্য। হ্মীর চোখ তুলে তাকালেন সরোজিনীর দিকে। "আমার আপত্তির কিছু নেই, প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। কিন্তু আমি যে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি, হয়তো আর কোনদিন ফিরে আসব না। এবার বলো রাজি আছ কিনা।"

সরোজিনীর মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হমীরের পানে তাকিয়ে বলল, "আজ আমার জীবন সার্থক। নেই বা ফিরে এলে তুমি, সোমনাথে গিয়ে শহীদ হলে পৃথিবীর মানুষের কাছে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে। আমি সারাটি জীবন ধরে তোমার গান গাইব।"

হমীরের সঙ্গীরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। "আমাদের সবার মত আছে এ বিয়েতে। আজ রাতেই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হোক।"

সেই রাতেই সরোজিনীর সঙ্গে হমীরের বিয়ে হয়ে গেল। ক্ষণিকের বাসর। আকাশের তারাগুলোর পানে তাকিয়ে সরোজিনী বলল, "চেয়ে দ্যাখো ঐ তারারা আজ কত সুন্দর, চাঁদটাও যেন ধরা দিচ্ছে আমাদের কাছে।"

মধুর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে হমীর বললেন, "আমার জীবনের আকাশে তুমি যে আরো বেশি সুন্দর। মৃত্যুর পরেও আমরা অভিন্ন থাকব।"

"মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য তোমাকে পেলাম। এতেই আমি ধন্য। আজকের এই চন্দনের ফোঁটা যুগযুগান্তকে গন্ধে ভরাবে। আমরা যখন থাকব না তখন ঐ চাঁদ তারারা ঠিক এমনি করেই আকাশ প্রদীপ জ্বালবে আমাদের জন্য। তুমি দেখে নিও একদিন সোমনাথের ধ্বজা ধর্মবিদ্বেষীদের সব আস্ফালন তুচ্ছ করে আকাশে পত্ পত্ করে উড়বে।"

"আমার মনে হয় নতুন যুগ আসবেই। সেদিন তোমার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।"

কথার ফাঁকে এক সময় স্বামীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই জেগে উঠল। শেষবারের মত স্বামীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। তারপর উঠে হমীরকে প্রণাম করল পূজারিণীর মত।

হমীরের চোখে জল। "কী পেলে তুমি সরোজিনী?"

"অনেক, যা পেলাম তা কি বলে বোঝান যায়। এর চেয়ে বেশি আমি তো চাইনা।" হমীরের মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করল, "আমার একটা কথা রাখবে। যুদ্ধে তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে? আমিও লড়াই করে প্রাণ দেব।"

"না, তা হয় না সরোজিনী। আরও বড় লড়াই করার জন্য নিজেকে

প্রস্তুত রাখ। হিন্দুদের এক করে মহাশক্তিতে পরিণত করার দায়িত্ব আজ থেকে তোমাকে দিলাম। এ যুদ্ধ অনেক বড় যুদ্ধ।”

স্বামীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে এইবার গর্জে উঠলেন রাজপুতানী। “তুমি না রাজপুত বীর, তোমার চোখে জল কি মানায়! মহম্মদকে সোমনাথ থেকে তাড়িয়ে আমার ভালোবাসার উপহার দিও।”

“কিন্তু আমি যদি মারা যাই?”

“না, তুমি মারা যাবে না। মরে গিয়েও তুমি হবে অমর।”

দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। হমীর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে স্নান সেরে পুজোয় বসলেন। তারপর সকলে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বেগড়াও মহানন্দে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। “সোমনাথজী কি জয়” ধ্বনিতে সরোড পাহাড়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

সকলের কপালে জয়তিলক এঁকে দিল সরোজিনী। সবার শেষে এল স্বামীর কাছে। স্বামীর হাতে নিজে তরবারি তুলে দিল। চোখে একবিন্দু জল নেই, হাসিমুখে বলল, “জন্ম জন্মান্তরে আমরা এক ছিলাম, এক আছি এবং থাকব। আমার মত ভাগ্যবতী কে আছে। আমি যে চিরকাল তোমার গৌরবের অংশীদার হয়ে থাকব।” তারপর পিতা এবং স্বামীকে প্রণাম করে শেষ বিদায় জানাল। মহাকাল গোপনে এঁকে রাখল এই মহাবিদায়ের দৃশ্য। মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু মানুষের ভালোবাসা বা ভক্তির মৃত্যু হয় না। সেদিন সরোড পাহাড়ের কোলে মৃতপ্রায় জাতিটার যেন নতুন অভ্যুদয় ঘটল।

গাইড হরমোহনজীর কণ্ঠস্বর এবার ভারী হয়ে উঠল। তিনি বলে চললেন, “দূত মাধ্যমে সমস্ত খবর পেয়েছিল সরোজিনী। সেদিন সন্ধ্যায় হমীরজীর দলবল প্রভাসের দুর্গদ্বারে পৌঁছে গিয়েছিলেন। দুর্গের প্রহরীরা তাঁদে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। সরোজিনীর পিতা বেগড়া ভীল সামনা সামনি যুদ্ধ করার আশায় দুর্গের বাইরে রইলেন। সারারাত কাটল জাগরণের মধ্য দিয়ে। কেননা রাতের মধ্যেই মহম্মদের সৈন্যদল দুর্গ আক্রমণ করতে পারে এরকম খবর ছিল। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ওরা সত্য সত্যই দুর্গ আক্রমণ করল। শুরু হ'ল মহারণ। অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রথম

শহীদ হলেন বেগড়া সর্দার। হমীর এবং তাঁর অনুচরেরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেও মন্দির রক্ষা করতে পারলেন না। ইতিহাস আর একবার কলঙ্কিত হ'ল।

পরের দিন শুরু হ'ল সমগ্র প্রভাস জুড়ে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার। বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং হত্যালীলায় ভারী হয়ে উঠল সাগর তীরের বাতাস। সব কিছু শুনে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন সরোজিনী। বৈধব্যের বেশ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল অন্য এক নারী। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে চোখ দুটো হয়ে উঠল বাঘিনীর মত। আর ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ রইলেন না তিনি।

স্বামীর কথামত কাজ শুরু করলেন সরোজিনী। বেরিয়ে পড়লেন হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে। গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে বোঝাতে লাগলেন অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ধর্মবিদ্বেষীরা কী নির্মমভাবে আমাদের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে চলেছে। "হিন্দু ভাইসব, আর বিচ্ছিন্ন থেকো না। আমরা এখনো যদি এক হতে না পারি তাহলে আমরা কোন মতেই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জয়ী হতে পারব না। ওরা যে ভাবে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ বানাচ্ছে আগামী দিনেও তাই করে চলবে, চলবে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, গৃহদাহ এবং বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ। এ সব বন্ধ করতে চাই একতা এবং শক্তি। হমীরজী এবং বেগড়া সর্দারের নামে আপনারা শপথ নিন। আমরা একতাবদ্ধ নই বলেই শত্রুরা বারে বারে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে। আপনারা হিন্দু ধর্মের লাঞ্ছিত পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন।" সেদিনের সেই কিশোরী যুবতী ধীরে ধীরে পরিণত হলেন মহীয়সী নারীতে। তাঁর আকুল আবেদন বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তা সত্ত্বেও দেশীয় রাজন্যবর্গ মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি। তবুও হতাশ না হয়ে তীর্থ ভ্রমণকালে সঙ্গের যাত্রীদের বলতেন, "ধর্মবিদ্বেষীদের হাত থেকে ভারতের দেবমন্দির রক্ষার জন্য ঈশ্বরের নামে অন্তরের সব জড়তা মুছে ফেল। এবার বেরিয়ে এস বীরের সাজে। আর নীরব থেকো না।"

সোমনাথ রক্ষার ব্যর্থতা সরোজিনীর মনটাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে তুলত। সরোড পাহাড়ে ঝর্ণার নির্জনে বসে কাঁদতে কাঁদতে গাইতেন স্বামী হমীর এবং বাবা বেগড়ার আত্মত্যাগের গান। সে গানে বনের পশুপাখি

এবং গাছপালাও যেন কাঁদত। সে ভালোবাসার পবিত্র স্পর্শে আজও বনে বনে ফুল ফুটে, ঝর্ণা গান গেয়ে যায়, রাত শেষ হয়ে উষার আলো নতুন করে পৃথিবীকে সাজায়।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন হরমোহনজী। শেষ জীবনে সরোজিনী সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিদিনের জীবন ছিল অতি পবিত্র এবং নানারকম কল্যাণমূলক কাজে ভরা। সরোড পাহাড়ে আশ্রম বানিয়ে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত করলেন সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি। তাছাড়া হমীর এবং বেগড়ার দারু নির্মিত প্রতিমূর্তিতেও ফুল নিবেদন করতেন চোখের জলে। একহাতে কমণ্ডলু এবং অক্ষমালা, অন্য হাতে ত্রিশূল নিয়ে গৈরিক বসনা গৌরবর্ণা এই নারী যখন পথ চলতেন তখন অনেকে সম্ভ্রমে মাইজী বলে প্রণাম জানাতেন।

মেয়েদের মধ্যে নতুন চেতনার প্রসার ঘটাতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি নারীদের বলতেন, "তোমরা বীরমাতা হও। তোমাদের সন্তানেরা সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য যেন সংকল্পবান হয়।"

তাঁর ইচ্ছা ছিল হমীরজীর স্মৃতিবিজড়িত ধ্বংসপ্রাপ্ত সোমনাথ মন্দিরের এক টুকরো পাথর এনে আশ্রমে রাখা। তখনকার মুসলিম শাসকের অত্যাচারে প্রভাসে কোন হিন্দুই আর যেতে সাহস পেতেন না। দুর্বার সাহস নিয়ে সন্ন্যাসিনী সরোজিনী একাই চললেন পাথর সংগ্রহে। দীর্ঘকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে দৃষ্টিশক্তি অনেকখানি কমে গিয়েছিল, পথ চলার ক্ষমতাও তেমন ছিল না। সকলে ওখানে যেতে নিষেধ করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, "ওখানটা যে স্বর্গ, ওখানের ধূলিকণা স্পর্শ করতে না পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।"

ধর্মান্তরিত হিন্দুরা অনেকদিন পরে দেখলেন এক সন্ন্যাসিনীকে। সুলতানের সৈন্যদের গোপন তথ্য সংগ্রহকারিণী বলে তারা তাঁকে চিহ্নিত করলেন এবং বন্দী করার জন্য সৈন্যদের উত্তেজিত করলেন। প্রভাসে যাওয়ার জন্য সরস্বতী নদী পার হচ্ছিলেন সরোজিনী। এমনই সময় তিন অশ্বারোহী সৈন্য একযোগে তাঁকে আক্রমণ করলেন। সন্ন্যাসিনীর রক্তে লাল হয়ে উঠল

নদীজল। এক সংগ্রামী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হ'ল এইভাবে।

চোখের জল মুছে গাইড আমাদের প্রশ্ন করলেন, ''আপনারাই এবার বলুন এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিমন্দির তৈরি হওয়া উচিত কি না? হমীরজীর স্মৃতিমন্দির আছে, বেগড়ারও স্মৃতিমন্দির আছে। এঁরা দুজনেই গুজরাটী লোকগাথায় স্থান পেয়েছেন কিন্তু সরোজিনী রয়ে গেছেন উপেক্ষিতার দলে। আমি লিখছি এই নারীর জীবন নিয়ে নতুন এক ইতিহাস। সরস্বতীর তীরে আপনাদের সাহায্য নিয়ে আমি এক অনুপম স্মৃতি মন্দির গড়ে তুলব। বলুন আমাকে সাহায্য করবেন কি না?''

উচ্চৈঃস্বরে সম্মতি জানালেন সবাই।

এবার হরমোহনজী যে কথাগুলো বললেন তা অলৌকিকতায় ভরা। যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করলে সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু মূল কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রতি সোমবার সরোজিনী সরস্বতীর জল থেকে উঠে আসেন তাঁর দিব্য শরীর নিয়ে। শিবাষ্টক গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেন মহামেরু প্রাসাদের দিকে। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে এ দৃশ্য অনেকে দেখেছেন। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে জেগে উঠেন অতীতের লক্ষ শহীদ। তারা সবাই বহন করেন ওঁকার শোভিত গৈরিক পতাকা। অনেকে নাকি সরোজিনীকে দেখেছেন হমীরের বীরগাথা গাইতে গাইতে সোমনাথ পরিক্রমায় চলেছেন। কোন দিন দেখা গেছে হমীরজী লাঠির সামনে বসে অঝোর নয়নে কাঁদছেন। রাত শেষ হবার আগেই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান সেরে চলে যান সরোড পাহাড়ে।

গাইড সরোজিনীর কথা যখন শেষ করলেন তখন দেখলাম সবার চোখে জল। জল আমারও চোখে।

মণিকা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন।

জানালাটা খোলা। দেবদারুর পাতাগুলো বাতাসে কাঁপছিল। চাঁদ ওঠা আকাশে পরিচ্ছন্ন নীরবতা। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীরটা ক্লান্ত। তবুও চোখে ঘুম নেই পুষ্পেন্দুর। টেবিলের উপর হাত দুটোর মাঝে মাথাটা রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন। একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি দুষ্ট পোকার মত সমস্ত মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকাটি খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। নিজের দেওয়া রির্পোটটা নিজেই বার বার পড়ে মনে কোন শান্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। কাগজটার দিকে তাকাতে ভয় করছিল। কালো অক্ষরগুলো মিথ্যার বীভৎসতায় যেন দাঁত বের করে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। এ যে তার সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়। তার কলমের সব স্বাধীনতাটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে বিনায়ক। দাসত্বের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে কাগজের পাতায়, সত্যকে অস্বীকার করে অর্জিত অভিজ্ঞতায় কেমন সুন্দরভাবে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছে পুষ্পেন্দু। লোকে পড়ে বুঝতেই পারবে না তার পরিবেশিত সংবাদটা মিথ্যা। কোন লোক প্রতিবাদ করতেও আসবে না। কিন্তু সান্ত্বনা কোথায়? হাজারটা প্রতিবাদ বৈশাখী মেঘ হয়ে মনের উপর ঝড় তুলছে। চিন্তাগুলোকে সরিয়ে দেবার জন্যে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল। ঠোঁটে সিগারেটটা রেখে পর পর কয়েকটা কাঠি জ্বালল। অন্যমনস্কতায় প্রতিটা কাঠি জ্বলতে জ্বলতে হাতের কাছে এসে নিভে গেল। সিগারেটটা মুখ থেকে নিয়ে ছাইদানের উপর রাখল। চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করল পুষ্পেন্দু। কলমটা হাতের

মধ্যে নিল, কিছুটা বেপরোয়া ভঙ্গি। এত ভয় কিসের জন্য! দুনিয়ায় এই রকমই হয়, হয়ে থাকে। কি এমন অপরাধ করেছে সে, আদেশ পালন করেছে মাত্র। সম্পাদকের কথাগুলো মনের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল— "পুষ্পেন, তোমাকে বিনায়ক বাবুর মৃত্যুর খবরটা খুব সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে। আমাদের কাগজ তার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত। বুঝতেই পারছ আমাদের কি পরিবেশন করতে হবে। তুমি উপযুক্ত, ভেবেচিন্তে কাজ করার ক্ষমতা তোমার আছে।"

সম্পাদকের প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সে প্রমাণ করেছে সে উপযুক্ত, সে ভাবতে পারে—মিথ্যার বেসাতি করার জন্যে ভেবেচিন্তে অনেক কিছুই সে লিখতে পারে। কাগজের ছাপান বিবরণটাই বলে দেবে সে উপযুক্ত কিনা। সাহিত্যিক বিনায়ক গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন এর চেয়ে কেউ কি সুন্দর করে তুলে ধরতে পারত? প্রিয় পাঠকেরা, অনুরাগী বন্ধুর দল এখন নীরব চোখের জলে স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করছে। গতকাল রিপোর্টটা তৈরি করে মনে মনে খুশি হয়েছিল পুষ্পেন্দু, এ নিপুণ হাতের প্রশংসা সম্পাদককে করতেই হবে। প্রশংসাও করেছেন, ঐ প্রশংসাটাই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে মনে। সে ভাল মিথ্যা কথা বলতে পারে, লিখতে পারে। কী সুন্দর সার্টিফিকেট! নৈতিকতা বিকিয়ে দিয়ে জীবনটা এ কোন চোরাগলিতে প্রবেশ করল। এ কি সে চেয়েছিল! অসহ্য অস্বস্তির মাঝে নিজের মনেই হাসল পুষ্পেন্দু। শিথিল আঙুলে আবার সিগারেটটা মুখে তুলল। পর পর দুটো কাঠি জ্বেলে ধরাল। ধোঁয়াটা ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে মুক্তির আকুলতায় ঘুরপাক খেতে লাগল। জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে রইল পুষ্পেন্দু। জীবনটা জ্বলছে, নিকোটিনের তীব্র বিষে আহত মনটা কেমন ছট্‌পট্‌ করছে। বিনায়ক তুমি মরে গিয়েও আমাকে রেহাই দিচ্ছ না কেন? আমি তো এখনো তোমার দাসত্ব করছি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও। না-না, কি এত সে ভাবছে পাগলের মত! একজন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত চিন্তাই বা কিসের? কি লাভ হবে এতে? মণিকা, রিঙ্কু এবং অজয়কে নিয়ে সে মহাসমস্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। এতগুলো জীবন কত স্বপ্ন কত আশা নিয়ে তার সামনে হাত পেতে আছে। সম্পাদকের কথার অবাধ্য হয়ে ওদের সে ফিরিয়ে দিতে পারবে

না। সে ঠিক কাজই করেছে। তার সাংবাদিকতায় বিনায়ক গঙ্গোপাধ্যায়ের উজ্জ্বলতা বেড়েছে, ব্যক্তিগত জীবনের মাধুর্যে দেশবাসী অভিভূত। পত্রিকা তার রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে, কিন্তু, প্রশংসার বরণডালায় প্রতিটি ফুলে যে অনেক ব্যথা লুকিয়ে সে কথা কেউ না জানুক, সে তো জানে।

আগামীকাল শোক সভা। পত্রিকার পক্ষ থেকে বাণী রচনার ভার তার হাতে। আরো অনেক মিথ্যাকে ইনিয়ে বিনিয়ে ইস্ত্রি করা কথায় সত্যের উজ্জ্বলতা দিতে হবে। অনেক চমক লাগান কথা, বিশেষণের নিপুণ বিন্যাসে গড়ে তুলতে হবে ভাষার তাজমহল। নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কেমন করে তা পারবে। যদি রচনা সম্পাদকের মনের মত না হয় তাহলে শোক সভাতেও পাঠান হবে না, কাগজেও ছাপা হবে না। সবই সে বোঝে, তা হলে নিজের রুটি আসার পথটাকে সে বন্ধ করবে কেন?

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো চাঁদটার সব আলো চুরি করে হারিয়ে যাচ্ছিল দূরের কালো আঁধারে, মনে হল হাজারটা কুটিল হাত বেঁচে থাকার শেষ আশাগুলোকে ছিনিয়ে নিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সারা আকাশে শূন্যতার ছায়া। একবার তাকাল মণিকার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে। সমস্যার ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে মণিকা। ওকে দেখে ভীষণ হিংসা হচ্ছিল পুষ্পেন্দুর। সব কিছুকেই ও কেমন সহজে মেনে নিতে পারে। কেমন নিশ্চিন্তে তার উপর বিশ্বাসের বিরাট বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছে। কোন প্রতিবাদ করতেও জানে না। দৃষ্টি ফেরাতে পারে না পুষ্পেন্দু। এখনও ওতে জেগে আছে কত ভালোবাসা, কত মমতা। তক্তাপোষের উপর থেকে ওর পরণের শাড়ির ছেঁড়া অংশটা ঝুলে পড়েছে। পৃথিবীতে বাঁচার অনেক আশা নিয়ে শাড়িটায় গিঁট বেঁধেছে মণিকা। স্বপ্নগুলো, আশাগুলো ঘুমিয়ে আছে অগাধ বিশ্বাসের বিছানায়। সে বাঁচতে চায়, ওদের নিয়ে সে বাঁচতে চায়। কিন্তু বাঁচবে কেমন করে? কে দেবে বাঁচার আশ্বাস? . . . . . কেউ দেবে না।

পুষ্পেন্দু জানালার কাছটায় এসে দাঁড়ায়। বাতাস যেন ফিস্ ফিস্

করে কথা বলে। স্বরটা বুঝতে পারে পুষ্পেন্দু। সম্পাদক কথা বলছেন—'ওহে পুষ্পেন, বিনায়ক বাবুর অন্দর মহলে উঁকি ঝুঁকি মের না। আমাদের কাগজের ক্ষতি হবে এমন কিছু করবে না। অনেক লেখকই মেয়েদের নিয়ে ফষ্টি নষ্টি করে, তাতে দোষ কি? তা'ছাড়া ওনার দ্বিতীয়া স্ত্রীর হাতে সদ্য লেখা চারখানা উপন্যাস আছে। পত্রিকা চালাতে হলে সেগুলোর গুরুত্ব অনেকখানি। আমরা প্রকাশ করে বাজি মাৎ করব'। সম্পাদকের পান খাওয়া ঠোঁট দুটোয় খুশির হাসি উপচে উঠেছে, চোখের তারায় গুপ্তধনের কলসিগুলো থরে থরে সাজানো। তার বেয়াড়া মাপের বোকামি লক্ষ্য করে কেমন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছেন সম্পাদক।

নিজের হাসিতে নিজেই চমকে ওঠে পুষ্পেন্দু, এ কি! কোথায় সম্পাদক! ঘরের মধ্যে সে যে একা দাঁড়িয়ে। লেখার জন্য টেবিলটার কাছে এগিয়ে আসে। কলমটা হাতে তুলে নেয়। খবরের কাগজের ছাপান রির্পোটটা দেখে আবার চমকে ওঠে। এই কি বিনায়ক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিপূর্ণ চিত্র! এতে তো কোন কথাই বলা হয় নি সেই উপেক্ষিতা নারীর। বিনায়ক, তুমি একটা জীবনের সকল সবুজ স্বপ্নকে শিকল পরিয়ে রেখে গেছ। তোমার স্ত্রী মিতা চিরকালই পর্দার আড়ালে রয়ে গেল। কোন অধিকারের কথা, কোন দাবির কথা সে বলে নি। অথচ তার কথা না বললে তোমার ইতিহাসটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, মিথ্যার আড়ালে সত্য চিরদিনই আত্মগোপন করে থাকবে। বিনায়ক, আমি তোমাকে মহৎ বলতে পারব না। তুমি পাঁক ঘেঁটে গেছ, সেই পাঁকের ভিতর থেকে সাহিত্যের পদ্মফুল তুলে আনতে পারলেও আমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ক্ষমা করতে পারব না। সাহিত্য যদি সুন্দরের সাধনা হয়, ত্যাগের বাণীতে যদি আলোকিত হয়, তবে তোমার জীবন এত নোংরামিতে ভরে আছে কেন? আমি দেখেছি তোমাকে কফি হাউসে যেতে, বারে যেতে, ঝলমলে আলোর আড়ালে কামনার উগ্র রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে। লাভ ম্যারেজ করে যে মিতাকে তুমি ঘরে এনেছিলে, তাকে তুমি অনাদর করতে আরম্ভ করলে। ঘরে চাল নেই, কাপড় নেই, গহনা পর্যন্ত নেই—তবুও তুমি উদাসীন। বিখ্যাত লেখকদের করুণা পাওয়ার জন্যে তখন তুমি ভিখারির মত ঘুরতে। সেদিন তুমি এত নামের অধিকারী নও। ছেঁড়া

তোমার চটি, রুক্ষ তোমার চুল, তুমি পথহারা। সেদিন তুমি আর আমি ফুটপাতে হাত ধরাধরি করে চলতাম, কোন তফাৎ ছিল না। আর তোমার অন্দরমহলে? মিতা তোমার ছেঁড়া পাঞ্জাবিতে উপবাসের সাদা রং বুলিয়ে দিনের পর দিন উজ্জ্বলতা দিয়েছে। তোমার সাফল্যে তার ভিতরে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটোতে সূর্যের স্বপ্ন। ধীরে ধীরে তুমি প্রতিষ্ঠিত হলে। আমি তখনও বেকার। তোমারই দয়ায় আমি সাংবদিকতার চাকরিটা পেলাম। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেদিন কি জানতাম তোমার দয়ার দাম এত বেশি করে দিতে হবে। তোমার ঘৃণ্য প্রকৃতির উপর মিথ্যের এত চড়া রং আমাকেই টানতে হবে।

বল বিনায়ক, মিতাকে তুমি ত্যাগ করলে কেন? সে তো সব কিছুই ত্যাগ করেছিল তোমার জন্যে। কেউ না জানুক তুমি তো জান, কেউ না চিনুক তুমি তো তাকে চেন। তার মহৎ ত্যাগে তুমি সৃষ্ট, তার নীরব দানে তুমি পুষ্ট, তবুও অতি নীচ ব্যবহার করলে সেই মিতার সঙ্গে। তোমার দেওয়া সন্তানকে নিয়ে তখন সে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছিল। যে ছেঁড়া চটি সে নিজের হাতে পালিশ করে দিয়েছে সেই চটির দাগ বসালে তার রক্তহীন গালে। অথচ মিতার এতটুকু সান্নিধ্য পাবার জন্যে কলেজ জীবনে তুমি কি কর নি বলতে পার? মিতার দোষ--সে তোমাকে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিল। তুমি যে ভালোবাসার যোগ্য নও সেই ভালোবাসা দিয়ে সে পুজো করেছিল। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। স্নিগ্ধাকে পাবার নতুন আশায় মেতে উঠেছিলে, মিতা তোমার পথের কাঁটা। প্রতিষ্ঠিত জীবনে তাকে তুমি জঞ্জাল বলে মনে করেছিলে। তুমি মিতাকে সরিয়ে দিলে চরম অপমান করে। তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর, আমি আজও তোমায় ক্ষমা করতে পারছি না। মিতা তোমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে আর বলছে--'আমি তোমাকে এমন করে বাইরে চলে যেতে দেব না'। তোমার চোখ দুটো জ্বলছিল। পা'টা সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে বলেছিলে- 'বেরিয়ে যাও আমার এখান থেকে। বিলিয়ে দাও তোমার মেয়েকে।' মনে নেই সে দিনটির কথা? শয়তানের হাত দিয়ে মিতার পবিত্র ভালোবাসাকে সেদিন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে নামহীন অজানা অন্ধকারে।

এর পরের ইতিহাসও কি আমার জানা নেই? কোন এক নির্জন পার্কে নতুন নায়কের ভূমিকায় তোমাকে দেখলাম স্নিগ্ধার পাশে। স্নিগ্ধাকে তুমি বিয়ে করলে। আর মিতা? অনাথা কন্যাকে কোলে নিয়ে ভাসতে ভাসতে চলল অনিশ্চয়তার স্রোতে। ধীরে ধীরে তুমি উঠলে খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায়। স্নিগ্ধাকেও তুমি পুরোপুরি ভালোবাসতে পার নি। সে বড় কঠিন, তাকে তুমি ভয় করতে। তাই প্রকাশ্যে অপমান করার সাহস তোমার হয় নি। তুমি মনে করেছিলে স্নিগ্ধা তোমার আপন। কিন্তু বিনায়ক, আজ তুমি ভাল করে দেখ, তোমার খ্যাতির দেউলে বসে স্নিগ্ধা কেমন গোপন প্রেমালাপে রত, যেমন গোপনে তুমি বহু যুবতির সর্বনাশ করেছিলে। তোমার খ্যাতির মোহে তারা ভিড় করেছিল। তোমার কামনার আগুনে তাদের রঙীন পাখনাগুলো পুড়ে গিয়েছিল। তোমার বীভৎস রূপ দেখে তারা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। নিপুণ চোরের মত হরণ করেছিলে তাদের কুমারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভাঙ্গাচোরা জীবনগুলো গভীর বেদনায়, গোপন লজ্জায় বোবা হয়ে আছে। তুমি এক ধূমকেতু, তোমার বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘশ্বাস এবং চাপা কান্নার জমাট অন্ধকার। দক্ষ অভিনেতার মত তুমি সাধু সেজেছিলে। তোমার নোংরা জীবনটাকে আমি পবিত্র বলে চালাতে পারব না। মিতাকে তুমি ঠকিয়েছ, কিন্তু আমি যে আজও তাকে নিজের দিদির মত ভালোবাসি। নিজের জীবনে মিতা যে প্রেমের পূজা চালিয়ে যাচ্ছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেই সাধনা, সেই আদর্শকে অপমান করার দুঃসাহস কোথায়? বিনায়ক, তুমি জানতে মিতা তোমার জীবনে এক উজ্জ্বল প্রভাত। সেই আলোর সামনে নিজের কাদামাখা চেহারাটা নিয়ে দাঁড়াবার মত শক্তিটুকু তোমার ছিল কি?

বিনায়ক, তোমার চোখ থাকলে তুমি দেখতে, আছে কি? বল তো তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্মশানঘাটে কাকে দেখলে তুমি চোখের জলে শেষ পুজো জানাতে? স্নিগ্ধা কোথায় গেল? কে বেরিয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে? সেই অপমানিতা মিতা। তোমার দেওয়া সিঁদুর মুছে ফেলল তোমারই জন্যে, ভেঙে ফেলল হাতের শাঁখা। কোন অধিকার, কোন দাবি নিয়ে সে তো আসে নি। বিনায়ক, তোমার সাহিত্য সাধনা কি এই জীবন সাধনার চেয়ে বড়? বল-তুমি উত্তর দাও। জানি তুমি লজ্জায় উত্তর দিতে পারবে না। ওর গায়ের সাদা

থানটায় তোমার মৃত সাধনাগুলো শবের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। কেউ না জানুক আমি তো জানি তুমি হেরে গেছ। তুমি বলবে, আমার প্রতাপের কাছে তুমিও হেরে গেছ। এত যদি আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ তাহলে শোকযাত্রায় অংশ নেওয়ার তালিকায় মিতার নাম বাদ দিয়েছ কেন? তোমারই পরিবেশিত তথ্য ছাপা হয়েছিল কাগজে, আমি তো আর রিপোর্টটা তৈরি করি নি। হাঁ, তুমি বলতে পার। আমি হেরে গেলাম তোমার কাছে, তোমার প্রতিপত্তির কাছে, আমার দারিদ্র্যের কাছে। নচেৎ যা জানি, যা দেখেছি তা' আমি লিখতে পারলাম না কেন? তুমি যা নও, তার চেয়ে অনেক বেশি মিথ্যে করে, অনেক বেশি বড় করে তোমাকে দেখিয়েছি। কিন্তু আমার ভিতরটা তুমি জান, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি দারুণ জ্বালায় আমি জ্বলছি। আমি ওসব কথা লিখতে চাই নি, তুমি বিশ্বাস কর সম্পাদকের কাছে আমার হাত দুটো যে বাঁধা।

বিনায়ক, তুমি সব জানতে। স্নিগ্ধাকে নিয়ে তুমি রঙীন চোখে দুনিয়াটাকে রঙীন দেখছিলে। আর এদিকে—সব মানুষের দৃষ্টির আড়ালে তোমার প্রথম সন্তান মৃত্যু শয্যায়। মিতা তোমার নামের উপর কালির আঁচড় কাটতে চায় নি। কোন এক গোপন অন্তপুরে পরিচয়হীন হয়ে দাসীবৃত্তি করছিল একমুঠো অন্নের জন্য, একটা আশ্রয়ের জন্য। সে তোমার কাছে অর্থ চায় নি, তোমার সুখের পথে বাধা সৃষ্টি করে নি। শুধু চেয়েছিল গোপনে একটিবার তার সন্তানকে দেখা দিয়ে যাও। সে কান্না যদি শুনতে, মুমূর্ষু এক শিশু 'বাবা--বাবা' বলে ডাকছে। সে দৃশ্য যদি দেখতে— মিতা যেন এক দুঃখের প্রতিমা। কান্নারা ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাথর চাপা বুকে। বিনায়ক, তুমি পাষাণ, মিতার কোন অনুরোধ তুমি রাখ নি। মিতা তোমার গরিব মনের প্রতিচ্ছবি হয়ে আজও দাসীবৃত্তি করেছে। তোমাকে সে চিনত, তোমার মত দেউলিয়া মানুষের কাছে কোনদিন সে দাবি নিয়ে আসে নি। সে তোমার কোন ক্ষতি করে নি, তোমার কোন নিন্দে আজও সে সহ্য করে না। বিনায়ক, তুমি ভাগ্যবান। তোমার স্মৃতির দেউলে আজও সে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে।

আমি জানি তোমার স্বরূপটা তুলে ধরলে মিতা আমার সঙ্গে কথা

বলবে না। কিন্তু ফাঁকির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি যে ক্ষতবিক্ষত। আগামীকালের শোক সভায় তোমার জন্যে আমাকে ভাষণ তৈরি করতে হবে। আমি পারব না বিনায়ক, আমি পারব না। তুমি হাসছ। আমার চাকরি যাবে! যাক, তবু আমি পারব না।

জানালার পাশে গাছের পাতায় একটা জোনাকি জ্বলছিল, নিভছিল। চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে এল পুষ্পেন্দুর। কি করে সে বিসর্জন দেবে নিজের বিবেককে। একটা অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ঘরের মেঝেতে পায়চারি করতে লাগল। বিনায়ক, আমি তোমার কাছে হারব না। আমি তোমার চেহারাটা তুলে ধরবই।

কিছুক্ষণ পরে আবার টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়াল। এখনই কিছু লিখবে এই রকম একটা ভাব। কিন্তু কলমটা হাতে নিয়েও থমকে গেল। বিনায়ক, তোমার চেহারাটা তুলে ধরার মত ক্ষমতা আমার কোথায়! আমার ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে জেগে উঠে ক্ষুধিত হাতগুলো বাড়িয়ে দেবে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ওদের বাঁচাব কি করে। গোটা দেশ জুড়ে যেখানে ফাঁকির অবাধ রাজত্ব সেখানে আমার একটা মাত্র প্রতিরোধ কি করতে পারে। লাভ কি তাতে? বিনায়ক, তোমার সঙ্গে যুদ্ধে আমি নিজেই যে হটে যাব।

চিন্তামগ্ন পুষ্পেন্দু জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। মেঘভাঙা জোছনায় চাঁদটা ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকের দেবদারু গাছের মাথার উপর থমকে দাঁড়ায়। আনমনা হয়ে আবার কলমটা তুলে নেয় হাতে। শোক সভার জন্য লেখকের জীবন সম্পর্কিত প্রবন্ধটা রাত শেষেই তাকে জমা দিতে হবে। এলোমেলো চিন্তার মাঝে রাতের স্তব্ধতা বাড়তে থাকে। চিন্তাগুলোকে ভাল করে সাজাবার জন্যে আবার একটা সিগারেট ধরায়। কিছুক্ষণ বসে থাকে চুপটি করে। লিখতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ কি! এ কার কথা লিখছে পুষ্পেন্দু। এ যে মিতার কথা! গঙ্গাতীরে শাঁখা ভেঙ্গে, সিঁদুর মুছে চিতায় ফুল দিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে একটি নারী—বিনায়কের প্রথমা স্ত্রী। মিতার কথা যে লিখতে মানা। মিতা তার কেউ নয়। মিতা কি তার কোন উপকারে আসবে? অপরের যে দাসীগিরি করছে তার কথা লিখে কি

হবে। তাছাড়া বিনায়কের মিতা নামক স্ত্রীর কথা ক'জনেই বা জানে। নিজের মনেই খুব অবাক হ'ল পুষ্পেন্দু—সে মিতার কথা ভাবছে কেন? মিতাকে সে কি ভালবাসে? না-না, এ সে ভাবছে কি! বহুবার দেখা করতে গেছে মিতার সাথে। মেয়েটিকে কোলে করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বেদনামাখা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে বলতে যাওয়া কথাগুলো কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে পুষ্পেন্দু। মনের উপর শ্রদ্ধার রেখাটা আরও গভীর হয়ে উঠেছে বহুদিনের সান্নিধ্যে। সে শুধু সান্ত্বনা দিয়েছে তাকে, এর বেশি তো কিছুই করে নি, করার ক্ষমতাও তার নেই। এ চিন্তা উদ্ভট, অর্থহীন। হৃদয় নিয়ে বিলাসিতা বা ভালোবাসার নামে ন্যাকামো বিনায়ক করতে পারে কিন্তু তার পক্ষে কি সম্ভব? মণিকা সামনেই শুয়ে আছে।.ওর শীর্ণ শরীরে কালো চোখের গভীরে এখনো অগাধ ভালবাসা লুকিয়ে। ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে ঘুমের মাঝে জড়িয়ে ধরে ওর শীর্ণ গাল দুটো চুমায় চুমায় ছেয়ে দেয়। মনে মনে একটা গর্বের হাসি ফুটে ওঠে পুষ্পেন্দুর —বিনায়ক, এ সুখের অধিকারী তুমি নও। সমস্ত জীবনটা, সমস্ত আশাগুলো স্নিগ্ধ মমতায় পাপড়ি মেলতে থাকে।

স্টেশনের পিচ ঢালা পথটার দিকে তাকিয়ে থাকে পুষ্পেন্দু। রাতের মেলট্রেনটা ঝড়ের গতিতে মিলিয়ে যায় দূরের অন্ধকারে। আবার ধীরে ধীরে জীবনের সব স্বপ্ন, সব কল্পনা হারিয়ে যায় সমস্যার গভীরে থৈ হারা রাতের মত। একটা চাপা বিদ্রোহ নিয়ে পুষ্পেন্দু শুধু গুমরে মরে। সে ভালভাবেই জানে সত্যটাকে প্রকাশের অধিকার তার নেই। বরং প্রয়োজনে মিথ্যাটাকে সত্য করে তুলে ধরাই তার কাজ। মণিকার কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিল পুষ্পেন্দুর। তার দেওয়া সংবাদের সবটুকুকেই আজও সে সত্য বলে মনে করে। যদি জানত তার স্বামী কাগজে মিথ্যে কথা লেখে তাহলে এত শ্রদ্ধা কি তার থাকত? বিনায়কের ছবিটা কত আগ্রহ নিয়ে দেখেছে মণিকা। কাগজটা পড়তে পড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, পুষ্পেন্দুর উপর অভিমান করছে—'এত যদি তোমার পরিচিত, তা' হলে আমাকে একদিনও নিয়ে গিয়ে দেখালে না! মণিকা যদি বিনায়কের ভিতরটা জানত, তাহলে নারীর উপর অপমানের এত জ্বালা নিয়ে কোন রকমের আগ্রহ সে দেখাত কি?

কিন্তু মরে গিয়েও বিনায়ক রেহাই দেয় নি কাউকে। সব রং কেড়ে নিয়ে মিতাকে শ্রীহীন করেছে একটা ন্যাড়া গাছের মত। আর সে? বার বার হেরে যাচ্ছে তার কাছে। আলোর ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে কেবলই হারিয়ে যাচ্ছে অন্তহীন অন্ধকারে।

চাঁদটা ঘুমিয়ে পড়েছিল রাতের কালো বিছানায়। অন্ধকারটা মনে হচ্ছিল বড় ঘন, মিতার বুকের জমাট ব্যথার মত। একটা চাপা কান্না ভেসে আসছিল বাতাসে। কান পেতে রইল পুষ্পেন্দু। এ কি মিতা কাঁদছে? নিজের মনেই হাসল পুষ্পেন্দু। মিতা তার বাড়ির কাছে আসবে কেন, সে তো বালিগঞ্জে থাকে। বস্তির সেই বউটা বুঝি এখনও কাঁদছে। মেয়েটা ভারী অদ্ভুত তো। ছোঁড়াটা মদ খেয়ে এসে মেয়েটাকে গরু ঠ্যাঙান করত। কতবার বলেছে- 'তোর হাত খসে যাবে। তুই মরলে তবে আমার হাড় জুড়োবে।' অথচ মরার সময় সে রাতদিন যত্ন করেছে। ছোঁড়াটা মারা গেছে কয়েকদিন। মেয়েটা কাঁদতে পারে নি পড়শিদের ঠাট্টায়। মাঝ রাতে জমাট ব্যথাগুলো ভালোবাসার ফুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা আকাশে। এত ভালবাসা জমা ছিল ওর মাঝে! মিতাও বুঝি ঐ সুরে সুর মিলিয়েছে। মিতা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ম্লান মুখ, নত আঁখি, তবু কি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—পুষ্পেন্দু, আমার স্বামীকে অপমান করার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে? আমি যে ভারতীয় নারী। আমরা সতীর অংশ। আমাদের ভালোবাসার মাটি দিয়ে আমরা শিবের প্রতিষ্ঠা করি। তুমি তার উপর আঘাত হানতে পারবে না। তোমরা ভাবছ আমরা বোকা। না—তোমার ও ধারণা ভুল। আমরা মা—জগৎ পালন কারিণী। ব্যথার রক্তাক্ত পথে তোমাদের জীবনের প্রথম প্রকাশ। কাকে তুমি বোকা ভাবছ পুষ্পেন্দু? শুধু প্রেয়সীর মূর্ত্তিতে আমাদের জীবনটাকে বিচার করলে ভুল হবে। আমাদের পূর্ণরূপে পাবার সাধনা তোমাদের কোথায়? নারীর অর্দ্ধাংশ লাভ করেছে বলেই পুরুষ-প্রধান শিব অর্দ্ধনারীশ্বর। বিনায়কের কাছ থেকে নাই বা পেলাম কিছু, আমি যে তাকে ক্ষমা করেছি। তুমি পারবে না?

এবার কলম নিয়ে বসল পুষ্পেন্দু। পুব দিকের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভোরের শুকতারাটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে সতর্ক প্রহরীর মত। বিনায়কের ব্যক্তিগত জীবনে একটাও কুশ্রী আঁচড় কাটা চলবে না। ওকে

শ্রেষ্ঠত্বের আসনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মিতাদের এই পূজা অনন্তকাল ধরে চলবে।

রাতের বুকে জমে ওঠা শিশিরগুলো টুপ্ টাপ্ শব্দে ঝরে পড়ছিল গাছের পাতায়। কলমটা হাতে নিয়ে পুষ্পেন্দু তাকিয়ে রইল বাইরের শুকতারাটার দিকে।
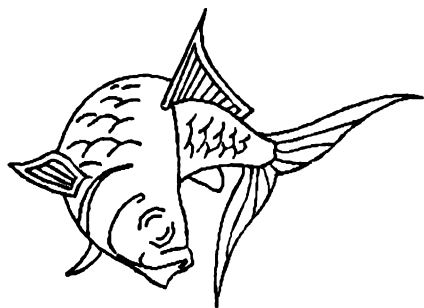
আপন মনে নির্জন উঠোনের চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল শঙ্খ। খানিক আগে এখানে ছিল উপচে পড়া ভিড়। ছেলে বুড়ো থেকে শুরু করে সব রকমের মানুষ মিলিয়ে সে যেন এক উৎসবের রূপ। চিতলটা টাঙানো ছিল একটা লম্বা বাঁশের খুঁটিতে। রুপোর মত চকচকে গা। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় সে এক অপূর্ব উজ্জ্বলতা। সবার দৃষ্টি ছিল মাছটার দিকে। তখনো মাঝে মাঝে লেজ নাড়ছে। এমন একটা জলদানবকে বঁড়শির সাহায্যে ডাঙায় তুলে আনা কম কথা নয়। সারা মুখে উপচে পড়া আনন্দ নিয়ে মাছ ধরার কাহিনি আদ্যন্ত বর্ণনা করে গেছে সারাটা সময়।

চিতলটা কাঁধে নিয়ে যখন বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল তখন দুপাশের সমস্ত বাড়ির উৎসুক দৃষ্টি তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা হেমলীনের সেই বাঁশিওয়ালার মত পায়ে পায়ে অনুসরণ করছিল তাকে। ক্ষণিক আনন্দের স্রোতে ভেসে যাওয়া চমৎকার একটি মিছিলের সে তখন নায়ক।

নেশা করে মানুষ যেভাবে সমস্ত ভাবনাচিন্তা ভুলে গিয়ে আনন্দ এবং উত্তেজনায় সারাক্ষণ মেতে থাকে সেও ছিল ঠিক ঐ অবস্থায়। ভুলেও ভাবেনি এর পর তাকে কি করতে হবে। দু'একজন একটু দূর থেকে মন্তব্য করেছিল — "মাছ তো ধরে এনেছে, তেল জোটাতে পারবে?" সাংসারিক অবস্থার সঙ্গে মন্তব্যটা খুব মিলে যায় বলে তেমন গায়ে মাখেনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

তবুও একটা কিন্তু থেকে গেছে তার মনের ভিতর। দারিদ্রের যে আগুন তার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে অহরহ জ্বলছে তাকে যখন কেউ নেভাতে আসে না তখন এমন নির্দয়ভাবে আঘাত হানার তারা কে? যুগটা হয়ত এই

রকম, কাউকে খুঁচিয়ে কিছু বলতে পারলেই অতি সহজে বাহবা জুটে যায়। তারা কীভাবে মরছে সেটা কেউ দেখে না, দেখতে চায় না। অপরকে কিছু বলতে পারার আনন্দ নিয়ে ন্যায়ের অবতার সেজে ঘরে ফেরে। ধীরে ধীরে মানুষের মন নেমে যাচ্ছে অনেক নীচে, একমাত্র স্বার্থ ছাড়া অন্য সব কিছু বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে দ্রুত গতিতে। এই ছোঁয়াচে ব্যাধির হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না কেউ।

যদি প্রকৃতই কেউ একটু উদার হয়ে তাদের সমস্যার কথা ভাবত তাহলে অযাচিত তিরস্কারের স্পর্ধা কেউ দেখাত না। বেকারত্বের অসহ্য যন্ত্রণা ছাড়া কী দিয়েছে তাকে তার দেশ! অনাদরে বাক্‌স বন্দি হয়ে আছে জীবনের কষ্টার্জিত ডিগ্রি। উপযুক্ত সুপারিশ নেই, অতএব সুযোগও নেই! অর্থহীন অনুনয় বিনয় এবং উপরোধে দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেছে জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর। আর কোন সম্ভাবনা নেই, অতএব সে মুক্ত।

পৃথিবীটা ধীরে ধীরে তার কাছে ছোট হয়ে আসছিল। যত দিন যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল সে রিক্ত নিঃস্ব। আজো সে তাই। কিন্তু এখন আর হারাবার ভয় নেই। স্বাধীনভাবে চলার বা চিন্তা করার অধিকার তার আছে। কাউকে তোয়ামোদ করে আর তাকে বিনীত থাকতে হবে না।

বেকার বাউন্ডুলে প্রভৃতি অনেক রকম বিশেষণ ইতিমধ্যেই জুটে গেছে তার কপালে। সবাই তাকে গচ্ছিত অনাদর উপহার দেয়। এসব মেনে নিয়েছে, না মেনে উপায় কি? সে এখন বেপরোয়া মাছ ধরবে, টো টো করবে, আপন ইচ্ছায় যা খুশি তাই করবে। যার যা বলার আছে বলে যাক।

শিক্ষিত বলে আজ আর কোন অভিমান নেই। চারটে প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে কায়িক শ্রমই একমাত্র সম্বল। সব কিছু স্বীকার করে নিয়েছে হাসিমুখে। রাজমিস্ত্রির যোগাড়ে হিসাবে কাজে যোগ দিয়ে যা পেয়েছিল সব তুলে দিয়েছে মায়ের হাতে। এ ক'দিন অতি বৃষ্টিতে কাজ নেই। অভাব আছে, তবু মায়ের অভিযোগ করার কিছুই নেই, অযাচিত সময় কাটানোর সুযোগে সেই পুরান নেশাটা ফিরে এসেছিল। কিন্তু সখ মেটাতে অর্থের প্রয়োজন, পাবে কোথায়? শেষ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলী বিক্রি করে যে কটা টাকা হয়েছিল — মাছ

ধরার উপকরণ কিনতেই সব শেষ, ছিপ হাতে পর পর কয়েকদিন হানা দিয়ে খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। শুধু চুনো মাছ এসে চার খেয়ে পালিয়ে গেছে। একটাও মাছ ওঠেনি বঁড়শিতে।

না উঠলেও দুঃখের পরিবর্তে অন্য এক সহানুভূতি অনুভব করেছে। ঐ মাছগুলোর সঙ্গে নিজের যেন মিল খুঁজে পায়। ওরা যেন একই রকম অসহায়। পুকুর দাপিয়ে বেড়ানোর ক্ষমতা নেই। পেটে খিদে আছে, পাখনা মেলে সাঁতার কাটার ইচ্ছে আছে, কিন্তু পারে না। ওদের পৃথিবী যেন অতি ছোট। চিতল, বোয়াল, শাল, শোল, ভেটকি ওদের তাড়া করছে গিলে খাবার জন্যে। শক্তিহীন বলে ওদের কোন অধিকার নেই। অধিকার আছে শুধু মরার।

কয়েকদিন ধরে পেট চিতিয়ে ঘাই দিতে শুরু করেছিল বেশ কয়েকটা চিতল। মনের সুখে যে সব ছোট ছোট মাছ চারে আশ্রয় নিয়েছিল তারা এদিকে ওদিকে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? না খেয়ে যারা মরে খাবার পেলে খেয়ে মরাই তারা ভালো বলে মনে করে। সেই সুযোগ নিচ্ছিল লোভী চিতলের দল। ইচ্ছামত ওদের ধরে ধরে আরামে রাজকীয় ভোগের সুযোগটা নিচ্ছিল।

অবস্থাটা দেখে মনের ভিতর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল অসহনীয় আবেগ ও উত্তেজনা। এই চিতলদের মাঝে কেটে গেছে তারও জীবনের বিরাট অংশ; বিশ বছর বয়স থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে যখন নাজেহাল, কিছুই যখন করতে পারছিল না, পায়ের তলার মাটি যখন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল, শুধু ব্যর্থতা এবং হতাশা যখন চার পাশ থেকে ঘিরে ধরছিল তখন এই বন্দিশালা থেকে মুক্তির জন্য মনের মাঝে জাগত বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা। বিষম সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত মন। এদেশে জন্মে মানুষ কাপুরুষের মত মরার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। বাঁচার জন্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেনি। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর সমর্থক হিসাবে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিল নিজেকে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, ভীরু মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল বাঁচার প্রেরণা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই নতুন অভিজ্ঞতা

নিয়ে ফিরে এল ঘরে! রাজনীতির চোরাবালিতে সব আদর্শ পোঁতা পড়ে গেল। আদর্শ গেলে বাঁচার জন্যে লড়াই করার অস্ত্র বলতে কিছুই আর থাকে না। শুধুমাত্র কথার ফুলঝুরিতে বিপ্লবের মাঠে সবুজ ফসল ফলে না। তবু একেই মূলধন করে হাতিয়ে নিতে ওৎ পেতে থাকে বিপ্লবের ধ্বজাধারী একদল স্বার্থপর। এ তো মিথ্যে নয়, এ যে তার মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

এখনো যখন অন্ধকারের সিঁড়ি ভেঙে হারানো স্বপ্নেরা সামনে এসে দাঁড়ায় তখনই এই অসাড় মনটা আবার যেন চাঙ্গা হয়ে উঠে। অপ্রার্থিত পৃথিবীর আস্তাকুঁড়ে এমনভাবে মরতে মনটা সায় দেয় না। ভবিতব্যের দোহাই দেয় যে সব শিরদাঁড়া বাঁকা মানুষ তারা আবার আরো ভয়ঙ্কর। জীবনের সঙ্গে এ যেন চমৎকার রকমের ধাপ্পাবাজি।

দহের নির্জনে মনের এই অহেতুক উত্তেজনায় হাসি পাচ্ছিল তার। কী লাভ এসব ফসিল ঘেঁটে। তার থেকে আসল কাজে মন দেওয়া ভালো। চারের এপাশে ওপাশে বুদবুদগুলোর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে সুরু করল। চিতলগুলো পর পর কয়েকবার ঘাই দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল জলের তলায়। রুই কাতলার আশা ছেড়ে দিয়ে বঁড়শির টোপ বদলাল। এই কৌশলে যদি কিছু কাজ হয়। কিছু ক্ষণ বাদেই ফৎনা মিলিয়ে গেল জলের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে টান, একেবারে অব্যর্থ।

চিতলটা বেশ কিছু ডোর নিয়ে খেলতে লাগল। সেই সময় রক্তের সঙ্গে মনের যে অপূর্ব উন্মাদনা জেগে উঠেছিল তেমনটা আর জীবনে হয় নি। দাঁতে দাঁত রেখে লড়াই। মনে হচ্ছিল এ লড়াই ক্ষমতার এক মুকুটমণির সঙ্গে বঞ্চিতের লড়াই। সার্থক হয়েছে শিবদহের তীরে বৃষ্টি মাথায় বসে থাকা। এ লড়াই চলুক সারাটি দিন। সব চিতল, বোয়াল, শোল, শাল এক এক করে উঠে আসুক ডাঙায়। চুনো পুঁটিদের হজম করে করে গড়ে তোলা নধর দেহ ছট্‌ফট্‌ করুক তাদেরই মত মৃত্যু যন্ত্রণায়। তারপর বসিয়ে দেবে বহুযুগের ব্যথায় গড়া ধারাল ছুরি।

অনেক কসরতের পর এক সময় জলের উপর চিতিয়ে পড়ল চিতলের দীর্ঘ শরীর। অনেক কষ্টে জালের সাহায্যে ডাঙায় তুলে এনেছিল। আনন্দের

উত্তাপে পৃথিবীর সব দুঃখ তখন পুড়ে ছাই।

ওজনটা কম নয়, প্রায় দশ কিলোর মত। বাড়িতে এনে বাঁশে ঝুলিয়ে রাখার সময় বড় ইচ্ছে হচ্ছিল জীবনে এমন একটা জয়ের স্মৃতি ফটোতে ধরে রাখতে।

পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের ইচ্ছে ছিল মাছটা নিয়ে ফিস্ট করে। তারা ফটো তুলে দেওয়ার ব্যাপারেও রাজি হয়েছিল। ঠিক মত সাড়া না পেয়ে একে একে কেটে পড়ল সবাই। পাড়ার কেউ কেউ দু'এক চাকা পাবার আশা জানিয়ে গেল হাসিমুখে তামাসার ছলে। দেখলেই যারা মুখ বাঁকায় আজ তাদের মুখে শুনল দাদা, কাকার মত প্রিয় সম্বোধন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মানুষের এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে মনে মনে হেসেছিল শঙ্খ। কোটি টাকার লটারি পেলে ঐ একই কারণে জুটে যায় কত তোষামোদ। এ তো শুধু দাদা — নিশ্চয়ই তার জন্যে বাবু, স্যার, শ্রদ্ধেয় আরও কত কি।

অবস্থা বুঝে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মা বলেছিল, 'ধরে আনলি আনন্দ করে কিন্তু বিপদও বেঁধে এনেছিস সঙ্গে। যাকে না দিবি তারই রাগ। সবাই কুটুম্বিতে চাইছে। এখন উপায় কি।'

মায়ের কথাগুলো শুনতে শুনতে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বঙ্কিম রচনাবলী বিক্রির দৃশ্য, বৃষ্টি ভেজা দিনে শরীর তছনছ করে দেওয়া কত মেহনত। নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে একই জায়গায় ছিপ নিয়ে বসে থাকা, তখন কেউ উঁকি দেয় নি। কেউ দুঃখের ভাগ নেয় নি, তবে কেন এ অন্যায় আবদার।

মার অস্বস্তি ভরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে উপায় জানতে চেয়েছিল, 'তুমিই বলো মা, কি করি।'

'আমি বলি আমাদের সংসারে ও মাছ বড় বেমানান, তুই তার থেকে বাজারে বেচে দিয়ে আয়'।

মার কথা নির্মম হলেও সত্য। সত্যিই বড় বেমানান। চিতলটা বাজারে নিয়ে যাওয়ার সময় তখনো দেখেনি এমন দু'একজন অভাগা ছাড়া আর কেউ সঙ্গে এল না। কয়েকটি বাড়ির উঠোন থেকে ভেসে এল ঝাঁঝাল মন্তব্য

— 'কেনই বা সঙ্ করতে বাড়ি নিয়ে আসা বাবু, লোক না মাতিয়ে একেবারে বাজারে গেলেই তো পারত।' সে জানে, বেশ ভালো করেই জানে এসব তাদের হজম করতে হবে। তাই কোন উত্তর দেয় নি। উত্তর দেওয়া মানেই অহেতুক বোকামি।

মাছটা বাজারে ফেলতেই উপচে পড়ল ভিড়। খদ্দের হিসাবে যারা চুনো পুঁটি তারা একে একে ভেগে গেল। শেষ পর্যন্ত গোটা মাছটা হাজার টাকা দিয়ে কিনল চালের হোল সেলার তাদেরই পাড়ার রত্নেশ্বর কুণ্ডু।

ফেরার সময় ঘুরে ফিরে বার বার সন্দেহ হচ্ছিল মনে, তারা কি এই ভারতবর্ষের বাসিন্দা। কেন এত দুস্তর ফ্যারাক। একজনের মাত্র একটি সন্ধ্যার আয়োজনে তাদের মত চারটে প্রাণীর চলবে কম করে পনের দিন। গরিব হয়ে যারা জন্মেছে তাদের হাসতে মানা, খেতে মানা, তিল তিল করে মরছে — একথা বলতে মানা।

সন্ধ্যার নির্জন উঠোনে দাঁড়িয়ে সারা বিকেলের কথা ভাবছিল শঙ্খ। মাথার উপরে সারি সারি বোবা নক্ষত্র, কখনো তারা লুকিয়ে পড়ছে ঘন মেঘের আড়ালে। আপন মনে হাত রাখল বুকের উপর। ভিতরে অসহ্য অস্থিরতা, আগুন লেগেছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে। রত্নেশ্বর কুণ্ডুর মত বড় বড় চিতল ঘাই মারছে, দাপিড়ে বেড়াচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ। আর তারা আগুনে পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এ যুগের শিক্ষা-দীক্ষার অসার সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে বড়ো জোর মুড়ি বিক্রির ঠোঙা বানানো যাবে। এই তো দেশ!

'কিরে বার বার খেতে ডাকছি, শুনতে পাস্ নি। কী ভাবচিস এত?' মা সামনে এসে দাঁড়ায়।

চিন্তায় ছেদ পড়ে। ধীর পায়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসে।

চারটে ডিসে চারজনের খাবার। আলু ভাতে ভাত, চিতলের কৃপায় আজ জুটেছে আলু পোস্ত আর ডাল, আগে থেকেই খাওয়া শুরু করেছিল দিদির ফেলে রেখে যাওয়া দুটি অনাথ - কল্যাণ এবং মনোরমা। আট দশ বছরের এই ভাই বোনের চোখ এখন ডালের বাটি আর আলুপোস্তর দিকে। আনন্দে কল্যাণ জুল জুল করে তাকাচ্ছে ডালের বাটির দিকে, 'দিদি এ রকম

বেশ রোজ হয়'।

চোখের ইশারায় ভাইকে শাসায় মনোরমা — 'মামা আছে না'।

জমাট কান্না বুকের ভিতর, কিছুই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। আহা রে, এদের মা যদি থাকত তাহলে হয়ত এমন করে দিন কাটত না। দিদিটা যেন স্নেহ ভালোবাসার এক অপূর্ব প্রতিমা। পাপড় তৈরির কাজ করে বৈধব্য জীবনে সচল রেখেছিল সংসার। সামান্য আয় থেকে যেটুকু বাঁচাত সেটুকুই তুলে দিত ভাইয়ের হাতে। আশা করত লেখাপড়া শিখে ভাই অন্তত একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে। ইন্টারভিউ দেওয়ার দিনগুলোতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন মাঝে মাঝে উজ্বল হয়ে উঠত আবার যখন দেখত কিছুই হচ্ছেনা তখন গভীর বিষণ্ণতায় চোখে মুখে ফুটে উঠত অসহায় ভাব। তবুও হাল ছাড়ে নি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি পর্যন্ত ভেঙেছে শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য। সৌভাগ্য শুধু একটাই, ব্যর্থতার সর্বশেষ দিনগুলো দেখে যেতে হয় নি।

সব কষ্ট বুক পেতে নিয়েছিল। এ দুটিকে বুঝতে দেয় নি কত কষ্টে তাদের দিন কাটে, মৃত্যুর সময় বলেছিল — 'আমি চলে যাচ্ছি, তুই এদের দেখিস্। কে আর আছে বল। ভগবান তোর জন্যে একটা কিছু করবেন'।

দিদি নেই, আজ যদি থাকত দেখত অসহায়ের জন্য ভগবানও নেই। দুঃখ হয় এ দুটির জন্য। সেই সঙ্গে ভয় জাগে যদি এদেরও জীবন এই রকম দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠে। সামান্য ডাল ভাত খেয়ে ওরা কি এ যুগের চৌরঙ্গীর পথ ধরে হাঁটতে পারবে।

নিজের দীর্ঘশ্বাসে নিজেই চমকে উঠল শঙ্খ। ওদের মুখের দিকে একবার তাকাল। চরম পরাজিতের মত শেষে নিঃশব্দে আপন পাতের কাছে এসে বসল।

রত্নেশ্বর কুণ্ডুর বাড়ির মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে। খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে মনোরমা বলল — "ভাই, গন্ধ পাচ্ছিস্?

'কিসের রে?"

"সেই মাছটার — কি সুন্দর গন্ধ উঠেছে দ্যাখ।"

"চুপ করে খেয়েনে। আমাদের ও মাছ খেতে নেই।"

অবসন্ন মন, হতাশ দুটি চোখে মা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। চোখের তারায় স্থির হয়ে আছে নীরব নদী।

পাতে হাত বাড়াবার আগে শঙ্খ আবার যেন দেখতে পেল অনেক চিতল এখনো ঘাই দিচ্ছে কী দারুণ উল্লাসে, চোখ ধাঁধান কায়দায়, আর তার কোটি কোটি স্বাধীন স্বদেশবাসী ওদের পেটের ভিতর ঘুমিয়ে পড়েছে পরম নিশ্চিন্তে।

কিন্তু না, চিতলের উল্লাস সে থামিয়ে দেবে। আবার ছিপ নিয়ে বসবে। সব কটা চিতল না ধরলে তার শান্তি নেই।

নীলকণ্ঠ

'দেশ উদ্ধারের শখ মিটে গেছে তো, এবার ভাল ছেলের মত হিসেব করে চলার চেষ্টা কর।' কথাগুলো বলতে বলতে ডঃ দত্ত মোটর বাইকে স্টার্ট দিলেন।

বিদ্রুপমাখা হাসিটা তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল চারপাশে। অন্যমনস্কভাবে সেই বিলীয়মান ধূলি রেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শেখর। তারপর মনে মনে বলল -- 'দোষ তোমার নয় ডাক্তার, দোষ আমারই, নচেৎ হাতকড়া পরে জেল খাটব কেন। দেশটাই বড় সুবিধাবাদী হয়ে উঠেছে। সততার কোন দাম নেই।'

গাঁয়ের মাঠ পেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল শেখর। মনে মনে অতীতটাকে ভাবতে চেষ্টা করল। কী অপরাধ তার, আজও সে জানেনি। দেশটা স্বাধীন হওয়ার পর এমন বিশাল অধঃপতন, চিন্তাই করা যায় না। ভেজাল, চোরাকারবারি, ঘুষখোর এত বেড়ে গেছে তবু মানুষ কিছুই করছে না, কিছু বলছে না। কে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে মানুষের বিবেক এবং আদর্শকে। অথচ এই দেশেই শত শত শহীদ জন্ম নিয়েছেন, আত্মদান করেছেন। এখন সব কিছু স্বপ্নের মত।

মাথার উপর বোশেখের নীল আকাশ। ঠিক দুপুর, তামাটে রোদের তীব্র ফলাগুলো অগ্নিশয্যা রচনা করছে পৃথিবীর। ক্লান্ত পায়ে এগোতে লাগল শেখর। সত্যিই দারুণ পাওনা হয়ে গেছে তার। ডাক্তারের কথাই ঠিক। যে দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হ'ল তারা কেউ একটা কথাও বলল না। সবাই যেন ভূত দেখছে। এই গ্রাম, পথঘাট, মানুষ সব তার কাছে কেমন অপরিচিত হয়ে

গেছে মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে। না, আর সে কোনদিন কারও কথা চিন্তা করবে না। অবুঝের মত ভবিষ্যত না ভেবে কারুর ডাকে হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কী লাভ এভাবে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে। তেলের অভাবে কারুর ঘরে যদি অন্ধকার নেমে আসে, আসুক না।

'শেখরদা, তুমি ফিরেছ'?

অপ্রত্যাশিত স্বর শুনে পিছন ফিরে দাঁড়াল শেখর।

জবা গাছের ছায়াঘন বেড়ার পাশ থেকে বেরিয়ে এল মমতা। 'ভীষণ দুঃখ পেয়েছ নয়। জানো আজকের দিনে মানুষ খুব স্বার্থপর। তুমি সবার জন্যে গেলে, কেউ তোমার জন্যে কিছু করল না।'

এই প্রথম সান্ত্বনার কথা শুনল। একজনের কাছ থেকেও আন্তরিকতার এতটুকু ছোঁয়া পায় নি। সবাই কেমন সতর্ক, ধরা দিতে চায় না, সরে সরে পালাচ্ছে। যে মেয়েটিকে সবাই চরিত্রহীনা বলে চিহ্নিত করেছে আজ সেই মেয়েই সত্য কথাটুকু বলল।

আবার কথা বলল মমতা, 'যেদিন তোমায় পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, তার পরের দিনই মিলে গেল অঢেল কেরোসিন। সবাই বলল রমেশ রায় ব্ল্যাক করতে পারে কিন্তু পাড়ার লোককে তো ভোগায় না। শেখর যদি বাড়াবাড়ি করে।'

মমতার কথাগুলো এক মনে শুনছিল শেখর। কারণ কেরোসিন ব্ল্যাক করার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরের ছবিটা এতটুকুও জানে না। 'তারপর, আর কি শুনলে?' বেশ কিছু আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল।

"সে সব শুনে কি হবে। সবাই বলল, ও নিশ্চয় ডাকাত দলে থাকে, না হলে ওর ঘর থেকে অতগুলো হাতবোমা পাওয়া যাবে কেন।" কথাগুলো বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মমতা।

"তুই বিশ্বাস করিস্, ওসব কথায়।"

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করল মমতা। "ছিঃ ছিঃ! আমি বিশ্বাস করব ওসব কথা। এ গ্রামকে চিনতে আমার বাকি নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমারও

তো কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।"

"কিন্তু তুই তো হেরে যাস্ নি, আমি বলছি একদিন তোর জয় হবেই।"

নিজের দুঃখটা চাপা রাখতে গিয়ে মুখখানা করুণ হয়ে উঠল মমতার। "আমার কথা বাদ দাও। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে, হঠাৎ করে কিছু করবে না। যারা গাছে তুলবে তারাই মই কেড়ে নেবে।"

চলে আসতে আসতে ভাবছিল মমতার কথাগুলো। নির্মম সত্যটাকে তুলে ধরেছে সামনে। সেদিন সবাই এসে ডাকল, "আমাদের কেউ নেই, তুমি আছ। শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকলে হবে না। এম.এল.এ থেকে শুরু করে গ্রামসভার মেম্বার সবাই নীরব! এত ছোট ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চান না।"

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, রক্ত নেচে উঠল প্রতিকারের দৃঢ়তায়। "ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি জানি আমাদের নাকের ডগা দিয়ে সব কেরোসিন সতের টাকা লিটার দরে বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ কার্ডের তেল চাইলেই বলবে, তেল এখনো উঠেনি।"

"প্রতিকার করতেই হবে তোমাকে। আমরা সব একজোট, দু'একজন বাবুকে রাতের অন্ধকারে তেল সাপ্লাই করে সকলকে চুপ রাখা যাবে না।"

"চলুন তাহলে। সকলে মিলে দোকানদারকে পাওনা কেরোসিন মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানাব।"

জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ল সকলে। 'চল সবাই'।

কলেজ জীবনে কোন আন্দোলনেই যোগ দেয়নি শেখর। একটু দূরে দূরে থেকেছে। বুঝেছিল এই বয়স থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের শিকার হয়ে কিছু লাভ নেই। তার থেকে পড়াশোনা করা অনেক ভাল। কিন্তু চোখের সামনে প্রতিদিনের অন্যায় কেমন করে সহ্য করা যায়। মানুষের মিলিত প্রতিবাদে সামিল না হলে শিক্ষার গৌরব বলে কিছু থাকে না। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তাদেরই করতে হবে।'

একজন দু'টিন তেল নিয়ে হাওয়া হচ্ছিল। টিন দুটো ধরে নামিয়ে

নিল শেখর। 'যেতে পাবে না তুমি, রমেশবাবু ঠিকমত কৈফিয়ত না দিলে তোমাকে পুলিশে দেব।'

'লেখাপড়া জানা ছেলের এই ব্যবহার, ছিঃ ছিঃ!' রমেশবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন, রাগে ফুঁসছেন, চোখ দুটো লাল। 'ছেড়ে দাও ওকে, ও তেল আমতা থেকে ব্ল্যাকে কিনে এনেছিল'।

'বেশ, আমাদের কার্ডের তেল।'

'এখনো উঠে নি; উঠলেই পাবে।'

'গত সপ্তাহে পাইনি কেন? খাতা দেখতে চাই।'

'দেখাব, নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু তোমরা কি এম.এল.এ না পঞ্চায়েত মেম্বার যে তোমাদের খাতা দেখাতে হবে।' তির্যক হাসিতে ফেটে পড়লেন রমেশ রায়।

তিন চার'শ মানুষ ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠল, কোন কথা শুনব না, আমরা মেম্বার না হতে পারি, খাতা আমাদের দেখাতেই হবে।'

"ফোন করে থানাকে জানিয়েছি। এবার ঠেলা বুঝবে।" বাদানুবাদের ভিতর দিয়ে সময় যখন এগিয়ে চলছিল তখনই এসে গেল পুলিশের জিপ। দেখতে দেখতে এক এক করে সবাই সরে গেল। পুলিশ শেখরকে ধরে রাখল দোকান লুটের অজুহাতে, তারপর শুরু হ'ল ওর বাড়ি সার্চ। ভিতর থেকে বের করে আনল কয়েক ডজন হাতবোমা। শেখর অবাক, এ সব বোমা আনলো কে? চীৎকার করে উঠল, "আমার ঘরে কিছু ছিল না। এটা এক বিরাট ষড়যন্ত্র।" কিন্তু এ প্রতিবাদ শুনবে কে? গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বারকে সাক্ষী করে সমস্ত বামাল তুলে নিল জীপে, সেইসঙ্গে কোমরে দড়ি বেঁধে শেখরকেও। পরের প্রহসন সংক্ষিপ্ত, ৩৭৬ ও ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী কেসের বিচারে সাত মাসের জেল।

জেলেতে প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হত। কয়েদিরা বিড়ি, সিগারেট চাইত, রাতে বিছানা কেড়ে নিত। কেউ বা বাঁকা হাসি হাসত, 'এ শালা মশা মেরে হাত গন্ধ করেছে। করতে পারতিস্ ব্যাঙ্ক ডাকাতি। তাহলে বুঝতাম বুকের

পাটা আছে। দে থুতু ছিটিয়ে দে।'

ক্রমশ সব ঠিক হয়ে গেল। দেখেছিল ঐ সব চোর ডাকাতগুলোর মাঝে কী নিদারুণ ভালবাসা, স্নেহ, মমতা এখনো বেঁচে আছে। অভাবে এবং শত অত্যাচারে ওরা বিপথে চলে গেছে তবু সবটুকু এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আসার দিন মহিম খাঁ, লালু দত্ত, ভজন সিং সবার চোখে জল। 'সাবধানে থেকো ভাইয়া, দুনিয়া বড় কঠিন। কোন দোষই করলে না, তবু জীবনে স্পট্ পড়ে গেল।

ঠিক এভাবে অন্তরের পরশ জীবনে কোনদিন পায়নি শেখর। 'আমি তোমাদের কোনদিন ভুলব না; দেখে নিও।' কথাগুলো শেষ করতে পারেনি। চাপা কান্না ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। আর ভাবছিল মানুষ কেমন করে বিপথে চলে যায় তার হিসাব কেউ রাখে না। অথচ ওরা এখনো ভাল কাজের জন্য জীবন দিতে পারে। থানার অফিসার থেকে শুরু করে নেতারা পর্যন্ত যুক্ত অনেক অপরাধের সঙ্গে। মাছ সবাই খায় দোষি হয় মাছরাঙা। হায় রে দেশ!

ভাগ্যিস্ জীবনে সে একা। তাই ভাবনা চিন্তা কম। ভবিষ্যতটা যেমন করে হোক চলে যাবে। কিন্তু সংসার থাকলে অন্ধকার দেখতে হ'ত। মমতার কথাগুলো ঝড় তুলতে লাগলো মনের মাঝে — 'দেখবে একজনও তোমার পক্ষে নেই।' ঠিক কথাই বলেছে। পোড় খাওয়া মেয়ে, স্বার্থপর দুনিয়াকে নিশ্চয়ই সে ভালভাবে চিনেছে। গরিবের মেয়ে, বয়স চব্বিশ পেরিয়েছে, এখনও বিয়ে হয় নি। ও নাকি পাড়ার ছেলেদের মাথা খায়। এইটাই এখন প্রচারিত সত্য, আসল ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। কেউ না জানুক, সে জানে। ভালোবাসার মূল্য পায় নি মমতা। তপন ওর সর্বনাশ করে চলে গেছে। সে এখন সমাজপিতা। একটা নারীর সমস্ত বুকের কান্না অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সমস্ত প্রতিজ্ঞা ফাঁসা বেলুনের মত জীবনের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাধ্য, অনুগত সন্তান হয়ে পিতার পছন্দ করা মেয়ে বিয়ে করে তপন এখন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা। মমতার কুৎসা প্রচারে এখন তাই বাধে না। তবুও কী আশ্চর্য এই নারী, তপনের উপর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই কিন্তু কোন এক অজানা ভয়ে

নিজেকে সব সময় গুটিয়ে রাখতে চায়। প্রেম করার জন্যে ব্যাকুল যুবকেরা যখনই ব্যর্থ হয়েছে, তখনই একটা না একটা বদ্‌নাম দিয়ে পাড়ায় ঝড় তুলেছে। সে সব কথা ভেবে ভীষণ হতাশ হয় শেখর। প্রশ্ন জাগে মনে — মানুষ তাহলে বাঁচবে কেমন করে। একই অবস্থা তারও, চুরি ধরতে গিয়ে চোরের সাজা। সারা জীবনের জন্য একটা দাগ। আসামির কাঠগোড়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিল তারাই যারা তাকে উত্তেজিত করেছিল। দোষ দিতে পারে না তাদের, ভাবে নগ্ন দারিদ্র্যের তারা শিকার। সব কিছু ম্যানেজ করেছেন রমেশ রায়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র যাই বলুক্ না কেন, যত বিরোধই থাকুক্ না কেন, বর্তমান ভারতের সব নেতারই গোত্র এক। ডায়াসে দাঁড়িয়ে কথার মারপ্যাঁচে লোক ভুলায়।

পথের ফাঁকে অর্জুন গাছটার কাছে এসে অবাক হয়। তপনদের মাটির ঘর ভেঙে তিনতলা বিল্ডিং উঠেছে আধুনিক কায়দায়। মাত্র দুবছরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে বিরাট একটা সংসারকে কাঁধে নিয়ে এত উন্নতি! সত্যিই অবিশ্বাস্য। ক্যাসেট বাজছে বিকট শব্দে। গৃহ প্রবেশ হচ্ছে, অসংখ্য নিমন্ত্রিত। সঙ্কুচিত হয় শেখর, পা যেন আর উঠে না। লোকের সামনা সামনি হবার ভয়ে অন্য পথ ধরার কথা চিন্তা করে। হঠাৎ ভিতর থেকে অন্য এক শেখর গর্জে উঠে — 'তোমার তো ভয় থাকা উচিত নয়। তুমি এখনো খাঁটি। কেউ তোমাকে অপমান করতে পারবে না।' সাহস ফিরে আসে। মাথা উঁচু করে চলে, সে যেন যুগান্তের নির্ভিক সৈনিক। এখনো সে কারুর রক্ত শুষে খায়নি। অতএব কাকে তার ভয়? এ শুধু অনর্থক চিন্তা।

ঠিক সেই সময়েই উল্লসিত কিছু মানুষের কথাবার্তা গতিরোধ করে। 'ঐ দ্যাখ্‌রে বোমাবাজটা জেল থেকে ফিরছে।'

"দ্যাখো, এবার আবার কাকে জ্বালায়।" সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় আর এক কণ্ঠস্বর। ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে সোনার চেন পরা তপন। বাঁকা হাসি হাসে, "জানেন সব কিছু আমার নখদর্পণে। আমার স্পাই আছে চারপাশে। বাছাধন এসেই প্রেম নিবেদন করেছে মমতাকে।"

"সাবধানে কথা বল। ভদ্রলোকের সাজ পরে ইতরের মত ব্যবহার কেন?" রক্তের ভিতর দাপাদাপি শুরু করেছে প্রত্যেকটি অনু পরমাণু। "বাজে

কথা বললে শাস্তি পাবে।'' হাঁপিয়ে উঠে শেখর।

'কি করবে? বোমাবাজি করবে? গুণ্ডা বদমাস্ কোথাকার।'

'এখনো সংযত হও বলছি।'

'ওরে আমার কে রে। কেউ যেন জানে না বাবুর কীর্তি। জেলে দেখা করার জন্য মমতা বার বার যেত কেন?' আবার সেই তীক্ষ্ণ হাসি আগুনলাগা বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ল।

'ও সব পিরিত, তোমরা কেউ বুঝবে না।' অট্টহাসির উল্লাসে কেঁপে উঠল বাতাস।

ঘুরে দাঁড়াল শেখর। 'না-না মিথ্যে কথা। তোমরা জান না ঐ তপনের পিছনের ইতিহাস। ও এক বদ্‌মাস্। তোমাদের রক্ত শোষণ করে ওর ঐ ইমারত।'

ততক্ষণে একজনের একটা ঘুসি মুখের উপর পড়েছে। স্বয়ং তপনও ঘুসি তুলে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে আরও কয়েকজন। অসম্ভব তৎপরতায় একজন ঘাড়ে ধরে দূর করে দিল বাড়ির সীমানা থেকে। প্রাণে বাঁচল শেখর।

অশ্রাব্য গালিগালাজ তখনো কানে আসছিল। মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলছিল আপন কুটিরের দিকে। এত বড় অপমানের পর ভীষণ অবাক লাগছিল, মানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর হয়ে যায়।

পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোয় আপন বাড়ির নগ্ন রূপ দেখে বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। টবের গাছগুলো মরে গেছে। খড়ের চাল ফাঁকা, যেন এক সমাধি ক্ষেত্র। আর ঘরের চাবি খোলার ইচ্ছা হল না। পূর্বপুরুষদের স্মৃতিজড়িত এই ভিটা। শেষ প্রণাম করল শেখর। দু'চোখ ভরা জল।

মাটিতে ফেলে রাখা ব্যাগখানি কাঁধে তুলে নিয়ে আবার ষ্টেশনের পথ ধরল। পিঠ এবং গলার দিকটা ফুলে উঠেছিল। ভীষণ ব্যথা, নাকের পাশে তখনো জমাট বাঁধা রক্ত। মনে হ'ল কোন ভুতুড়ে শ্মশানের উপর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। ফেরার পথে তপনের বাড়ির কাছে কোন মানুষের আনাগোনা দেখা গেল না। কয়েকটা ছেঁড়া লুচি হাতে কেবল এক পাগল একটানা চীৎকার

করছিল -- "জানি নে বুঝি, সব শালা দু নম্বরি করে বাড়ি গাড়ি করছে। এ রাজত্ব ভেঙে পড়বেই। মর্ শালারা মর্। ভগবান তোদের মাথায় বাজ ফেলুক।"

সেই অবস্থাতেও হাসি পেল শেখরের। পাগল বলেই হয়তো প্রতিবাদের ছাড়পত্র পেয়েছে। কারুর আক্রমণের শিকার হয় নি।

শেখরকে দেখে হো হো করে হেসে উঠল -- "আবার জেলে ফিরে যাচ্ছ কেরোসিনবাবু। যাও, যাও, সেখানে তবু শান্তি পাবে।"

কোন উত্তর দিল না শেখর। শুধু একবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাবল এ দেশে পাগল ছাড়া সত্যি কথা বলার হয়ত কেউ নেই।

পাড়ার পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই মমতাদের বাড়ি। ভীষণ ইচ্ছা করছিল শেষবারের মতো একবার দেখার। কিন্তু কিছু পূর্বের ঘটনা স্মরণ করে মনটাকে গুটিয়ে নিল। শুধু অত্যাচার আর অনাচার, প্রতিবাদের কেউ নেই। মানুষ প্রতি মুহূর্তে ক্ষমতা লোভীদের শিকারে পরিণত হচ্ছে তবুও কিছু বলছে না। অথচ এইসব কঠিন মৃত্যুকে চিহ্নিত করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার হিসাবে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। গাছের মাথায় সোনালী আলোর মুকুট। দিগন্ত জোড়া মাঠের কোলে গাঁয়ের এ এক মন ভুলানো রূপ। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলো মেলাবার অপূর্ব সুযোগ। এ সব দৃশ্যের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল শেখর। হঠাৎ দেখল একটা কাক উড়ে যাচ্ছে, একটা নীলকণ্ঠ পাখি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চীৎকার করতে করতে পিছু ধাওয়া করছে। অসময়ে এই খণ্ডযুদ্ধ শেখরের চিন্তায় ছন্দপতন ঘটাল। ধোঁয়াটে আকাশটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দেখল নীলকণ্ঠ পাখিটা করুণ চীৎকারে বাতাস ভরিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে অজানা পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে।

ব্যস্ততা প্রকাশ পেল চলায়। কি হবে স্মৃতিকে অকারণে ভারাক্রান্ত করে। চলে যখন যেতেই হবে তখন অত মমতা কেন?

'শেখরদা চলে যাচ্ছ।' আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। "কি করি বল, এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব।"

কিছুটা অন্যমনস্ক হবার আশায় আবার তাকাল আকাশটার পানে। দেখল পাখিটা এখনো উড়ছে। সেই করুণ চীৎকার। বাতাস যেন কাঁদছে।

'জান, এখানেও ওরা হামলা করে গেছে। নতুন করে কলঙ্ক দিচ্ছে।'

'নিজেদের সুবিধার জন্যে ওরা সব কিছু করতে পারে।' গভীর বিষণ্ণতা আবার দানা বেঁধে উঠল। কিছু না বলে তাকাল মমতার মুখের দিকে।

'এতদিনে মোহের শেষ পর্দাটা সরে গেল শেখরদা। জীবন্ত নরকের মাঝে মানুষ তো আর বাঁচতে পারে না। আমিও চলে যাব। একটা কাজ দেখে দেবে আমায়। কিছু না হোক, অন্তত একটা ঝিগিরি।' বাঁধ ভাঙা কান্না সামলাতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকল মমতা।

এই মুহূর্তে নির্যাতিতা নারীকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। তবুও বলল, "এখনই যদি তোকে নিয়ে যাই লোকে কলঙ্ক দেবে"।

"সে কলঙ্কে আমি ভয় পাই না।"

"তবে চল।"

পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে এল মমতা। চোখে জল কিন্তু মুখে হাসি। গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে দূরের পৃথিবীটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল দুজনেই।

আঁধারেও আলো

শাদা কাশফুলের সমারোহে নতুন করে সেজে উঠেছে গ্রাম বাংলা। খালে বিলে শাপলা শালুকের কানাকানি। মা আসছেন। আশ্বিনের আকাশে শুভ্র মেঘের আগমনির মধুর ঝংকার। বিশ্ব প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে মাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত। নতুন পোশাকে সেজে উঠবে সবাই। সারা বছরের সব দৈন্য মুছে ফেলে সকলে মহাউৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দের স্রোতে ভেসে যাবে। এ সময় প্রতিটি বাঙালি যেন আপন মানস সরোবর থেকে একশ' আট পদ্ম তুলে নিয়ে মা দুর্গার পায়ে অঞ্জলি দিতে চায়। সেই জন্যই তো এর নাম বড় পুজো।

পায়ে হেঁটে বড় বাজারের উপর দিয়ে রবীন্দ্রসেতুর দিকে এগিয়ে চলল অসীম। নতুন জামা কাপড়ে ছেয়ে গেছে ফুটপাথ। ওগুলোর দিকে তাকান ছাড়া কেনার ক্ষমতা তার নেই। কারণ কিনতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা তার কোথায়? কোন মতে যাতায়াত খরচটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে শূন্য হাতে। নিজের জন্য কিছু কিনতে না পারলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু ছেলে মেয়ে দুটি এবং স্ত্রী এই পুজোর দিনে নতুন পোশাক পাবার আশায় দিন গুণছে। কী দেবে তাদের? পরের উপকার করতে গিয়ে এত বেশি মূল্য দিতে হবে এটা জানত না অসীম। জানত না বন্ধুত্বের ভান করে মানুষ এত নীচে নামতে পারে। সেই না জানার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।

লোকটা যে এমন চালাকি করবে বুঝতে পারেনি। জগন্নাথ ঘাটে স্নান করার সময় ওর সঙ্গে আলাপ। কয়েকদিন ধরে মালিকের ধমকানির মাত্রাটা বেড়ে যাওয়ায় বেশ চিন্তায় ছিল অসীম। মানসিক অশান্তিতে কাটছিল সারাটা সময়। বেসরকারি চাকরি, মন যুগিয়ে না চলতে পারলে যে কোন দিন ছাঁটাই করে দিতে পারে। সব সময় একটা ভয় পিছু ধাওয়া করছিল । সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবু হাসতে হাসতে ও কাছে এসে দাঁড়াল, "ও দাদা, আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

"কেন বলুন তো? আমার নাম অসীম সামন্ত। অপনি কি আমায় চেনেন?"

"না, তা নয়, তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোন সমস্যায় পড়েছেন। ভাববেন না, ঈশ্বরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে!"

প্রথম আলাপেই বেশ ভাল লাগল মানুষটিকে। নাম সায়ন গোস্বামী। ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। শুরু হ'ল পরস্পরের বাসায় যাতায়াত। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানাত। যত্নের দিক থে কে আপন আত্মীয়ের থেকেও বেশি। ছেলে দুটি বড় এবং মেয়ে দুটি ছোট। বাড়িতে গেলেই ওরা চারপাশ ঘিরে ধরত। কৈফিয়ৎ দিতে হবে এতদিন যাইনি কেন, কেন এখনো ওদের চিড়িয়াখানা দেখান হয় নি, ইত্যাদি কত রকমের অনুযোগ।

সব কিছু যখন স্বাভাবিক গতিতে চলছিল তখন একদিন হঠাৎ করেই দেখা দিল সায়ন। গালভরা দাড়ি, রুক্ষ কেশ, জামার বোতামটা পর্যন্ত লাগাতে ভুলে গেছে। "ভাই, এ যাত্রা তুমি না দেখলে তোমার বৌদিকে আর কোনমতে বাঁচাতে পারব না।" কথাগুলো বলেই শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

"ধৈর্যহারা হবেন না, বিপদের সময় বুকবেঁধে চলতে হয়। আমি আছি, কোন ভয় নেই।" সান্ত্বনা দেবার জন্য আবার বলল, বৌঠানকে আমরা বাঁচাবই।"

"তুমি ভাই পাঁচ হাজার টাকা কোনমতে যোগাড় করে দাও। আমি ধার চাইছি। বড় পুজার আগেই সব শোধ করে দেব। এ ব্যাপারে তোমায়

কোন চিন্তা করতে হবে না।" কথাগুলো বলেই উত্তরের অপেক্ষায় বড় করুণভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সায়ন।

মাস মাহিনার দু হাজার টাকা সবেমাত্র সেদিন মিলেছে। এ টাকাটা সায়নের হাতে তুলে দিলে সংসার চালানোর খরচ এবং পুজোর জামাকাপড় কেনা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বৌঠানকে বাঁচাবার ব্যাপারটা বড় হয়ে দেখা দিল। দু'হাজার টাকা তখনো পকেটে, বাক্সে ওঠেনি। " নিন দাদা, এ মাসের মাহিনা আজই পেয়েছিলাম।"

টাকাটা হাতে নিল সায়ন কিন্তু হতাশায় মুখচোখ একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। "বাকি তিন হাজার না পেলে ওর চিকিৎসার কিছুই হবে না।" আবার দুচোখ জলে ভরে উঠল ।

বিয়ের আংটিটা বরাবরের জন্য পরে থাকত অসীম। সেদিকে একবার তাকাল। দেরি হলে রোগীর ক্ষতি হবে ভেবে নিয়ে সর্বশেষ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'ল। "ঠিক আছে চলুন স্যাকরার দোকানে। আংটিটা বিক্রি করলে মনে হয় তিন হাজার হয়ে যাবে। কিন্তু দাদা, পুজোর আগে সব টাকা ফেরত না দিলে আমি একেবারে সাগরে তলিয়ে যাব।"

"এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি, ঠিক সময়ে তোমার টাকা ফেরত দেব। কোন চিন্তা করতে হবে না।"

আপন মনে চলতে চলতে হাওড়া ব্রিজের উপর উঠে এল অসীম। মনের এ শূন্যতা পুরণ করার কেউ নেই। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য দোকান ফুটপাথ নতুনভাবে সেজে উঠেছে। কিন্তু সায়ন নির্মম আঘাত হেনে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে দিয়েছে। গঙ্গার দিগন্ত প্রসারী দৃশ্যগুলো যেন ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সম্মুখে মানুষের বিশাল স্রোত। এই স্রোতে হারিয়ে যেতে মানা নেই, কিন্তু সে পারছে না।

পুজো যত এগিয়ে আসছিল ততই তাগাদার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল অসীম। প্রথমদিকে যথেষ্ট আদর যত্ন করত। না খাইয়ে ছাড়ত না। তারপর টাকার কথা উঠলেই বলত, "ও টাকায় হয়নি রে ভাই, আরও সাত হাজার লেগেছে।"

"কিন্তু টাকা না দিলে আমি দারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে যাব।" মনের অশান্তি গোপন করতে পারল না অসীম।

পুজো আরম্ভ হতে আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। আর চুপ থাকতে পারল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঢুকল সায়ন গোস্বামীর বাড়ি। "দাদা, এবার আমায় কিছু দিন।"

চোখ দুটো লাল করে মারমুখি হয়ে উঠল সায়ন। "রোজ রোজ এ অপমান ভাল নয়। কে বললে আমি তোমার টাকা নিয়েছি। তুমি আসতে পার, আরও বেশি কথা বললে আমি তোমায় ঘাড়ে ধরে বের করে দেব"। এ ভাবের আচরণে তাজ্জব বনে গেল অসীম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এতদিন পরে ধরা পড়ল মানুষটার আসল রূপ। কী সুন্দর অভিনয় করল বিগত দিনগুলোতে। কাউকে বলতে পারে নি আপন বোকামির কথা। মালিককে জানালেও বকুনি দিয়ে দফারফা করবে। যা হয়ে গেছে আর ফিরে পাবার নয়।

লছমীকান্ত সিং একদিন বলেছিল, "আওরতটারে লয়্যা ও অভিনয় করে। আপনার মত ভালো আদমি ওয়ার খপ্পরে পড়িয়াছেন। ও গন্ধা আছে, চিটিংবাজি করাই ওর কাজ। এ সব করার জন্য ও প্ল্যান করে চলে। ওর নামে কেশ করেও কেউ তেমন সুবিধা করতে পারে নি।"

তখন লছমীকান্তর কথাগুলো বিশ্বাস হয় নি। প্রতিবাদ করে বলেছিল, "না-না, ও খুব ভাল মানুষ। পূজারি ব্রাহ্মণ কখন চিটিংবাজি করতে পারে।" কিন্তু সেই বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেল। খুবই খারাপ লাগছিল অসীমের।

ব্রিজ পেরিয়ে হাওড়ার একটি দৃশ্য গভীর ভাবে মনটাকে নাড়া দিল। বায়না ধরেছে মেয়েটি, "বাপি, আমাকে ঐ আকাশি রঙের জামাটা কিনে দাও না।" ভয় পেল অসীম। রুমা এবং নিউটনও তো এমনি করে বায়না ধরবে। তখন তাদের বোঝাতে হবে কী কারণে আজ তারা বঞ্চিত। মনের উপর একটা অসম্ভব জিদ দেখা দিল। ছেলেমেয়ে দুটোকে এখন থেকেই চেনাবে মানুষ কত ধূর্ত, নীচ এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে। নচেৎ ওরাও একদিন ঠকে মরবে।

স্ত্রী অবশ্য কিছু চাইবে না। কিন্তু বিয়ের আংটিটা পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে

জানলে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারবে না, কান্নায় ভেঙে পড়বে। দাম্পত্য জীবনের মূল্যবান স্মৃতি চিহ্নকে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যে তাদের নেই।

দুঃখ দারিদ্রের অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে সংসারটায় অশান্তি ঢুকতে পারেনি শুধুমাত্র অর্পিতার গুণে। কত অল্পে কেমন সুন্দর ভাবে সব কিছু মানিয়ে নেয়।

ট্রেনের সময় হতে এখনো প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরি। সাবওয়ে দিয়ে প্লাটফরমে ঢোকার আগে বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল অসীম। ট্রাকে করে সারি সারি দুর্গা প্রতিমা নিয়ে চলেছে মানুষ। ওদের চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। মায়ের কী অপূর্ব রূপ। দনুজদলনী মা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিতে বিরাজিতা। মনে মনে অভিমান জাগল, তুমি যদি দুর্গতি হারিণি দুর্গা হও তবে আমার এ হেন দুর্গতি হ'ল কেন? কই আমি তো কোন অন্যায় করিনি, তবু আমাকেই কেন এমন কঠিন শাস্তি দিলে। তুমি না আনন্দময়ী, তবে আমার ঘরে দুঃখের অন্ধকার নামিয়ে আনলে কেন? তুমি বড়ই পাষাণী।" মনের গোপন খেদে চোখে জল এসে গিয়েছিল অসীমের।

আকস্মিকভাবে নজরে পড়ল শায়ন গোস্বামী এ দিকেই আসছে তার স্ত্রী এবং চার ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের হাতে নতুন জামা কাপড়ের প্যাকেট। এমন কি স্ত্রীর হাতে প্যাকেট ছাড়াও আরও অনেক কিছু। সায়নের কাঁধে সাইড ব্যাগের আকৃতিটাও বেশ বড়। আনন্দে ওরা যেন গঙ্গার ঢেউয়ের মত শত ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলেছে। ক্রোধে জ্বলে উঠল অসীম। ছুটে গিয়ে সায়নকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিতে চাইল। ওদের সব কটা ব্যাগকে কেড়ে নেবে। কিন্তু চারটি ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেল । ঐ নিরপরাধ ছেলেমেয়েগুলোর কোন দোষ তো নেই। অতএব একজন পিতা হয়ে ওদের আনন্দ কেড়ে নিয়ে কোন লাভ নেই।

চোখাচোখি হতেই সায়ন এমনই এক ভাব দেখাল যেন জীবনে সে কোনদিন অসীমকে দেখে নি। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি চলার জন্য বকা শুরু করল। "চারপাশে হাঁ করে দেখার মত কিছুই এখানে নেই। যত্তো সব———"

ওদের দিকে তাকিয়ে নির্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে রইল অসীম। সব কিছু কেমন যেন এলো মেলো হয়ে যেতে লাগল।

এমন সময় পিছন থেকে জামাটা ধরে কে যেন টানল। ফিরে তাকাল অসীম। দেখল শায়নের বড় মেয়ে রোমিলা।

"কাকু তুমি বাড়ি যাচ্ছ।"

মিষ্টি মুখখানায় স্তব্ধ বিষণ্ণতা। "বাপি, তোমাকে খুব দুঃখ দিল। একটা পয়সাও ফেরত দেবে না। আমি জানি তুমি কিচ্ছু কিনতে পার নি। আমার এই প্যাকেটা তুমি নিয়ে যাও। আমাদের কাছে যে বোনের গল্প করতে তাকে দেবে।"

"না, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও। দেশে গিয়ে রুমা এবং নিউটনের জন্য কিছু কিনব বৈকি।" কোন মতে চোখের জল চেপে রেখে হাসিমুখে কথাগুলো বলল অসীম। সীমাহীন তৎপরতায় ট্যাক্সি নিয়ে হাজির সায়ন। মেয়েকে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলে নিল। ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিল। অসীম দেখল প্যাকেটটা না দিতে পারার বেদনায় কাঁদছে রোমিলা। সেই চোখের জলে নতুন করে জেগে উঠল নতুন এক পৃথিবী। মনে হল সব দীপ এখনো নিভে যায় নি।
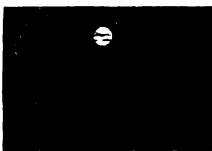
সমস্ত গ্রাম জুড়ে সাত সকালেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। আমতা বাগনান রোড়ের পাশে হোগলাবাড়ির কাছে একটা যুবকের লাশ পড়ে আছে। মুখটা একেবারে থেঁতলান, চেনা যায় না মৃত দেহটি কার। গাঁয়ের কারুর নয় সেটাই যা স্বস্তির।

চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল সত্য। দোকান তো নয়, যেন ঝুপড়ি। সবাই লাশটা নিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে যুবকটার মৃত্যুর কারণ দর্শাতে লাগল। সত্যই শুরু করল প্রথমটা। "তোরা যাই বলিস্ ও শলার ছেলে কলেজে পড়ত। পিরিত করতে গিয়ে মরল। এ আর দেখতে হবে না, একটা মেয়েকে নিয়ে দুজনের লড়াই চলছিল, শেষে খতম করে দিল। ধন্যি শালাদের প্রেম। পড়াশোনা তো একটা শো, আসলে কলেজ যাচ্ছে প্রেম করতে। জীবজন্তুর মত প্রেম, আর জীবজন্তুর মত মরণ। একে আবার প্রেম বলে নাকি।" এতখানি বক্তৃতা করে চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে বিজ্ঞের মত হাসল সত্য।

বাঁশির একদম মনে ধরেনি এসব কথা। প্রতিবাদী সুরে বলল, "ও যেন সবজ্যান্তা, একাই সব কিছু জেনে ফেলেছে।"

নিজের কথার কোন মূল্য না পেয়ে সত্য রেগে গেল। "বেশ তো তুই বল্ না, খুব তো হামবড়ি দেখাচ্ছিস্।"

"আমার তো মনে হয় ছেলেটা কোন রাজনৈতিক দলের শিকার। ওকে মেরে লরিতে করে এনে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।" কথার সমর্থনে বাঁশি একবার সবার মুখের দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে জীবন সমর্থন করল, "বাঁশির কথাই ঠিক, এ সব নেতাদের

কারসাজি। লেখাপড়া জানা ছেলেগুলো একটা প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারি পাবার আশায় যে ভাবে জামা বদল করছে তাতে মানুষের আদর্শ বলতে কিছু আর থাকছে নাকি। গাঁয়ের ছেলেগুলোই দ্যাখ্ না কেমন বি, এ, এম, এ, পাশ করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। বাবুদের কাছে এরা সব বলির পাঁঠা।"

মুখের কথাটা কেড়ে নিল বাঁশি, "আমি ঐ কথাই বলতে চেয়েছিলুম। এখন আদর্শ বলে আর কিছু নেই। দ্যাখ্ না বিচার করে, বুঝতে পারবি দলের নেতাদের দৃষ্টি কাড়ার জন্য ঐ শিক্ষিত ছেলেগুলো অনেক নীচে নেমে গেছে। যত রাজ্যের অসামাজিক কাজ এরা বিনা দ্বিধায় করে চলেছে। এরা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে বোমা বাজি করছে, ছুরি চালাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। এরা এইভাবেই তো মরবে।"

জীবন এবার এক ধাপ এগিয়ে গেল, "গাঁয়ে চোদ্দ্ পুরুষে কেউ বোমাবাজি দেখেছে? রাতের অন্ধকারে একজন অন্য জনের পুকুরে বিষ ঢেলে দিচ্ছে এ সব দেখেছে কি? এমনভাবে ধানের গাদায় কারা আগুন লাগায়? এমন করে রাতের বেলা পানের ক্ষেত, সব্জির খেত নষ্ট করে দিতে তোমরা দ্যাখো নি। কিন্তু এখন এ সব দেখছো। যারা এসব করছে তাদের আমরা চিনি, কেন করছে সেটাও জানি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস পাই না। প্রতিবাদ করলে ঐ ছোঁড়াটার মত অবস্থা হবে।"

হাবু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা ছেলেটা হিন্দুদের না মুসলমানদের?

'কেন? পাল্টা প্রশ্ন করল বাঁশি।

"কেন আবার কি, আমার মন বলছে ছেলেটা সাম্প্রদায়িকতার শিকার। সামনে ভোট কি না, সেই জন্যই প্রশ্নটা জাগল। ভোট পাবার লোভে সবাই তো ধর্মের নামে উস্কানি দিচ্ছে। বাইরে একরকম, ভেতরে অন্যরকম। গোপনে গোপনে মুসলমানদের বলছে, "তোমরা রেডি থাক, আমরা তোমাদর পিছনে আছি। তোমাদের একটাই কাজ, ভোটটা শুধু আমাদের দিয়ে যাবে। দেখি কোন ব্যাটা কি করে।" এরাই অবার হিন্দু মহল্লায় গিয়ে বলছে -"ঐ মুসলমানেরা দেশের শত্রু, এরা ভারতের খায় পাকিস্থানের গুণ গায়। তোমাদের মারার জন্য অস্ত্র মজুত করছে। আমাদের ভোট দিলে ওদের সব জারিজুরি

খতম করে দেব'' এইবার বলো লড়াই বাধাবার তালে ঘুরছে কারা? গাঁয়ে গঞ্জে এইসব বিভেদের কথা কেউ কোনদিন শুনেছ? এই কারণেও তো খুনটা হতে পারে।'' সখেদে হাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

''তোরা ঐ ফ্যাচফ্যাচানি থামা তো। ও ফন্দিবাজি সবাই ধরে ফেলেছে।'' সকলকে ধমকে উঠল করিম চাচা। ''তোদের মত আন্দাজে আমিও কথাগুলো বলব। তর্ক করবি না, কোন লাভ নেই। ও শালার ছেলে নিশ্চয়ই শহর এলাকার। হয় কোন ডাকাতদলে যোগ দিয়েছিল, নয় তো কোন ওয়াগন ভঙার দলে। ভাগাভাগিতে গণ্ডগোল না হলে এমন কাণ্ড ঘটে? ওর নিজের লোকেরাই ওকে খুন করে রাতারাতি এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। নইলে অমন সুন্দর জোয়ান ছেলেটা খুন হয় কি কারণে।''

কথাটা অনেকের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হ'ল। কিন্তু মনগড়া ব্যাপার বলে কেউ বিশেষ আমল দিল না। আসল ব্যাপারটা যেহেতু কেউ জানে না সেজন্য এইসব আজে বাজে মন্তব্য নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

শীতের সকাল। চারপাশে শিশির ভেজা ঘাসের উপর সূর্যের আলো ঝিক্‌মিক্ করছে, ঠিক যেন অনুরাগের আল্পনা। বাস রাস্তার ধারে তিনখানা বাঁশের পাটাতন। সকাল সন্ধ্যায় চা পায়ীর দল ছোট এই দোকানটিতে হাজিরা দেয়। বিশেষ করে এই হাড় কাঁপান ঠাণ্ডায় সকাল বেলার মিঠে রোদখানা বিনা পয়সায় মেলে। মাঝে মাঝে নরম গরম আলোচনায় এই জায়গাটাই যেন ছোট এক পার্লামেন্টের রূপ নেয়। বেলা বাড়লে কেউ পান বরোজে, কেউ বা ধান ক্ষেতে কাজে চলে যায়। তখন ফাঁকা ময়দানে শালিকগুলো পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কোঁদল শুরু করে। মালিক মহানন্দ এদের ভালো করে চেনে। শান্ত করার জন্য কিছু লেড়োর গুঁড়ো নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। মনের দিক থেকে ওরাই যেন ওর প্রকৃত বন্ধু।

এই মহানন্দ সামন্তর নাম মনে রেখে ক্রেতারা বলে মহানন্দের চায়ের দোকান। যখন কোন বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয় তখন মহানন্দ মজা করার তালে থাকে, একটু একটু করে সলতেটা উস্‌কে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পরম বিজ্ঞের মত অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আজ গোড়া থেকেই নীরব ছিল।

তবু বলল,"ছেলেটা তো মানুষের একজন। কই তোমরা তো কেউ এদিক থেকে একটা কথাও বললে না। এই সব বাজে আলোচনা না করে যে যার কাজে চলে যাও।"

রোস্তম হাসতে লাগল, 'আমি সব শুনছিলুম। একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন, ব্যাপারটা যা তা নয়। পিছনে বিরাট কারণ আছে।'

রোস্তম আরও কি বলে শোনার জন্য সবাই ওর মুখের দিকে তাকাল। 'আমার মনে হয় ছেলেটার কিডনির লোভে কোন ডাক্তার ওকে খুন করেছে। চোখ দুটো না থাকলে বুঝতে হবে ওদুটোও তুলে নিয়ে গিয়েছে। মানুষের কিডনি বা চোখের দাম কি এ বাজারে কম? চালান দিতে পারলে কয়েক লাখ টাকা মিলে যাবে।"

এবার বাঁশির পালা। 'আমি বলছি ছেলেটা খুবই ভাল ছিল। দেখে নিস্ ও ঠিক কোন অফিস টফিসে কাজ করত। ঘুস নিতে চায়নি, টাকা তছনছের অনেক খবর জানত। সত্যতা বজায় রাখতে গিয়ে বড় কোন পার্টির বিল আটকে দিয়েছিল। ঘুঘুর বাসা ভঙতে গিয়েছিল সিনেমার হিরোর মত। ঘুঘুরাই ওকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।"

জীবন প্রতিবাদ করল, "ভাল লোকের এমন মরণ হয়? এ নিশ্চয়ই কোকেন, হেরোয়িন কিম্বা গাঁজা চালান দিত। কারবারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয় ছিল, তাই ওকে সরিয়ে দিল। তোমরা দেখো আমার কথাটাই সত্য হবে।"

বাঁশি দমবার পাত্র নয়। 'এমনও তো হতে পারে, ও চোলাই মদ বানাত। নেশার ঘোরে মারামারি করে প্রাণ দিয়েচে।'

রোস্তম বলল, "একদম বাজে কথা, লাশটা তাহলে সেই এলাকাতেই থাকত। এতদূরে এনে ফেলবে কেন? এমনও হতে পারে ও হয়ত কারখানার কর্মী ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। বিরাট ক্ষতি পূরণ দিতে হত মালিককে, তার থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধি করে বাইরে ফেলে দিয়ে গেছে। সবাই এখন বলবে ছেলেটা অজ্ঞাত কারণে খুন হয়েছে।"

"যাই বলিস্ বাবু, মায়ের কোলটাতো খালি হয়ে গেল।" জীবনের কথায় সমবেদনা, 'ও যদি আমাদের মত একজন হয়।'

"তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। আমাদের মারার জন্য দেশ নেতারাই যথেষ্ট।' মুখখানা ব্যাজার করে রোস্তমের মুখের দিকে তাকাল বাঁশি। 'নেতারা আমাদের মারবে না। ওরা কোনমতে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। একেবারে মেরে ফেললে মিথ্যে কথার জমিদারিটা চলবে কেমন করে? এ সব নেতারা ভাল করেই জানে। বুদ্ধির জোরে ওরা কলকাঠি নাড়ে, নইলে আমরা আধমারা হয়ে বেঁচে থাকি?"

আবার লেক্চার শুরু হয়ে গেছে বাঁশির। "তোরা জেনে রাখ আমাদের গোটা দেশটা সব দিক দিয়ে পচে গেছে। তাই জলের দামে মানুষ খুন হচ্ছে। খুনের কিনারা নেই, শাস্তিও নেই। কোন লোক বা কোন দল এ ব্যাপার নিয়ে একটা কথাও বলছে না। আমরা সবাই খুনি।" হাবুর মুখখানা রক্তরাঙা হয়ে উঠল। উত্তেজনা এবং আবেগে হাবু কাঁপতে লাগল।

এমন সময় পাড়ার দিক থেকে হাজির হল কেশব। বলল, 'কেউ মুখ খুলছে না। সবাই ফিস্ফিসিয়ে কথা বলছে। ছেলেটা নাকি খুব ভালো ছিল। বড়ো গরিব ঘরের ছেলে। পরের জন্য অন্ত-প্রাণ ছিল। বাড়ির বাবা, মা ভাইবোন সবাই আছে। তারা এর মরণ খবর এখনও পায়নি।"

করিম চাচা বলল, 'ছেলেটা নাকি সত্যিই বড় সুন্দর। সবাই তাই বলছে। তবু মরল কেন?

গলার স্বরটা নামিয়ে আনল কেশব। 'ও নাকি এক নেতার ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে গুলি খেয়েছে।'

সকলে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, 'যারা মেরেছে তারা এক নম্বরের পশু। বুড়ো বাপ মাকে দেখবে কে?'

সকলেই নীরব। কারও কাছ থেকে কোন উত্তর নেই।

এমন সময় একটা পুলিসের জিপ্ এসে থামল। প্রশ্ন 'আপনারা কেউ কি এই ছেলেটার সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

'আমাদের এখানের ছেলে নয়, আমরা জানব কি করে।' উঠে দাড়িয়ে উত্তর দিল বাঁশি।

কোন সূত্র না পেয়ে হতাশ হয়ে পুলিসের দল চলে গেল। রোস্তম প্রস্তাব দিল, 'চল্ সবাই মিলে একবার দেখে আসি।' অতি ব্যস্ত যারা তারা ছাড়া বাকি সকলেই সঙ্গী হ'ল।

ছেলেটিকে কে যেন ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে গেছে। চোখের কোণে জলের দাগ এখনো স্পষ্ট। চোখের তারা আকাশের দিকে স্থিরবদ্ধ। মুখটা আঘাতে আঘাতে বিকৃত। চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। খুব ভাল করে না দেখলে পরিচিত আপন জনেরাও বুঝতে পারবে না ছেলেটি তাদের কিনা। জামা সমেত বুকটা ফ্যালা করা আছে। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে শরীরে শক্তি বলতে আর কিছুই থাকে না।

বাঁশি প্রথম কথা বলল, 'ওতো আমাদের সমাজের একজন, তবুও এমন করে হত্যা করল কেন?'

'এই কেনর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা সবাই কিন্তু উত্তরটা কেউ দিতে পারছি না। সত্য কথা কেউ বলতে চাইছি না। গা আড়াল দিয়ে চলছি, আসলে সত্য মরে গেছে।' রোস্তমের মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনে পুলিশের লোকেরা একবার সবার মুখের দিকে তাকাল।

যারা এসেছিল ছেঁড়া ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে এক এক করে সবাই কেটে পড়ল। একমাত্র হাবুই রয়ে গেল। পুলিসের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিরাপদ দূরত্ব হতে লাশটা দেখতে লাগল।

লাশটা ট্রলিতে তোলার আগে মুখ দিয়ে থুতু ছেটানোর মত কিছুটা রক্ত বুদ্‌বুদের আকারে বেরিয়ে এল। এই দৃশ্য দেখে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল হাবু। আর দাঁড়াতে পারল না। শরীরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে। বাধ্য হয়ে একটু দূরে যে শিরীষ গাছটা ছিল তারই তলায় গিয়ে বসে পড়ল। মনে হ'ল তাকেই যেন একদল লোক খুন করতে আসছে। কিন্তু কেন? সে না হয় ভুল করে একবার সত্যি কথাই বলেছিল। বলেছিল, 'আমাদের পাড়ার রাস্তাটার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ পেয়েছ কিন্তু পাঁচ হাজার

টাকাও খরচ করনি।' এ কথার উত্তরে তারা বলেছিল, 'তোর এই বাড় আমরা ঘুচিয়ে ছাড়ব।' কিন্তু সে তো অনেক আগেকার ঘটনা। এখন এসব মনে পড়ছে কেন?

নিদারুণ আতঙ্কে চারপাশ অন্ধকার দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল হাবু। স্বপ্নে দেখল কালু, মোনার দল তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। ছুরির ফলা লক লক করছে, কী বিশ্রী হাসি হাসছে ওরা। 'এইবার বাছাধন যাবে কোথায়?'

'না, না, তোমরা আমাকে মেরো না। আমি খেটে খাওয়া মানুষ। আমার বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আছে। মারা গেলে সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে। দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না।'

'মরার আগে সব শালাই বলে অমন কথা। দে শালাকে খতম করে দে।'

'আমাকে মেরো না, পায়ে পড়ছি তোমাদের, আমি তো তোমাদের লোক।'

কিন্তু একি! দুটো হাতই চাকু চালিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল হাবু। চীৎকার করে উঠল, 'কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও!

'তোকে বাঁচাবার জন্য কোন শালা নেই' ওরা হাসল। হাঁফাচ্ছে হাবু, 'তোমরা আমাকে তো মারবেই। তোমরা জ্ঞানবিবেক দয়া মায়া হারিয়ে ফেলেছ, তোমরা ঘাতক।' ইতিমধ্যে পেটে, বুকে, পিঠে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় শেষ চীৎকার করে উঠল হাবু, 'তোমরাও একদিন এইভাবে মরবে।'

বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে ওরা চলে গেল।

এক সময় নীরব হয়ে গেল দেহটা। প্রাণহীন হাবু পড়ে রইল নির্জন মাঠে বিলের ধারে।

নিজের লাশটার সঙ্গে হোগলাবাড়ির ঐ লাশটার অনেকখানি মিল খুঁজে পেল হাবু। ঐ লাশটার চোখ দুটোর মত তারও চোখ দুটো বেরিয়ে

গেছে। ঠিক যেন আকাশটার দিকে চেয়ে আছে। এখনো ঐ চোখ দিয়ে উপরের আকাশটা, বয়ে যাওয়া নদীটা, সবুজ ধানক্ষেত, খালের শাপলা শালুক, চৈতি গাজনের সঙ, চড়ক, বারোয়ারি পুজো -- সব কিছু দেখতে চাইছে।

কাঁদছে হাবু, 'আমি তো মরতে চাইনি। আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলুম।'

হাবু দেখল ঐ লোকটার মত তারও মুখ দিয়ে রক্ত থুতু বেরিয়ে আসছে। লাশটা রক্তমাখা মুখে বলছে, 'তোমরা বিবেককে খুন করেছ, তোমরাও বাঁচতে পারবে না।' হাসছে সে। তার রক্তাক্ত থুতু লাগছে আকাশের গায়ে, আকাশটা যেন রক্তে রক্তে লাল। রক্ত ছিটিয়ে পড়ছে নদীর জলে, ফুলের পাপড়িতে, মাঠে, প্রতিটি ঘরে, দেবতার গায়ে। সব কিছু শিউরে উঠছে। বৈশাখী মেঘ জল না দিয়ে শুধুমাত্র ঝড় তুলেই পালিয়ে যাচ্ছে। বলছে ঐ রক্তের দাগ মুছে দেবার ক্ষমতা তারও নেই।

পাড়ার দিকে তাকাল হাবু। তার খুন হওয়ার খবরটা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। পথঘাট সব কেমন যেন শুনশান্। পুলিশ আসার আগেই পুরুষেরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়। সবার চোখে মুখে অস্থির নীরবতা এবং ভয়। কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছে না।

বাড়ির পানে তাকাতেই দেখল বাবা পাগলের মত হয়ে গেছে। 'আমার ছেলে কারুর সাতে নেই, পাঁচে নেই, তবু খুন হ'ল কেন? মা মূর্চ্ছা গেছে, ধূলার উপর পড়ে আছে, সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। স্ত্রী মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি করে ফেলেছে। জ্ঞান ফিরলেই কপাল চাপড়াচ্ছে, 'এ কি হ'ল, গতকালও নিজে না খেয়ে ভাতগুলো ছেলে-মেয়েদের মুখে তুলে দিয়েছিল। হায়! হায়! একি হ'ল গো।' বলতে বলতে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ছেলে মেয়ে দুটো সমানে কাঁদছে। এই পৃথিবীর আবেদন নিবেদন পৌঁছায়নি কেবল ঐ ছাগলটার কাছে। সে মাচানের সযত্নে রাখা গাছগুলো আপন মনে খেয়ে চলেছে।

মনে হলো ঐ ছাগলটা বাদ দিয়ে বাদবাকি সকলকে খুন করা হয়েছে। ভীষণ খারাপ লাগছিল হাবুর। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে ফেলল।

সকালের বাতাস কাঁপন তুলেছে পথের দুধারের গাছপালায়। অসংখ্য

অতৃপ্ত আত্মা যেন সমস্বরে চীৎকার করছে – 'আমাদের মেরো না, আমরা বাঁচতে চাই।'

ঘুমঘোর অবস্থাটা কেটে যেতেই উঠে দাঁড়াল হাবু। মাথার ভিতরটা এখনও কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। অসহায় চোখে তাকাল হোগলাবাড়িটার দিকে। কেউ কোথাও নেই। অনেক আগেই পুলিশের লোকেরা লাশটা তুলে নিয়ে গেছে। চারপাশে সীমাহীন শূন্যতা। কিন্তু একটু আগের দৃশ্যগুলো এখনো সমানে চলাফেরা করতে লাগল। চারপাশে শুধু রক্ত, সারা মাঠ জুড়ে রক্ত, শুধু রক্ত, যেন রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে সেই লাশটার কান্নার প্রতিধ্বনি।

বাড়িতে ফিরে আসছিল হাবু। মনে হচ্ছিল সে একটা রক্তের নদী পার হচ্ছে। ঘর্মাক্ত দেহে চীৎকার করে উঠল, ''আমাদের বাঁচতে দাও।''

রাবণ

তিন দিন একটানা যুদ্ধের পর গতকাল ইন্দ্রজিৎ নিহত হ'ল লক্ষ্মণের হাতে। স্কুলের ছুটির পর আমবাগানের বিকেলবেলাটা কদিন থেকেই বেশ জমজমাট। যুদ্ধের তাগিদে হার মেনে গেল বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা। রেখে দাও মারাদোনা, আগে আমবাগান চলো, তারপর অন্যকথা। কিন্তু বাড়ির শাসন, সে তো কম নয়। মাকে কোন মতে রাজি করিয়ে তীর ধনুক নিয়ে হাজির হতে নোটনের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিল এতক্ষণে খেলা হয়ত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু দেখল খেলা শুরুর এখনো দেরি। আজো যুদ্ধ হবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। রাবণ নিজে যুদ্ধ করবে, যার তার সঙ্গে যুদ্ধ নয়, স্বয়ং রামের সঙ্গে। দারুণ ব্যাপার।

সকলকে উদ্দেশ্য করে লেক্‌চার দিচ্ছে অজয়, "যেই রাম রাবণ সাজুক, কেউ কাউকে তীর মারবে না। মাঠের উত্তর পশ্চিমে ঐ যে দুটো বুড়ো তাল গাছ আছে, তীর ছুঁড়তে হবে ওখানে। অন্যেরা তীর ছুঁড়বে আকাশে।"

ন্যাড়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "গাছে তীর মারব কেন?"

"আজ বাজি দিতে হবে। হারলে প্রত্যেকের জন্যে একটা করে লজেন্স চাই। প্রথম কুড়ি তীরেই বিচার শেষ হবে। যার বেশি লাগবে, সে জিতবে।"

নোটন প্রতিবাদ করল। "এ হতে পারে না, এত জনের লজেন্স কিনতে দশ টাকা লাগবে।"

ভেংচি কাটল ভজা। "স্কুলে যখন দু'টাকার টিফিন খাস্, তখন। রাম রাবণ সাজতে গেলে কিছু দিতে হয়। নচেৎ সবাই চাইবে রাম রাবণ হতে।"

যুক্তিটা মন্দ নয়। চুপ করে গেল নোটন। কারণ অতগুলো টাকা খরচ করা তার সাধ্যের অতীত। লাটাই ঘুঁড়ি কেনার জন্য লক্ষ্মীভাঁড় থেকে দু'টাকা পেয়েছিল। অত কষ্টের টাকা ওদের কথায় খরচ করা যায় না। অতএব সৈন্য সাজাই সে সুবিধার বলে মনে করল। হোক না আকাশ পানে, তীর ছুঁড়তে পাবে, সেটাই বা কম কিসের।

ন্যাপলা, তিনকড়ি, বোঁচা, ঘোতনের মুখ তখন হাঁড়ির মতন। অন্য দিনের মত হলে এবার তাদের রাম সাজার পালা। কিন্তু জগার প্রস্তাব সব বানচাল করে দিল। জগা বলল, "রাম রাবণ হতে গেলে প্রত্যেককে দশ টাকা করে দিতে হবে।"

সবাই চুপ। শেষ পর্যন্ত ক্যাবলা বলল, "আমি রাজি, আমি রাম হব।"

আর যায় কোথা, আগুনে যেন ঘি পড়ল। ন্যাড়া তীর ধনু নিয়ে নেমে পড়ল আসরে। "আমি হব রাবণ, দেখাই যাক, কে জেতে।"

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি আর শিস্ দেওয়া চলল কয়েক মিনিট। 'চালাও রাম রাবণের যুদ্ধ, আমরাও রেডি।' গোটা দল দু'ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাম রাবণের পক্ষে। ঘোতন বোঁচার শখ ছিল রাম সাজার। তারা রাবণের পক্ষ নিল। ন্যাপলা তিনকড়ি রাবণ সাজতে না পেরে পক্ষ নিল রামের।

কেউ এনেছে তীরধনুক, কেউ বাখারির তরবারি, কেউ বা প্লাষ্টিকের গদা। সবার মাথায় বটপাতার মুকুট। রাজা বলে রাম রাবণের মুকুটটায় রঙ করা পাখির পালক।

পড়ন্ত রোদ্দুর লুকোচুরি খেলছে আমবাগানের মাথায়। মাঠের উপর মনোরম ছায়া। সবুজ ঘাস কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে। খুব কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই। যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান বটে।

শুরু হ'ল কৃত্রিম যুদ্ধ। তরবারিতে তরবারিতে গদায় গদায়, তীরে তীরে সে কী লড়াই। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। কেউ বলছে — "হর হর মহাদেও, জয় শ্রীরাম।" কেউ বলছে — "জয় মা কালী, লঙ্কেশ্বর রাবণের জয়।"

স্কুলে শেখা হাই জাম্পের গুণে এক একজন এক মিটার পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে। খড়ের লেজ নিয়ে ন্যাপলার একটু অসুবিধাই হচ্ছিল। রাবণ সাজতে না পেরে হনুমান সেজেছিল। খেদটা মিটিয়ে নিচ্ছিল লাফে আর হুঙ্কারে।

কিন্তু ক্যাবলা ওরফে রাম যখনই তীর ছুঁড়ছিল তখনই থেমে যাচ্ছিল গোটা দল। সবার লক্ষ্য তালগাছের দিকে। গাছে লাগলেই সে কী উল্লাস, 'জয় শ্রীরাম'। ন্যাড়া অর্থাৎ রাবণের দলও কম যায় না। সমান সমান তীর বিঁধল গাছে। পাল্টা চীৎকার -- ''লঙ্কেশ্বর রাবণকী জয়।''

ফল যখন সমান সমান তখন মুষড়ে পড়ল সবাই, ''যাঃ! লজেন্স আর হ'ল না।''

কিন্তু অন্যদের এই জল্পনা কল্পনার মাঝে শুরু হয়ে গেছে রাম রাবণের যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব। পোটে অর্থাৎ কালনেমি চেঁচাচ্ছে, ''চালাও বাবা, জোর কদমে চালাও, থামলে চলবে না।''

প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবার। চোখ জ্বলছে ক্যাবলার, চোখ জ্বলছে ন্যাড়ার। 'হারব বললেই হেরে যাব। দেখে নেব কার কত হিম্মৎ।'

ছোট ছোট ধনুক। পেঁকাটির মাথায় কাদা লাগানো তীর। চলল ভীষণ রণ। টানের চোটে কঞ্চির ধনুকের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। একজন অপরকে সত্যি সত্যি তাক করে তীর ছুঁড়ছে। এঁকে বেঁকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে যে যার। দু'একটা লাগছে গায়ে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, খেলা খেলা যুদ্ধের মাঝে এ এক ফ্যাচাং। সবাই অবাক, 'সন্ধ্যা হয়ে এল, তোরা থামবি কি না বল্' সমস্বরে ধমক দিল সবাই। রাগে ঝল্সে উঠল ক্যাবলা, 'হারামজাদা রাবণ, আঃ আঃ করতে করতে এখনো শুয়ে পড়ে নি কেন?'

লাফিয়ে উঠল ন্যাড়া, 'বটে রে, সব জারি ভেঙে দেব এইবার। কে শোয় দেখাচ্ছি।' তীর ধনু ফেলে রেখে ছুটে এসে ক্যাবলাকে কাঁচি মেরে ফেলে দিয়ে বসে পড়ল বুকের উপর।

কালনেমি ওরফে পোটে চীৎকার করে উঠল, 'রাবণকে ফাইন দিতে হবে।'

ক্যাবলাকে ছেড়ে দিয়ে ন্যাড়া এবার ঘুরে দাঁড়াল পোটের দিকে। মুখ ভেংচে বলল, তুমি খুব জানো, রামায়ণে রাবণ মরেছে বলে এ যুগেও মরতে হবে নাকি। এ যুগের রাবণ মরে না।'

ততক্ষণে ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাবলা। "ঠিক আছে, তোরই জয়।"

বেলা শেষ, খেলাও শেষ। এবার ঘরে ফেরার পালা। সাঁঝের আঁচলে কাঁদছে গোধূলির আলো। মনে হ'ল বিশ্বের মানচিত্রে দাঁড়িয়ে ন্যাড়া তখনো বিজয়ীর মতো হাসছে।

বাণপ্রস্থ

আশ্রমের নাম আনন্দ নিকেতন। প্রতিষ্ঠাতা বিমলানন্দ সরস্বতী। ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে গিয়ে জেলের ভিতরেই কেটে গিয়েছিল জীবনের বিরাট অংশ। দেশ স্বাধীন হবার পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিগমানন্দ সরস্বতী সম্প্রদায়ের কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিলেন। পরে ভিক্ষালব্ধ অর্থের সাহায্যে গঙ্গাতীরে সাহা বাবুদের পরিত্যক্ত ভিটা কিনলেন। কয়েকজন দীক্ষিত শিষ্য নিয়ে শুরু হ'ল জঙ্গল সাফাই অভিযান। ধীরে ধীরে বদলে গেল জায়গাটির রূপ। দু'একর জায়গার চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। তৈরি হ'ল মন্দির। পূব দিকে সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য ছোট ছোট কয়েকটি ঘর। ফুল ফলের গাছে পরিবেশটা এমনই সুন্দর হয়ে উঠল যেন এক স্বর্গ। পরবর্তীকালে এখানে গড়ে উঠল অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শেষ বেলাকার আশ্রয়স্থল। সন্ন্যাসীদের দ্বারা এই বৃদ্ধাশ্রম চালিত হলেও আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে পূর্বের সেই উদারতা রজায় রাখা সম্ভব হ'ল না।

নিয়ম হ'ল যাবৎ জীবন এখানে বাস করতে হলে লাখ টাকা দান করতে হবে। বিনিময়ে আধুনিক যুগের সব উপকরণই পাবে হাতের মুঠোয়। প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আমোদ প্রমোদের জন্য রেডিও, টি.ভি, খবরের কাগজ, মাসিক পত্র পত্রিকা, আরও বেশি পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরি, ধর্মীয় আলোচনা সভা ইত্যাদির সংযোজনে দৈহিক এবং মানসিক ক্লান্তি দূর করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। যোগ ব্যায়াম এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা হ'ল। বলা যেতে পারে জীবনের স্রোতে ভাসমান মানুষগুলোর এ এক

অভিনব যৌথ পরিবার।

শুভময়বাবু আনন্দ নিকেতনের একজন আবাসিক। সবার সঙ্গে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। অতীতের গৃহকোণ এবং দেখা স্বপ্নগুলো ভুলে যেতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। শানবাঁধানো গাছের তলায় বসে যখনই একটু নির্জনতা উপভোগ করার চেষ্টা করেন তখনই মনে হয় জীবন যেন সমুদ্রের বেলাভূমি। প্রতি মুহূর্তে ঢেউ এসে আশা আকাঙ্ক্ষার ছবিগুলো মুছে দিচ্ছে। মন বাঁচতে চায়, কিছু একটা অবলম্বন চায় তাই নতুন স্বপ্নের তুলিতে বার বার কত ছবি শুধু এঁকেই চলে। শুভময়বাবু ভাবেন সংসার নামক বস্তুটা বড়ই মজার। যা কিছু আপন বলে ধরতে গেছেন তা সরে গেছে। সম্যকরূপে সব কিছু সরে যায় বলেই জীবন পরিবারের নাম সংসার। জীবনের ছেলেবেলা, যৌবন আর কোনদিন নতুন করে ফিরে আসবে কি?

যৌবন যাকে নিয়ে ডালপালা মেলল সেই মণিকাও আজ আর নেই। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সে যে জীবন সঙ্গিনীকে হারায় তার মত অভাগা বোধ হয় কেউ আর নেই। দুজনে মিলে বসে বসে অলস স্মৃতি রোমন্থনের একটা বিস্ময়কর মাধুর্য ছিল। পরস্পর ছিল দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, এসবের ভাগীদার হবার আর কেউ নেই। সবাই নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়।

মেয়ে তমালিকা বিয়ের পর অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে হরিয়ানায়। বর্তমানে তারা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। বিশাল কারবার, লোকজন এবং অর্থের কোন অভাব নেই। নিজের সংসার সামাল দিতেই ব্যস্ত। চার পাঁচ বছর পর তিন চার দিনের জন্য একবার করে আসত, এখন আর আসে না। মাঝে মধ্যে ফোনে যোগাযোগ রাখে।

ছেলে তমোনাশ কম্‌পিউটার ইন্‌জিনিয়র। কর্মস্থল কানাডা। সেখানের মেয়ে বিয়ে করে সেখানেই রয়ে গেছে। একবার দুজনে এসেছিল। লাখ টাকা জমা দিয়ে এই বৃদ্ধাশ্রমে পাকাপাকিভাবে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে। এখন প্রতিমাসে কিছু হাত খরচ আসে। এইভাবে সে পিতৃদায় থেকে মুক্ত।

গাছের ছায়ায় বসে শুভময়বাবু কত কথা আপন মনে ভাবেন। জীবন

সায়াহ্নে ঠিক এমনটা তিনি চান নি। তিনি তো চেয়েছিলেন নিটোল এক গৃহকোণ। আপন পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনিদের নিয়ে মধুর এক পারিবারিক বন্ধন। ওদের আয়নায় দেখবেন মণিকা এবং নিজেকে। হারিয়ে যাওয়া সব কিছু আবার ফিরে পাবেন নতুন করে। কিন্তু এ কি হ'ল, ভাবেননি স্বাধীনতা এবং আত্মসুখের প্রাবল্যে বাবা-মায়েরা অতল জলে তলিয়ে যাবে। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষে সাংসারিক বন্ধন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কর্তব্য পরায়ণতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সাদরে বরণ করল পাশ্চাত্য রীতি-নীতি। এই সব ক্যামেরা মাফিক সংসারে স্বাধীনতা এবং সুখ আছে, আনন্দ নেই। আপন স্বার্থপরতা এ যুগের যুবকদের গোপন মনটাকে এখন আর ব্যথিত করে না। বরং এটাই যুগের নিয়ম।

আপন মনে বলতে থাকেন শুভময়বাবু, "মণিকা পরপারে গিয়েও তুমি শান্তি পাও নি। চেয়ে দ্যাখো আমি কেমন করে বেঁচে আছি। তোমার অত ত্যাগের বিনিময়ে কিছুই পাও নি তুমি, আর আমি তো জীবনের গোনা দিনগুলো শেষ করার জন্য ব্যস্ত। বুকের ভিতরটা হাহাকার করে ছেলে-মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখার জন্য। কিন্তু এ সবের জন্য আকাঙ্ক্ষা অলীক এবং অবাস্তব।"

ছেলেবেলার কথা মনে পড়লেই মনে হয় জীবনটা ভীষণ ছোট। স্পষ্ট ভেসে ওঠে গাঁয়ের স্কুলে যাওয়ার পথে পদ্মপুকুর, সেনের ডাঙা, আমবাগান, তালসারির মাঠের কথা। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা, এ সব ভোলা যায় না। ঝড়ের ক্ষণে সবার সঙ্গে মিশে আমবাগানে আম কুড়ানো, বৈঁচি ফল এবং টক করমচার লোভে তাল সারির মাঠের পুবের দিকে দল বেঁধে ধাওয়া করা, কোনদিন বা পদ্মপুকুরে সাঁতার কাটা — কত ছবি প্রতিদিন সামনে এসে দাঁড়ায়। সে সব দিন বড় মধুর এবং নির্মল। সে সব কথা মনে পড়লে আনন্দে চোখে জল এসে যায়।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য কী দুরন্ত পরিশ্রম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব ধাপগুলো সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে হয়েছিলেন ডক্টর শুভময় জানা। অধ্যাপক হিসাবে বঙ্গবাসী কলেজের জীবন কত না ঐশ্বর্যে ভরা।

নিপুণ শিল্পীর মত মা তাকে গড়ে তুলেছিলেন অশেষ যত্নে, স্নেহ

এবং ভালোবাসায়। নানা রকমের খাবার তৈরি করে খাওয়াতে বড় ভালোবাসতেন মা। কপালে সিঁদুরের টিপ, লালপাড় শাড়ি পরে যখন সামনে আসতেন তখন মনে হ'ত যেন মা দুর্গা।

মায়ের জন্য কোন উপমাই খুঁজে পান না শুভময়বাবু। তাঁর স্নেহের খোকা আজ বৃদ্ধাশ্রমে বন্দি। "মাগো তুমি থাকলে বলতে পারতে এটা আধুনিক সভ্যতার সুফল না কুফল।"

"তুমিই তো মণিকাকে বৌমা করে ঘরে এনেছিল। পুরানো দিনের রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান বজায় রেখে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলে। তোমার দেওয়া আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবনের শুরু। মনে হয় আমি এক দিনের জন্যও ঠকে যাই নি, জীবনটা কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল মণিকা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং ভালোবাসায় আমরা এক হয়ে গিয়েছিলাম। দাম্পত্য জীবনের এ পবিত্রতা সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ভারতবর্ষের এ জিনিস সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ হওয়া উচিত। সবাই যদি যৌবনের সুখস্বপ্নে বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে কেটে পড়ার তালে থাকে বুঝতে হবে সভ্যতার ক্যানসার হয়েছে। মাগো তুমি পরপার থেকে চেয়ে দ্যাখো তোমার শুভময় কত অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে।"

"আরে জানাবাবু, কী ভাবছেন একা একা বকুলতলায় বসে। শুনেছেন আজকের খবর। নীহার বাবুর সঙ্গে গুপ্ত বাবুর হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল।" কাছে এসে দাঁড়ালেন মৃদুল বাবু।

হাসলেন শুভময়বাবু, "কারণটা জানতে পারি কি?"

"কারণ আবার কি, অতি সামান্য। নীহার বাবুর ছেলের মুম্বাইতে বিরাট সোনার কারবার। ছেলের সুখ্যাতি গাইছিল। শুনে গুপ্তবাবু বলে ফেলেছিলেন, ছেলে যদি এতই রোজকার করে তবে আপনি অপরের কাছ থেকে টাকা ধার নেন কেন? দশ বছরেও যে ছেলে বাবাকে দেখতে আসে নি কোন মুখে তার গুণগান করেন? লজ্জা করে না।"

নীহারবাবু আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এলেন। "আপনার ছেলে তো শুনি সোনাগাছিতেই পড়ে থাকে। এখানেও টাকার সঙ্গে মদের বোতল নিশ্চয়

পাঠায়।"

শুভময়বাবু বললেন, "জানেন মৃদুলবাবু, দুজনেরই ছেলের বিরুদ্ধে, আত্মীয়স্বজন সবার বিরুদ্ধে বিশাল ক্ষোভ বর্তমান। তবুও বাবার মন তো, সব দোষ ক্ষমা করে দেন, কিছু না পেয়েও গুণগান করেন। এটাই বুঝি আমাদের এ বয়সের ধর্ম। এ ঠিক সেই সুরথ রাজার মত।"

মৃদুল বাবু বললেন, "আমারও মনে হয় আপনার ব্যাখ্যাই ঠিক, সংসারটা মনের চিরন্তন সঙ্গী হয়ে এই বৃদ্ধাশ্রমেও আপন অগোচরে চলে এসেছে। তা না হলে বৃদ্ধাদের মাঝেও এত কোন্দল কেন?"

"সাবিত্রী ভবন" আলাদা হলেও অবাধ মেলামেশার গুণে অনেক কথাই কানে আসে। বলা যেতে পারে মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনেক বেশি অহংকারী এবং ঈর্ষাকাতর।"

"ইন্দিরাদির কথা শোনেন নি। ভদ্রমহিলার ছেলেরা রাজা বাদশা, মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সোনার থালায় ভাত খায়, হীরামোতির গয়না পরে। সত্যিই যদি এমন, তবে সেই বিশাল জমিদারি ছেড়ে এখানে এলে কেন বাছা।"

"কোন্ ইন্দিরা বলুন তো?"

"ঐ যে ফরসা মত সধবা মেয়েটি। একখানা কামরা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ওঙ্কার নিলয়ে আছেন। কপাল মন্দ, কিন্তু দুজনে থাকার জন্য মানসিক ভারসাম্য বর্তমান।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। উনি তো শিক্ষিকা ছিলেন, ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন।"

আর আলোচনা এগোল না, কারণ দুপুরে খাবার ঘন্টা বেজে উঠল। পনেরো মিনিটের মধ্যে ভোজন কক্ষে হাজির হতে হবে। কক্ষের একদিকে বসেন মহিলারা, অন্যদিকে পুরুষেরা। শারীরিক বা অন্য কোন কারণে আশ্রম ছেড়ে বাইরে গেলে ম্যানেজারকে জানিয়ে যেতে হয়। ফলে খাবারের অপচয় হয় না। বেলা দু'টার পর কাউকে খাবার দেওয়া হয় না। এখানে পাতা ফেলা বা অন্য কিছু করার কোন বালাই নেই। লোকে সব কাজ করে দেয়।

খাওয়া দাওয়ার পর প্রত্যেকে যে যার চলে যান। কিন্তু দিবানিদ্রার সুযোগ নেই। কেউ হলঘরে খবরের কাগজ পড়েন, কেউ বা তাস খেলে কাটান। কেউ বা নানা রকম আলোচনায় মেতে ওঠেন। এই সময়টা শুভময়বাবু রঙ তুলি নিয়ে মেতে উঠেন। কখনো আঁকেন ছেলে বেলাকার ছবি, কখনো মায়ের, আবার কখনো বা মণিকার।

টানা একমাস ধরে মণিকার ছবিটা আঁকছেন। কিন্তু কোন মতেই মনের মত হচ্ছিল না। কোন দিন তুলি হাতে বসে কেঁদেই চলেছেন, একটা আঁচড়ও টানা হয় নি। আজও তুলি নিয়ে বসলেন, ধীরে ধীরে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। মনে পড়ে গেল মণিকার কথা।

শেষের দিকটায় মণিকা প্রায়ই বলত, "দেখো, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে মরব। মরেও সব সময় তোমারই কাছে কাছে থাকব। তুমি আমার ভগবান, আমার সব।"

"আমি তাহলে কি নিয়ে বাঁচব?"

"তুমি বাঁচবে তোমার সাহিত্যে শিল্পে আমাকে ধরে রেখে।"

একদিন আক্ষেপের সুরে বলেছিল "আমি বুঝতে পারি না আজকালকার ছেলেমেয়েরা বাবা মাকে এমন অনাথ করে রাখার দিকে ঝুঁকছে কেন? মেয়ের মত আমৃত্যু শ্বাশুড়ির সেবা করেছি, দুজনে মিলে বাবা মাকে দু-এক মাস ছাড়া দেখতে গেছি। কিন্তু এ যুগের ছেলে মেয়েরা কেন এমন হয়ে গেল বলো তো? বাবা মা এদের কাছে যেন বোঝা।"

"নতুন যুগে ইউরোপ এবং আমেরিকার কালচার ঢুকে পড়ছে। দেখা যাক কি ফল দেয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সামনে এখন বিপর্যয়ের মেঘ। কিন্তু একদিন এ মেঘ কেটে যাবে।"

সেদিন মণিকার মনের খেদ মেটাতে এই ভাবেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন শুভময়বাবু।

একবার আপন গ্রাম লক্ষ্মীকান্তপুর গিয়েছিল জীবনে। দেখা হয়েছিল মহাদেব মুখুজ্যের মায়ের সঙ্গে। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায় চোখে জল এসে গেল। "জানো বাবা, জীবনের সঞ্চিত অর্থ, সোনাদানা সব তুলে

দিয়েছিলাম পরাশরের হাতে। একটি মাত্র ছেলে। আশা ছিল সোনার চাঁদ বৌমা এনে সুখে থাকব। কিন্তু বৌমা এসে ছেলেকে এমনই বশ করেছে যে আমাকে দাসী বাঁদির মত জীবন কাটাতে হচ্ছে। ভাতে নুন ঢেলে দিলেও ধুয়ে খাই। দুঃখের কথা কাউকে শুনিয়েও তো লাভ নেই।"

আজ যখন মহাদেবের মায়ের কথা মনে পড়ে তখন মনে হয় সব জায়গাতেই আগুন লেগেছে। তিল তিল করে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। তবুও সবাই বাঁচার চেষ্টা করেন।

চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এলেন শুভময়বাবু। মণিকার চোখ দুটো ঠিকমত ফোটাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কারণ সে চোখের তারায় আঁকা ছিল ভালোবাসার নীল অতল সরোবর। সেই মাধুর্যেই স্পন্দিত হচ্ছে জননী ধরিত্রী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বারে বারে চেষ্টা করেন শুভময়বাবু, কিন্তু ঠিক মনের মত হয় না, মনে হয় মণিকা এর থেকে অনেক বেশি সুন্দর।

বাইরে এসে পায়চারি করতে লাগলেন শুভময়বাবু। কি যেন এক মানসিক অস্থিরতা সব সময়েই পিছু ধাওয়া করে। দশ বছর হতে গেল ছেলে বা মেয়ে কেউ একটিবারের জন্যও দেখা করে যায় নি।

তমোনাশের ছেলে কুনাল আট বছরের, মেয়ে পারমিতা ছ'বছরের। ওরা স্কুলে যায়। দাদু ভাইদের দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করে। একবার সামনে পেলে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নেবেন। তমোনাশের মতই দেখতে হয়েছে কুনাল ও পারমিতা। দাদুকে ওরা কাছে পেতে চায়। কিন্তু ওদের আবদার দূরত্বের ব্যবধানে মূল্যহীন হয়ে যায়।

কাজের মধ্য দিয়ে সময়টা কাটান শুভময়। আশ্রমের একঘেয়েমি মুছে ফেলার জন্য সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে ভারত পর্যটনের দায়িত্বটা তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। যে সমস্ত আবাসিকের সামর্থ্য আছে তাঁরা কিছু দিনের জন্য আলাদা একটা আনন্দের উপকরণ খুঁজে পান।

যে কেউ ইচ্ছা করলে শান বাঁধান রাস্তা ধরে ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কিন্তু ফুল তুলতে পারবেন না। অবশ্য কেউ যদি পুজোর জন্য কলকে ফুল, টগর, জবা, কাঞ্চন ইত্যাদি তোলেন তাহলে কেউ আপত্তি

করবেন না। শুভময়বাবু প্রতিদিন গোটাকয় টগর এবং কাঞ্চন তুলে নিয়ে বাবা মার নামে, মণিকার নামে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন। ফুলগুলো যখন ভাসতে ভাসতে দূর দেশে চলে যায় তখনই পুরানো স্মৃতিগুলো মনটাকে ব্যথিত করে। এভাবে দুঃখ পাওয়াতেও গোপন আনন্দ আছে।

ছিন্নমূল মানুষগুলো দিনের বেলায় অহংকার সর্বস্ব এবং পরশ্রীকাতর কিন্তু সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেউ মালা জপছেন, কেউ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হরি কীর্তন করছেন, কেউ গাইছেন শ্যামা সঙ্গীত, কেউ মীরাবাঈ বা সুরদাসের ভজন। মন্দিরে আরতির সময় মানসিক পরিবর্তনের এ দৃশ্যটি ভালো লাগে শুভময়বাবুর। নিজে যোগাসনে বসে চোখ বন্ধ করে যখন ভাবতে বসেন তখনই মণিকা, তমোনাশ এবং তমালিকার ছবি সামনে চলে আসে। এরাই যেন তাঁর ঈশ্বর।

শুভময়বাবু ভাবেন আশ্রমের এইসব মানুষগুলো সমুদ্রের বুকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। মিল শুধু একটি জায়গায়, সবাই অল্পবিস্তর অসহায়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপহার হিসাবে পেয়েছেন এই বৃদ্ধাশ্রম। এখানের ঠাকুরমার ঝোলায় অনেক গল্প আছে কিন্তু গল্প শোনার জন্য কোন নাতি-নাতনি নেই। শুভময়বাবুর ভীষণ ইচ্ছে হয় তমোনাশের ছেলেদের নিয়ে লুকিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলার। সবার মাঝে আছেন ঠিক কথাই কিন্তু এখানে দিনগুলো বড় ধীর পায়ে চলে। অফুরন্ত অবকাশ কাটাবার উপায় হিসাবে শুভময়বাবু বেছে নিয়েছিলেন ছবি আঁকা এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা।

সকালে বাগানে পায়চারি করছিলেন শুভময়বাবু। চন্দন গাছের নীচে বসে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছিলেন কোন এক বৃদ্ধা –

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নীচে।"

পরিচিত গান। সুরেলা কণ্ঠে গানখানি সকালের পরিবেশটিকে পবিত্র করে তুলছিল। শুনতে বড় ভালো লাগছিল। হঠাৎ পিওন এসে জানাল, "বাবুজি, কানাডা থেকে আপনার ফোন এসেছে।"

তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভার তুললেন, "হ্যালো, আমি তমোনাশ বলছি। আজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই দমদম এয়ারপোর্টে নামব। রাতটা আপনার সঙ্গে কাটিয়ে সকালের ফ্লাইটে জরুরি কাজে সিঙ্গাপুর যাব। আপনাকে দমদমে আসতে হবে না, আমরাই আপনার আশ্রমে চলে যাব। থাকার ব্যবস্থা করবেন।"

আনন্দে শরীরের রক্তকণিকাগুলো নেচে উঠল, আর কোন দুঃখ নেই। খোকা তমোনাশ সকলকে নিয়ে আসছে। ছুটলেন মঠাধ্যক্ষ নির্মলানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে। অতিথি ভবনের গোটা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন একদিনের জন্য। মহারাজের অনুমতি পত্র দেখিয়ে পাঁচশ' টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিলেন। আশ্রমের এক কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে নানা জাতের সুগন্ধী ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুললেন দু'খানা কামরা। হোটেলে বরাদ্দ করে এলেন তমোনাশের প্রিয় নানান ধরণের খাবার। সব রকমের নামকরা মিষ্টি আনিয়ে রাখলেন নামী দোকান থেকে। মিষ্টি, দই, আইস্‌ক্রিম, থাম্পস্ আপ, কোকাকলা এবং ফল ফ্রিজের মধ্যে রাখলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ করতেই কেটে গেল সারাটা দিন। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠছেন কিন্তু মনের দিক থেকে কোন ক্লান্তি নেই। বার বার মনে পড়ছিল মণিকার কথা — তার আদরের খোকা আসছে। আজকের জন্য তিনি যেন অতিথি ভবনের বাসিন্দা। মণিকার বাঁধান ছবিটা নিজের ঘর থেকে নিয়ে গিযে অতিথি ভবনে রাখলেন।

সন্ধ্যা নেমে এল। নির্দিষ্ট সময় পার হতে চলল কিন্তু কেউ এল না। আবার এল সকালের সেই পিওনটি। "বাবুজি আপনার ফোন।"

আবার ছুটলেন শুভময়বাবু। প্রতীক্ষার দোলায় দুলতে দুলতে রিসিভারটা হাতে নিলেন। "হ্যালো"।

"হ্যাঁ, আমি আপনার তমোনাশ বলছি। নতুন করে ফ্যাক্স আসায় আমরা সরাসরি সিঙ্গাপুর চলে যাচ্ছি। দমদমে নামা সম্ভব না হওয়ায় আমরা দুঃখিত।"

মনে হ'ল একরাশ অন্ধকার ঘিরে ধরেছে শুভময়বাবুকে। হাত থেকে রিসিভারটা সশব্দে টেবিলের উপর পড়ে গেল।

নতুন আলোয়

রিক্‌শা চলছে দ্রুতগতিতে। আরোহিনী এক অবিবাহিতা যুবতী। ভদ্রমহিলা মুগ্ধ বিস্ময়ে চারপাশ দেখে দেখে চলেছেন। পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ফুটপাথ জুড়ে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। হঠাৎ ঘটল ছন্দপতন। কোথা হতে তিন দুষ্কৃতী ছুটে এসে রিক্‌শার গতিরোধ করল। "গলার চেনটা আমাদের দিয়ে দিন, তারপর ভাল মেয়ের মত নেমে আসুন রিক্‌শা থেকে। আমরা আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যেতে হবে, নইলে খতম করে দেব।" তিনজনেরই চোখে মুখে পৈশাচিক হাসি খেলা করতে লাগল।
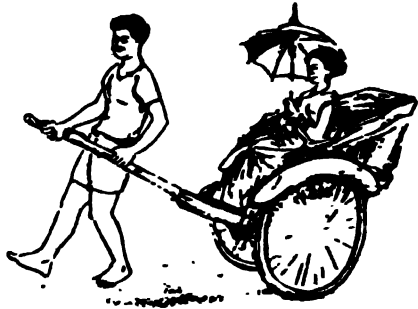
প্রচণ্ড সাহসে রুখে দাঁড়াল প্লাবন। "প্রাণ থাকতে আমার যাত্রীর অসম্মান সহ্য করব না। পথ ছেড়ে দিন, নচেৎ পুলিশ ডাকব।"

"ও! এই রিক্‌শাওয়ালাই তাহলে নাগর।" বলেই সজোরে এক ঘুসি চালাল প্লাবনের মুখে। ঘুসি খেয়েও সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। তিন জনে মিলে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল ওকে।

যুবতীটি রিক্‌শা হতে চেঁচাতে শুরু করল, "আমরা আক্রান্ত, আমাদের বাঁচান, বাঁচান।"

মারামারির দৃশ্য দেখে পথ চলতি মানুষেরা ছুটে পালালেন। পথে যারা পশরা সাজিয়ে ছিলেন তারাও তাড়াতাড়ি সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে মারলেন ছুট। কারণ ইতিমধ্যেই তাদের লক্ষ্য করে হাতবোমা ছোঁড়া হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে পথ একেবারে শুনশান। অসহায় যুবতীটিকে ওরা জোর করে নামাল।

পাশে রাখা মারুতিতে ওঠার নির্দেশ দিল। দারুণ জোরে কান্নাকাটি আরম্ভ করল এবার, "আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, আমি তো কোন অন্যায় করি নি।"

এইবার ওর মুখ চেপে ধরল একজন। নাটকীয়ভাবে দৃশ্যটা নজরে পড়ল বিদ্যালয় ফেরত কয়েকজন ছাত্রের। ব্যাপারটা অনুমানে বুঝতে পেরে ওরা ছুটে এসে চারপাশ ঘিরে ধরল। "সাবধান, আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমরা তোমাদের মায়ের ভোগে লাগিয়ে দেব।"

ক্রন্দনরতা যুবতীটিকে ছাড়িয়ে নিল ওদের হাত থেকে। দাঁড়িয়ে থাকা মারুতির চাকাগুলো থেকে সব বাতাস খুলে দিল এক ছাত্র। আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল, "গাড়িতে করে পালাবার পথ বন্ধ।"

ওদের আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছোরা কেড়ে নেবার আগে ওরা চিৎকার করে উঠল, "সাবধান, এক্ষুণি তোমাদের খতম করে দেব।"

সমানে গর্জে উঠল ওরা, "আমরা তোমাদের ভয় করি না।" এবার খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মিলিত শক্তির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছিল তিন দুষ্কৃতী। ছাত্রদের এমন বিক্রম দেখে গেট বন্ধ করা দোকানগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। গালিম চাপ দেখে দুজন দুষ্কৃতী বোমাবাজি করতে করতে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। ছাত্ররা একজনকে এমনই পাকড়াও করেছিল যে সে পালাতে পারে নি। পকেটের পিস্তল বের করার সুযোগ সে পায় নি। বেরিয়ে আসা জনতা ক্ষুব্ধ আক্রোশে তাকে উত্তম মধ্যম দিতে শুরু করল।

এভাবে চললে লোকটা মারা যেতে পারে ভেবে ছাত্ররা ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের জিম্মায় রাখল। ফোন করে থানায় জানিয়ে দিল ব্যাপারটা। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ হাজির হতেই দুষ্কৃতীকে তুলে দিল ওদের হাতে। আরোহিনী যুবতীর নাম, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার নোট করে নিলেন পুলিশ অফিসার।

সংজ্ঞাহীন রিক্‌শা চালককে হাসপাতালে না পাঠিয়ে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে মনস্থ করল মন্দিরা। ছাত্ররাও তা সমর্থন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে

একটা ট্যাকসি ডেকে আনল। অত্যুৎসাহী চারজন ছাত্র রিকশাওয়ালাকে সযত্নে তুলে নিল, মন্দিরাও উঠল ওদের সঙ্গে।

অন্যেরা বিদায় নেবার আগে বিজয়ী বীরের মত ওরা শ্লোগান তুলল -- "গুণ্ডাদের রুখছি, রুখব।" ট্যাকসি ছেড়ে দেওয়ার আগে মন্দিরা হাত নেড়ে ওদের সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

এখন আহত মানুষটিকে সুস্থ করে তোলা আপন দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে মনে করল মন্দিরা। তারই নির্দেশে ট্যাক্‌সি ছুটছিল গ্রিন ভিউ নার্সিং হোমের দিকে। ট্যাকসিতে ওঠার আগে ছাত্রেরা উলটে যাওয়া রিক্‌শা থেকে কাঁধে ঝোলান যে সাইড ব্যাগটা পেয়েছিল তা তারই হাতে তুলে দিল।

চলতে চলতে আজকের দিনটার কথা ভাবছিল মন্দিরা। ভাবছিল মানুষ যতই যুক্তিবাদী হোক ভাগ্য নামক বস্তুটিকে কোনদিন এড়িয়ে যেতে পারে না। তা না হলে এত সব ঘটনা ঘটে যায় কেমন করে। সকালে পরাশর তাকে গাড়িতে করে ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেই পরাশরই বিকাল তিনটায় ফোন করে জানিয়ে দিল, "দিদিমণি, গাড়ি খারাপ হওয়ার কারণে সারতে দিয়েছি। আজকের দিনটার মত আপনি ট্যাক্‌সিতে করে বাড়ি ফিরে আসুন।"

"ঠিক আছে এ তো হতেই পারে। আমি একাই বাড়ি চলে যেতে পারব।"

অফিস ছুটির পর বাইরে এসে ট্যাক্‌সির সন্ধান করল মন্দিরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন মিলল না তখন পথ চলতি একটা রিক্‌শা দেখে ওতেই উঠে পড়ল। মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ। চারপাশ দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরার মজাটা উপভোগ করছিল। আভিজাত্যের ঘেরাটোপ থেকে আজই সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেকে এক করে নিতে পেরেছিল। হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। ঘটনার চরিত্র দেখে মনে হয় এ চক্রান্ত পূর্ব পরিকল্পিত। মারুতিতে গেলেও আক্রমণ চালাত।

গ্রিন ভিউ নার্সিং হোমে ইনটেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হ'ল আহতকে। যে চারজন ছাত্র সঙ্গে এসেছিল তাদের আদর যত্নের কোন ত্রুটি রাখল না মন্দিরা। সবার নাম ঠিকানা, ফোন নাম্বার টুকে নিল। বলল, "আজ

থেকে তোমরা হলে আমার ভাই।”

“আবার আসব আগামী কাল।” এই বলে ওরা বিদায় নিল।

পথের এই দুর্ঘটনার কথা গ্রিন ভিউ থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল মন্দিরা। জানিয়েছিল -- “গাড়ি সারিয়ে নিয়ে পরাশর যেন নার্সিং হোমে চলে আসে। আবার নতুন করে হামলার সম্ভবনা থাকতে পারে। সে কারণে গাড়ি না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষায় থাকবে।”

কিছুক্ষণ আগেকার রক্ত হিম করা ঘটনাগুলোর কথা ভাবছিল মন্দিরা। সামান্য একজন রিক্‌শাওয়ালা যে অসামান্য সাহস এবং ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়াল তার কোন তুলনা হয় না। মনের মাঝে উচ্চ আদর্শবোধ না থাকলে কোন মানুষই এ শক্তি লাভ করতে পারে না। মন্দিরা বুঝল এখনো পৃথিবীর সব আলো নিভে যায় নি। পথচারীদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত এবং ভদ্রলোক ছিলেন, প্রাইভেটকারেও ছিলেন অনেকে, ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেও কাপুরুষের মত সবাই পালালেন। এরাই আবার বক্তৃতার ফোয়ারা ছোটাবেন অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। এই সব মানুষ প্রগতিবাদী বলে যতই বড়াই করুন, এদের দ্বারা মানুষের পৃথিবীর কোন উপকার হবে না। এঁরা সব ফুরিয়ে গেছেন। কিন্তু ঐ ছাত্রদল জীবনকে বাজি রেখে মরণপণ লড়াই চালাল। ওরা যেন ভোরের আলো। ওরা না রুখে দাঁড়ালে দুষ্কৃতীরা তাকে এতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখত কিনা সন্দেহ। হয়ত বা দাঁতাল নেকড়ের মত রুচিকর আহারে মেতে উঠত। এ যুগে হামেশাই মেয়েদের ধর্ষণ করার পর মেরে কোথাও ফেলে দিলে পরের দিন খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হয় মাত্র। কোন প্রতিকার হয় না। প্রথমটায় হৈ চৈ হয়, রাজনৈতিক দল বন্ধ ডাকে, তারপর এই সব ব্যাপার নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না।

এক সময় মন্দিরা সিস্টারের কাছে রোগীর অবস্থার কথা জানতে চাইল, “বলুন না সিস্টার, রোগীর জ্ঞান ফিরেছে কি?” দারুণ উদ্বেগ নিয়ে ভাল কিছু শোনার আশায় তাকাল সিস্টারের মুখের দিকে। অলক্ষ্যে সেও যেন ঐ যন্ত্রণার ভাগীদার।

সিস্টার প্রশ্ন করলেন, “উনি কে হন আপনার?”

"আমার অতি আপন জন।"

"ঠিক আছে, ব্যস্ত হবেন না। আজকের রাতটা কাটতে দিন।"

পরাশর এখনো আসে নি। মন্দিরা বসে বসে একমনে কী যেন ভাবছিল, হঠাৎ পাশে রাখা সাইড ব্যাগটার কথা মনে পড়ল। কৌতুহল হ'ল খুলে দেখার। চেন্ টেনে হাত ঢোকাতেই বেরিয়ে এল সুন্দর এক প্রস্থ জামাপ্যান্ট, একটা টিফিন কেরিয়ার যার মধ্যে আছে চারখানা রুটি এবং কিছু আলুভাজা। ব্যাগের একেবারে নীচে থেকে বেরিয়ে এল একটা পলিথিনের চেন টানা ফাইল, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ আছে এতে। ফাইল খুলতে মিলল রেশন কার্ড, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড এবং স্কুল ফাইন্যাল থেকে শুরু করে হায়ার সেকেণ্ডারি, বি.এ. অনার্স (ইংরাজী), এম.এ — সব কটা সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমার জেরক্স কপি, সেই সঙ্গে পোষ্ঠ অফিসের মাধ্যমে স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে পাওয়া এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। প্রত্যেকবার প্রতি ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। নাম প্লাবন গোস্বামী, ভবানীপুর এস. পি. মুখার্জি রোডের একটি লেনে বাড়ি। কিন্তু নার্সিং হোমে ভর্তির সময় উপস্থিত বুদ্ধির জোরে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে পেসান্টের নাম দিয়েছিল ভার্গব ভট্টাচার্য। বলেছিল পাড়ার সবাই এ নামে ডাকে।

এতগুলো ডিগ্রি আছে অথচ রিক্শা চালায়, এ সব তো সিনেমার নায়কের জন্য বরাদ্দ থাকে কিন্তু বাস্তবে কোনদিন দেখা যায় না। অনুমান করল জীবনে নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে এই কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে প্লাবন। হয়ত কোন কঠিন এবং নির্মম অভিজ্ঞতা অপরের তোষণ এবং দাসত্বের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের এই পথে টেনে এনেছে। প্লাবনকে ঘিরে মনের মাঝে সহানুভূতির এক অনুপম পরিমণ্ডল গড়ে তুলল মন্দিরা।

ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ তৎপরতা শুরু হয়ে গেল বাড়িতে। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই গাড়ি সারিয়ে নিয়ে মন্দিরার বাবা মাকে সঙ্গে করে পরাশর হাজির হ'ল নার্সিং হোমে। মেয়ের সামনা সামনি হতেই চোখে জল এসে গেল দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধার। মা আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। সঙ্গে সঙ্গে

জানতে চাইলেন সেই রিক্‌শাওয়ালার কথা যে মন্দিরাকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। মন্দিরা জানাল, "ইনটেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে আছে, সিস্টার বলেছেন রাতটা না কাটলে রোগীর উন্নতি বা অবনতির কিছুই বোঝা যাবে না। আমার মনে হয় কষ্ট হলেও রাতটা নার্সিং হোমের ওয়েটিং রুমে কাটানো উচিত। সেই সঙ্গে উচিত হবে প্লাবনের বাড়িতে খবর দেওয়া।"

বাবা মার সম্মতিতে পরাশরকে নিয়ে মন্দিরা পাড়ি দিল ভবানীপুরের দিকে। নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি এসে জানল গাড়ি গলির ভিতর যেতে পারবে না। অগত্যা পায়ে হেঁটে দুজনে ওদের বাড়িতে হাজির হল। দেখল টালির ছাউনি দেওয়া দু'কামরার ছোট একটি বাসা, সামনের দাওয়াটি বাঁশের চাঁচ দিয়ে সুন্দর করে ঘেরা। গরিবের কুটির হলেও পরিচ্ছন্ন।

প্রথম পরিচয়ের ব্যবধান কাটিয়ে যখন মাথা নীচু করে মন্দিরা আজকের ঘটে যাওয়া কাহিনির বিবরণ শোনাল তখন ওরা তিনজনেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। সান্ত্বনা দিল মন্দিরা, "নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনবই, সে দায়িত্ব আমার।"

ছেলেকে দেখার জন্য মা দু'মেয়েকে বাড়িতে রেখে ওদের সঙ্গে নার্সিং হোমে এলেন। দেখতে দেখতে গোটা রাত শেষ হয় গেল। সকাল ছ'টায় সিস্টার হাসতে হাসতে এলেন, "অবস্থা ভালর দিকে, রোগীর জ্ঞান ফিরেছে। আপনারা দেখা করতে পারেন।" এই সংবাদ রাত জাগার সমস্ত ক্লান্তি মুছে দিল। সকলে মিলে দেখা করল প্লাবনের সঙ্গে। কিছু বলতে না পারলেও চোখ মেলে এমনভাবে তাকাল যেন সে সকলকে চিন্তাভাবনা করতে মানা করছে।

আবার পরাশরকে নিয়ে দু'বোনকে আনার জন্য রওনা হল প্লাবনদের বাড়িতে। দেখল দু'বোনে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলেছে। চা পর্যন্ত খায়নি। পর্ণা এবং পল্লবীকে বোঝাল "ভয় নেই, জ্ঞান ফিরে এসেছে, চোখ মেলে তাকাচ্ছেন। আপনাদের দুবোনকে এখনি নিয়ে যাব। তৈরি হয়ে নিন।"

মন্দিরা এবং পরাশরকে ভিতরে এনে নিজেদের বিছানায় বসাল। দেখল ঘরের মাঝে একটি সেলাই মেশিন এবং জামা তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম

আর আছে ডিগ্রি কোর্সের অসংখ্য বই। জানল ফ্রক বানিয়ে দু'বোন পড়াশোনা চালায়, উদ্বৃত্ত যা থাকে মার হাতে তুলে দেয়, দুজনই ছাত্রী হিসাবে খুবই ভাল। অপর কামরাটি আয়তনে ছোট, প্লাবন থাকে। দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে নজরে পড়ল অসংখ্য বই। এমনি ভাবে লড়াই করে যারা জীবনটাকে সাজায় — তারা কোনদিন পরাজয় মানতে পারে না, মন্দিরা বুঝল তার উপলব্ধির মাঝে কোন খাদ নেই।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মন্দিরা ফিরে এল পর্ণা এবং পল্লবীকে নিয়ে। দু'বোনের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার এবং পানীয় জল আনান হয়েছিল। সেগুলো এবং প্লাবনের সাইড ব্যাগটা ওদের হাতে তুলে দিল। বলল, "এবার আপনাদের পালা। আপনারা এখানে থাকুন। আমরা বাড়ির থেকে একটু ফ্রেশ হয়ে দুপুরের মধ্যেই এখানে ফিরে আসছি।" মন্দিরা আপন বাবা মা এবং প্লাবনের মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলল নিজেদের বাড়িতে। আসার সময়ে ওদের ফোন নাম্বার দিয়ে এসেছিল যাতে করে প্রয়োজনে ফোন করে সব কিছু জানাতে পারে।

বাড়ি ফেরার পথে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি হতেই মনে সন্দেহ জাগল হয়ত এই চক্রান্তের মূলে আছে তারই অফিসের স্টাফ রজত রায়। জোর করে প্রেম করার মতলব এঁটেছিল রজত। একটার পর একটা কু-প্রস্তাব কাগজে লিখে মন্দিরার টেবিলে রেখে যেত। কিন্তু কোনভাবে সাড়া না পাওয়ায় ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে দুষ্কৃতীদের সাহায্যে হত্যার চক্রান্ত করেছিল। যথেষ্ট সাবধানী ছিল মন্দিরা। নিজে ওভারসীজ ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার। নিরাপত্তার জন্য ম্যানেজার ধর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো ফল মিলল। "আপনাদের ব্যাপার নিয়ে আমায় জড়াবেন না, ভালবাসা না থাকলে কেউ কখনো এমন চিঠি লিখতে পারে।" যতই শিক্ষাদীক্ষা থাকুক একজন নারী হিসাবে এ সমাজের মাঝে সে যে কতখানি অসহায় সেদিন তা বুঝতে পেরেছিল।

নিরুপায় হয়ে গোপনে থানায় গিয়ে সমস্ত চিঠিপত্র দেখিয়ে রজত রায়ের বিরুদ্ধে ডায়েরি করেছিল মন্দিরা। কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে

নড়ে। আজ কাগজ পড়ে মন্দিরা জানল রজত রায় ওদের তিনজনের সঙ্গে চুক্তির পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার একটি পয়সাও দেয় নি। ধরা পড়া দুষ্কৃতীর কাছ থেকে সমস্ত নেপথ্য কাহিনি জানার পর পালিয়ে যাওয়া দুই দুষ্কৃতী এবং নায়ক রজত রায়কে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বলে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

মন্দিরার একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় ধীরে ধীরে সেরে উঠল প্লাবন। নির্দ্দিষ্ট দিনে নার্সিং হোম থেকে রিলিজ করিয়ে নিল। নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে এল প্লাবনদের বাসায়। বিগত কয়েকদিন বস্তির এই বাড়িটার সঙ্গে মধুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্লাবনের মা মন্দাকিনী দেবী একদিন হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা যে খুব গরিব, আর্থিক অবস্থা তোমাদের মত হলে তোমার মত লক্ষ্মী মেয়েকে চিরকালের জন্য ঘরে তুলতাম।" কোন উত্তর দিতে পারে নি মন্দিরা। লজ্জা রাঙা হাসিটা ছড়িয়ে দিয়ে মন্দাকিনী দেবীকে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিল।

বাড়িতে ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই মন্দিরা বুঝতে পারল তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বিরাজ করছে যে পুরুষ তার নাম প্লাবন। সারা জীবন দিয়ে সে তাকে ভালবাসতে চায়। বিপদের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত হাজির হয়েছে। জীবনে ঠিক এমন করে কখনও কাউকে সে আবিষ্কার করে নি।

প্লাবন একদিন তার কাছে বর্ণনা করেছিল অতীতের এক করুণ অভিজ্ঞতার কথা। গোলপার্কের কাছে বাসের মধ্যে এক যুবতীর বুকের ভিতর থেকে মানিব্যাগ বের করে ফেলল একজন পকেটমার। যুবতীটি তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলল। লোকটা প্রচণ্ড শক্তিতে হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে ব্যাগটা দলের দ্বিতীয় জনের হাতে চালান করে দিল। বাসভর্তি লোক, কিন্তু কেউ মেয়েটিকে সাহায্য করল না। প্লাবন যে মুহূর্তে লোকটিকে ধরতে গেল অমনি মুখে এক ঘুসি চালিয়ে নেমে গেল। এক বাসযাত্রী হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন — "এ লোক গেঁইয়া আছে।"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার মায়ের জন্য আর ওষুধ কেনা

হবে না।" তার কান্না, করুণ আর্তি কোন মানুষকেই স্পর্শ করল না। পরের স্টপেজে সে মাথা নীচু করে বাস থেকে নেমে গেল। সেদিন থেকেই নতুন করে জেগে উঠেছিল প্লাবন। কাহিনিটা শুনে চোখে জল এসে গেল মন্দিরার। বলল -- এইভাবেই কত ঘটনা প্রতিদিনের জীবনধারাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে।

একদিন বিকালে বেড়াতে বেড়াতে মন্দিরা নিজের ভাবনাগুলো মেলে ধরল প্লাবনের কাছে। সত্যিকারের বাঁচতে হলে মানুষের হারিয়ে যাওয়া সাহস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। দলীয় রাজনীতির সুফলের পরিবর্তে আমরা কুফলটাই ভোগ করছি বেশি। দেশের শাসনভারটাই চলে গেছে মাফিয়া এবং গুণ্ডাবাজদের হাতে। চারপাশে ভীতির আঁধার। সবাই নিজেকে নিরাপদ করতে চাইলেও পারছে না। দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব দূর করে মা, বোন এবং সবার আত্মসম্মান রক্ষার জন্য চাই গণ জাগরণ, চাই মিলিত শক্তি। মিলিত শক্তির কাছে অপশক্তি নতজানু হতে বাধ্য। নচেৎ ক্যারাটে শিখে বা আত্মরক্ষার সব সরঞ্জাম হাতের কাছে রেখেও প্রকৃত বিপদের সময় নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। নিরস্ত্র ছাত্ররা শুধুমাত্র মনের শক্তির জোরে ভাগিয়ে দিল দুষ্কৃতীদের।

অল্প কয়েক দিনের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পরিবেশটাই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। পারস্পরিক সম্বোধন আপনির পরিবর্তে তুমিতে পৌঁছে গিয়েছিল। প্লাবনের শিক্ষকতার মাঝে নতুন প্রেরণা যোগান দিতে লাগল মন্দিরা। "ঐ সব ছাত্রদের মন থেকে সব ভয় মুছে দাও। ওদের জানাও নতুন যুগের অন্যায় অবিচার দূর করতে তোমাদের মিলিত শক্তিই হবে প্রধান হাতিয়ার।"

পর্ণা এবং পল্লবীর মনেও নতুন করে ঝড় তুলল মন্দিরা। "ভেবে দেখ, এ রকম ভাবে বাঁচার থেকে বীরের মত মরাও ভাল, শয়তান জব্দ করতে হলে মেয়েদেরও সমানতালে এগিয়ে আসতে হবে। অসহায় অবস্থায় আছি জেনেই ওরা সবলে আমাদের গলা টিপে ধরছে। ছোট ছোট শক্তি গুলো মিলিত হলে দুষ্কৃতীরা রাজ্যপাট গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে।"

পর্ণা এবং পল্লবী মন্দিরার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শোনে। "তোমরা

জেনে রাখ আমার অফিসে আমি আর কাউকে ভয় করি না। অফিসের অধিকাংশ কর্মচারী উচ্চশিক্ষিত, অবস্থাপন্ন কিন্তু ভীষণ ভীরু। এই ভীরুতার জন্যই অতীতে রজত রায়ের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ জানাতে সাহস করে নি।''

পাড়ায় পাড়ায় ''শক্তি সংঘ'' গড়ে তোলার কাজে মন্দিরা সবার কাছ থেকে দারুণ সাড়া পায়। জীবন এবার যেন সার্থকতার পথ ধরে চলতে থাকে।

প্লাবনদের পাড়ায় কয়েকমাস আগে ধর্ষিতা হয়েছিলেন এক যুবতী, থানায় ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। ধর্ষণকারী যেহেতু একজন বড়মাপের রাজনৈতিক নেতার আত্মীয় সে কারণে পুলিশের লোক কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টে চরিত্রহীনা বলে প্রচার চালিয়েছিলেন। সবাই জানত বিপাশা চৌধুরী সে ধরণের মেয়েই নয়। ক্ষিপ্ত বিপাশা প্রকাশ্যে বলত, ''ঐ দুষ্কৃতীর শাস্তির ব্যবস্থা সে নিজেই করবে। সে মরবে তবু প্রতিশোধ নেবে।'' মাঝে মাঝে ঝর ঝর করে কাঁদত। ''যে আমায় ভালোবেসে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল সে আর আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তোমারাই বল দোষটা কি আমার? এই পঙ্গু সমাজে বিচার বলে কিছু নেই। যে অন্যায় করল তার কিছু করতে পারল না অথচ শাস্তির বোঝাটা চাপিয়ে দিল আমার মাথায়।''

সেই বিপাশাই হ'ল এ পাড়ার 'শক্তি সংঘের' প্রথম সদস্যা। একদিন শক্তি সংঘের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সামনে সরাসরি এক অবাক করা প্রস্তাব রাখল মন্দিরা, ''আপনাদের মধ্যে কে এমন উদার এবং সাহসী আছেন যিনি সব কিছু জেনেও বিপাশাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। নতুন যুগে পুরানো দিনের জং ধরা নীতি মেনে সত্যটাকে হত্যা করে কোন লাভ নেই, এতে জীবন পঙ্গু হয়ে যায়।''

প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ সবাই নীরব। শেষে উঠে দাঁড়ালেন এক সৌম্য দর্শন যুবক। বিপাশা রাজি হলে আমি ওকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।'' সাফল্যের আনন্দে মন্দিরার চোখে মুখে যেন হাজারটা সূর্য জ্বলে উঠল।

এবার প্লাবনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন সার্থক করতে নিজেই ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করল। প্লাবনকে সঙ্গে নিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বাবা-মার কাছে বিয়ের সম্মতি প্রার্থনা করল। আভিজাত্য এবং অর্থকৌলিন্যকে পিছনে ফেলে নতুন যুগের সঙ্গে হাত মেলালেন দুই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। মন্দিরাকে লক্ষ্য করে বললেন "তুমি যে সত্যিকারের একজন উদার এবং নির্ভীক মানুষকে নির্বাচন করেছ এতেই আমরা গর্বিত। বিয়েতে আমরা আমন্ত্রণ জানাব সেই ছাত্রদলকে যারা প্রকৃত মানুষ হবার জন্য এখন থেকে প্রস্তুত।"

প্লাবনের হাত ধরল মন্দিরা, "এস আমরা দুজনে মানুষের মন থেকে ভয়ের কাঁটাগাছটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করি, আমাদের ভালোবাসার আলোয় জন্ম নিক এই নতুন শপথ।"

বাইরে শরতের আকাশটার পানে তাকাল দুজনে। দেখলো মেঘগুলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আসছেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, নতুন আলোয় মঙ্গলঘট ঘিরে মিলিত কণ্ঠের উচ্চারিত অভয়মন্ত্রে সম্পন্ন হচ্ছে মার বোধন।

কী বলবে অবিনাশ

প্রতিটি বাড়ির ছাদে লোক, পথের দুপাশে লোক। কোথাও একতিল ফাঁক নেই। ট্রাকটাকে সামনে রেখে এগিয়ে আসছে মিছিল। ট্রাকের উপর অনন্তর লাশটা পার্টির ফ্ল্যাগ দিয়ে ঢাকা। তার উপর অজস্র ফুল, ফুলের মালা। যাতে সকলে দেখে অনন্তকে চিনতে পারে, সে কারণে উপরের দিকে একটি হুকে তার ফটোখানি সুন্দর করে সাজানো। ঠিক তার পাশে নেতৃস্থানীয় একজন মাইক হাতে সরবে বর্ণনা করে চলেছেন হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কাহিনি। মাঝে মাঝে শ্লোগান দিচ্ছেন। প্রতিবাদে সমস্ত মিছিল উত্তাল।

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ঘটনাটি এইরকম। একাকী বাড়ি ফিরে আসছিল অনন্ত। হঠাৎ লোডশেডিং। পথের দু'পাশের সমস্ত দৃশ্য মুছে গিয়ে নেমে এল চোখ ধাঁধান অন্ধকার। ক্ষণিক বিভ্রান্তি কাটিয়ে সবেমাত্র চলতে শুরু করেছিল, এমন সময় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন। অত্যন্ত নিপুণ নৃশংসতার সঙ্গে ছুরি চালাতে লাগল সারা শরীরের এখানে ওখানে। প্রাণভয়ে চীৎকার করে উঠল অনন্ত — বাঁচাও, বাঁ-চা-ও। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের শাটার নামল। আশপাশে যারা ছিল উর্ধ্বশ্বাসে পালাল। এক রিক্সাওয়ালা দূর থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খবর দিয়েছিল পার্টি অফিসে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিল পার্টির লোকজন। দেখল কেউ কোথাও নেই। অনন্তর সংজ্ঞাহীন দেহটা পড়ে আছে রাস্তার উপর। তৎক্ষণাৎ নিয়ে গিয়েছিল হসপিটালে। মাত্র কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ। মৃত্যুর খবরটা পার্টির লোকজনই অবিনাশকে দিয়েছিল। পার্টি না জানালেও জানতে পারত সঙ্গে সঙ্গে নয়, বড় জোর পরের দিন সকালে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিল অবিনাশ। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কী এমন করেছে অনন্ত যে প্রাণের মূল্যে সেই দেনা শোধ করতে হবে। কিন্তু দ্রুত ব্যস্ততার মাঝে দুঃখ করার অবকাশ কোথায়। তাই বাড়ির কাউকে কিছু না বলে ওদের সঙ্গেই হসপিটালে চলে গিয়েছিল অবিনাশ। মাত্র একটি বারের জন্য ছেলের মুখখানা দেখতে চেয়েছিল; কিন্তু কেউ রাজি হয় নি, বলা চলে দেখাতে সাহস করে নি। পোষ্ট-মর্টেম পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রে সই করিয়ে নিয়ে ওরাই ফেরত নিয়েছিল ডেড্ বডি। পরের দিন বিরাট একটা মিছিলের পরিকল্পনায় ওরা তখন ব্যস্ত। লোক দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে করে অবিনাশকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্যটুকু অবশ্য ওরা ভুলে নি।

বাড়িতে তখন জেনে গিয়েছিল আসল ব্যাপারটা। সারা রাত মেয়ে দুটির সে কী কান্না! এত কান্না দেখেও কিন্তু কাঁদতে পারেনি অবিনাশ। বলা যেতে পারে কাঁদতে ভুলে গেছে। অসংখ্য প্রশ্ন এখন তার সামনে। মনে হচ্ছে চারপাশে গভীর অন্ধকার। তারই মাঝে উত্তর খুঁজে বেড়াতে লাগল পাগলের মত।

চলে গেল অনন্ত দুরন্ত অভিমান সঙ্গে নিয়ে। বলেছিল জীবনে সে কোনদিন হারবে না। কিন্তু দারুণভাবে হেরে গেল। মৃত্যুই তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেল। হায় রে মানুষ! মানুষের প্রতি সকল মমতা ভুলে একি নিষ্ঠুর উল্লাস। মিছিলের পানে একবার তাকিয়ে করুণ হাসি হাসল অবিনাশ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কী যেন ভাবল। তারপর আপন মনে বলল — কি লাভ এমন সব অভিনয়ের! একদিনের জন্যে শহীদ বানিয়ে দিলেই কি সে ফিরে আসবে!

কেমন করে অবিনাশ সান্ত্বনা দেবে নিজেকে! দিতে পারে না। সেদিনের স্মৃতিটুকু একটা ধারাল ছুরির মত বুকে গেঁথে আছে। অসহ্য যন্ত্রণা, রক্ত ঝরছে তবু টেনে বের করতে পারছে না। ঝগড়ার মুখে বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে তীব্র অভিমানে বলেছিল, 'আর কোনদিন ফিরব না, দেখে নিও।'

'যা যা চলে যা। রক্‌বাজ কোথাকার। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করিস্‌, লজ্জা করে না?' হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অসম্ভব ক্রোধে থর থর করে কাঁপছিল অবিনাশ।

ঘুরে দাঁড়াল অনন্ত। 'লোকে যে যা বলে সহ্য করে যাই, কিন্তু তুমি সব কিছু জেনেও যা তা বলবে না বলে দিচ্ছি।'

বাবা হয়েও ছেলের সেই তেজি মুর্তিটার সামনে দাঁড়াতে ভয় করছিল অবিনাশের। তবুও পিতৃত্বের গৌরব অটুট রাখতে বলেছিল, 'লেক্‌চারে পেট ভরবে না, মুরদ যদি থাকে তো সংসারের হাতে পয়সা এনে দে।'

নিজের কান্না ঢাকতে অবিনাশ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ফিরে দেখল অনন্ত চলে গেছে। রীতা এবং শান্তা তখনো দাদার পথের পানে করুণ চোখে তাকিয়ে।

সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। প্রায় দু'সপ্তা বাড়িতে পা দেয় নি। আজ ফিরে আসছে অনন্ত। কোন উত্তর দেবে না। অভিমান করবে না। নানা চিন্তায় মুখখানা আর কোনদিন মলিন হয়ে উঠবে না।

আজ যারা ওকে মিছিল করে নিয়ে আসছে ওদের দলের লোক বলে ও কিন্তু কোনদিন তা ছিল না। যোগ দিয়েছিল মাত্র কয়েকদিন আগে। কারণটাও অজানা নয় অবিনাশের। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে কোনমতে একটা চাকরি জোটানোর আশায় এই নৌকা বদল।

এতদিন ধরে অনন্ত তাদের জন্য সবকিছুই করেছে। ইলেক্‌শানে ভোট সংগ্রহ থেকে শুরু করে মিছিল পরিচালনা, দেয়াল-পোষ্টারিং, সব কিছু। এ সব করেছে আদর্শবাদের তাড়নায় নয়, একটু কৃপা পাবার আশায়। যে ভাবে আর পাঁচজন চাকরির সুযোগ করে নিচ্ছে, সেই ভাবে নেতাদের কৃপাদৃষ্টিতে যদি কিছু জুটে যায়। সমস্ত বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে একটানা দশ বছর আনুগত্য স্বীকার করার কারণ ছিল মাত্র একটাই। এত করেও দেখল কিছুই হচ্ছে না। ভেবেছিল অন্য দলে গেলে যদি কিছু হয়। নতুবা রাজনৈতিক দলাদলির বিলাসিতায় কখনই যোগ দিত না অনন্ত।

অতীতের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও আজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবছিল অবিনাশ। টিউশানি করে যা পেত তাতে কোন রকমে নিজের খরচটা চলে যেত। যোগ্য সন্তান হিসাবে আরও বেশি কর্তব্য পালনের আশা করত অবিনাশ। এটা কোন অন্যায় নয়। ছেলের এম.এ পড়ার খরচ যোগাতে এক কাপড়ে থেকেছে সারাটা বছর। কত কষ্ট, কত দুঃখ। লেখাপড়া শিখে সেই ছেলে যদি সংসারে কিছু এনে দিতে না পারে তো দোষ কার ? কতকাল দুঃখকে এমন নিত্যসঙ্গী করে চলতে পারে মানুষ। সংসারে মাঝে মাঝে ঝড় ওঠার কারণ তো এটাই।

দলবদল করেই অনন্ত জীবনের চরম সর্বনাশ ডেকে আনল। প্রতিশোধ নিল আগের দলের ওরা। শরীরের বিভিন্ন অংশে ছুরি চালিয়েও ক্ষান্ত হয়নি, ইট দিয়ে সারা মুখটা থেঁতলে দিয়েছিল। কী নিষ্ঠুর বর্বরতা!

আপন চিন্তার মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অবিনাশ। পরিষ্কার মনে হ'ল সারা দেশ জুড়ে অন্ধকার। মানুষ মানুষকে বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারে নি, অতি সহজ এবং সস্তায় মৃত্যুর জন্য রাজপথ তৈরি করে দিয়েছে। নচেৎ অনন্তকে যারা মারল তারা তো অনন্তর মতই অভাগা। মানুষকে মেরে আঁচলা আঁচলা তাজা রক্ত উপহার দিয়ে নেতাদের বাহবা কুড়াবে। এর বেশি ভাবতে শেখেনি, ভাবতে চায়নি।

আজ যদি ওর মা থাকত বুক ফাটিয়ে কাঁদতে পারত কিন্তু অভাগীকে দেখে যেতে হয় নি ছেলের এমন ভয়ংকর মৃত্যু। সুখের মুখ না দেখুক, মরে গিয়ে শান্তি পেয়েছে। মেয়ে দু'টোর কান্নাভরা চোখের দিকে তাকাতে সাহস করে না অবিনাশ। শান্তা মুর্চ্ছা যাচ্ছে যখন তখন। বড় বোনকে বড় বেশি ভালবাসত অনন্ত। জীবনের চারপাশটা ঠিক যেন এক মহাশ্মশান, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অবিনাশ। স্ত্রী চলে গেছে অকালে, সে চিতা এখনো নেভেনি, তারই উপর আবার তুলে দেবে আদরের একমাত্র পুত্রকে।

ছোট মেয়ে রীতা বোবার মত দাঁড়িয়ে ছিল পাশেই। প্রশ্নহারা মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল অবিনাশ। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল — 'এ পৃথিবীতে আমাদের দুঃখ করার অধিকার নেই।' ছোট এক টুকরো

কথা কাঁদিয়ে দিল রীতাকে, এ কান্না আর থামতে চায় না।

বাইরে অসংখ্য মানুষজন দেখে ভয় হচ্ছিল অবিনাশের, না জানি হয়ত ওদের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে আছে হত্যার নায়কেরা। পরিস্থিতিটা নতুন করে যাচাই করে নিচ্ছে। এভাবের কান্না যদি ওরা দেখে ফেলে তাহলে আবার নতুন কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। স্বজনের জন্য চোখের জল ফেলাও অপরাধ। বিচিত্র হলেও এটাই বাস্তব। মেয়ের হাত ধরে বাড়িতে ফিরে এল। দুঃখের ছবিটা এবার আর নিশ্চয় কেউ দেখতে পাবে না।

চারপাশটা ভাল করে তাকাবার সুযোগ পেল অবিনাশ। সময়ের কাঁটা এখানে যেন গতকাল থেকে একেবারে অচল। উনুনে ঠিক একইভাবে বসান আছে চায়ের কেতলি। রীতার কাপড়টা একইভাবে ঝুলছে দড়ায়। তুলতে ভুলে গেছে। শাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। গতমাসে এটা কিনে এনেছিল অনন্ত। সামান্য আয় থেকে এটুকু কেনা যে কত কষ্টকর সেটা অবিনাশ ভালভাবেই জানে। তবুও নিজের সব প্রয়োজন তুচ্ছ করে বোনের জন্য এনে দিয়েছিল। একটা শার্ট, একটা প্যান্ট আর একটা মাত্র লুঙ্গি নিয়েই বছরের ছ'টা ঋতু পার করে দিত অনন্ত। দেখে বড় কষ্ট হ'ত, আর তখনই প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ত অবিনাশ, সব বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যেত।

প্রয়োজন তো জীবনের ব্যর্থতার কথা শুনতে চায় না। প্রাণটাকে ধরে রাখার জন্য সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু উপায় না থাকলে সে সব আসে কোথা থেকে। অভাবের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান -- সব কিছু হারিয়ে ফেলে। মূল সমস্যার সমাধান করতে না পেরে দু'জনে কতবার অকারণে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এমন করে মুছে যাবে অনন্ত, এ যেন ভাবা যায় না। ভেবেছিল আবার ফিরে আসবে, না এসে কি থাকতে পারে। বাপ ছেলের নিত্য অমন কত ঝগড়াঝাটি হয়। এ সব তো আর সত্যিকারের নয়, কিছুদিন বাদে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ধারণাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ওরা। হায় ভগবান! এদের ভয়ে তুমিও কি চোখ বুজে বসে আছ! আপন মনেই চোখ দুটো মুছল অবিনাশ।

অনন্ত ঠিক যেন ওর মায়ের আদলে গড়া। সবার প্রয়োজন মেটাবে, কিন্তু নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। অবিনাশ একবার ওকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলেছিল, 'গেঞ্জিটা তো দেখছি শত তালি হয়ে গেছে। এক কাজ করবি, তোর জন্যে একটা গেঞ্জি আর আজকের বাজারটা করে আনবি।'

মাথা নীচু করে টাকাটা হাতে নিয়েছিল অনন্ত। কিন্তু ওর সূর্যাস্তের মত বিষণ্ণ মুখখানা লুকোতে গিয়েও পারল না। হতাশা, ক্লান্তি এবং বেদনার সে ছবি কোনদিন ভুলতে পারবে না।

অনন্ত বাজার থেকে ফিরে এল বোনের জন্যে একটা ব্লাউজ, আর তার জন্যে এক কৌটো জর্দা নিয়ে। জর্দার কৌটাটা হাতে দিয়ে ছোট ছেলের মত সে কী আনন্দ। 'কই দশ বারো দিন জর্দা খাওনি, অমন নেশার জিনিস ফুরিয়ে গেছে একথা তো ভুলেও বলনি একটিবার।'

সে মুহূর্তে অন্তরের সীমাহীন আনন্দকে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পায়নি অবিনাশ। শুধু মনে হয়েছিল ছেলেকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে সব দুঃখের জ্বালা জুড়িয়ে নেয়। তবু কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলেছিল, 'তোর গেঞ্জি কোথায় রে হতভাগা।'

'ও তোমায় ভাবতে হবে না। যাই হোক করে পরের মাসে হয়ে যাবে।'

শান্তাও প্রতিবাদ করেছিল। 'এ তোমার ভারি অন্যায়। আমরা তো ঘরে থাকি। ছেঁড়াগুলো সেলাই করে চালিয়ে দিতুম।'

'তুই থাম তো বুড়ি, আর পাকামি করতে হবে না।' স্নেহের শাসন চালাতে গিয়ে চোখে জল এল অনন্তর। কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল, 'একটা চাকরি পেতে দে না, দেখবি তখন কি করি।'

সেই বুকভরা আশা আর কোনদিন প্রভাতের মুখ দেখবে না। অনন্ত ঘুমিয়ে আছে অসংখ্য মানুষের মিছিলে। ইদানীং, লক্ষ্য করত অবিনাশ সংসারে অভাব দেখে কেমন যেন দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। ক্ষমতা না থাকলেও অনুভব করত সবার বেদনা। আজ তাদের সান্ত্বনা দেবার যে কেউ

নেই।

মানুষের ভালবাসা, সততার কোন মূল্য কি আজকের সমাজ দেবে! সব কিছুই জলের দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। নচেৎ অত সুন্দর, সৎ এবং চরিত্রবান ছেলেকে এমন করে হত্যা করতে পারে! অভাবের ভিতর দিয়েই এক এক করে অনেকগুলো বছর পার করে দিয়েছে অবিনাশ। জীবনে দেখাটাও কম হয়নি। কিন্তু ক্ষমতালাভ এবং তা বজায় রাখার জন্যে এমন কাপুরুষের মত ভীরু আদর্শহীন রাজনীতি কখন দেখেনি। সমস্যা সমাধানের কথা উঠলে এরা কাঁকড়ার মত জলের তলায় লুকায়।

কতবার না খেয়ে ইন্টারভিউ দিতে গেছে, বাড়ি ফিরছে হাসিমুখে।

'কি রে, কেমন উত্তর দিলি?'

'মনে হয় অন্যদের থেকে ভাল। সব কিছু বিচার করলে আমার চান্স আছে।'

কিন্তু হায় এদেশের প্যানেলের গেঁড়াকল। সামান্য একটা মাস্টারিতেও নামটা উপরের দিকে ওঠে নি। কানা পদ্মলোচন হয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে দাদার জোরে। তবু হাল ছাড়েনি অনন্ত। আশা ছিল পার্টির নৌকোয় চড়ে একদিন সে ওপারে পৌঁছে যাবেই। কিন্তু দেশ যারা চালান তারা তো ক্রমশই ভুলে যাচ্ছেন কাজের বা গুণের কদর। চাইছেন দলের জন্য সমর্থন, সেই সঙ্গে নিজের ক্ষমতাটুকু বজায় রাখার নিরাপদ ব্যবস্থা। এর জন্য দেশকে রসাতলে পাঠাতেও প্রস্তুত। ভাবতে ভাবতে প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করে অবিনাশ। সমস্ত শিরাগুলো এই মুহূর্তে যেন দুরন্তবেগে চলাফেরা শুরু করে। ইচ্ছে হয় এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ে এ অন্যায়ের টুঁটি টিপে ধরে।

কিন্তু পরক্ষণেই শরীরটা ঝিমুতে আরম্ভ করে। পেশিগুলো শিথিল হয়ে পড়ে। কোথায় প্রতিকার। কত সবুজ প্রাণ অনন্তর মত ঝরে পড়ছে প্রতিদিন। তাদের খবর ছাপা হচ্ছে, হরতাল পালন করা হচ্ছে, সভা করা হচ্ছে। মানুষ এসব খবর নিত্য পড়তে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর মনকে নাড়া দেয় না। অবিনাশ তবু ভাবে এত প্রাণ চলে যাচ্ছে, জেনেও একবারের জন্যও দেশটা প্রতিবাদে গর্জে উঠছে না কেন? সবার শিরদাঁড়া

কি সত্যিই আশ্চর্যজনক ভাবে নুয়ে পড়েছে?

একসময় অবিনাশ দেখল মিছিলটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ির দিকে। অসংখ্য মানুষের শব্দ স্পষ্টতর হচ্ছে। শ্লোগান দিচ্ছে --"অনন্ত অমর রহে। জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই -- পার্টির নামে গুণ্ডাবাজি -- চলবে না -- চলবে না"।

মিলিত স্বরে কেঁপে উঠছিল চারপাশের বাতাস। শব্দ শুনে রীতা এবং শান্তা দাওয়ায় বসে উচ্চৈঃস্বরে কান্না শুরু করে দিল। তাদের সে শোকের বেগকে বার বার চেষ্টা করেও থামাতে পারল না অবিনাশ। একসময় সকল কৃত্রিমতা ধ্বসে পড়ল, নিজেও কাঁদতে লাগল।

ঠিক তখনই দরজায় ঘন-ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। 'অবিনাশদা দরজা খুলুন। আমি কল্যাণ।' স্বরে অত্যন্ত ব্যস্ততা।

বাধ্য হয়েই দরজা খুলল অবিনাশ।

কোনরকম ভণিতা না করেই তিনি বললেন, 'দাদা, আপনাকে একবার চৌরাস্তার মোড়ে যেতেই হবে। পার্টির সকলে রিকোয়েষ্ট করেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে গলে পড়লেন বিনয়ে, 'কোন কষ্ট করতে হবে না। সঙ্গে রিক্‌সা এনেছি। দেরি করবেন না দাদা।'

অতি পরিচিতের মত কথা বলছিলেন আগন্তুক। অবিনাশ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে, ঠিক যেন ডাকাত দেখছে। কই আগে তো কোনদিন দেখেনি এ মুখ! তবে হঠাৎ কেন?

কিছু চিন্তা ভাবনা করার আগেই আবার কথা বললেন লোকটি, 'কী ভাবছেন দাদা, চলুন। হাজার হাজার মানুষ আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।'

যাওয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল না অবিনাশের। তবুও ক্লান্ত পদে ঘরের ভিতর গেল। আলনা থেকে জামাটা নিয়ে সাবধানে পরল। তারপর নীরবে সামনের উঠোনে এসে দাঁড়াল।

আগন্তুক খুব ভাল করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগলেন অবিনাশকে। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে চোখ

কপালে তুলে বললেন 'দাদা, আপনি কি রেডি!'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, সেই সঙ্গে সন্দেহ এবং সংশয়। এসব কাটিয়ে ওঠার জন্য আবার প্রশ্ন করলেন, 'ঐ জামা কাপড়েই আপনি সভায় যাবেন।'

'কেন কী হয়েছে?'

'না, বলছিলাম জামাটা অন্তত বদলে নিতে। পিঠের দিকটা বড় বেশি ছেঁড়া।' কোন উত্তর দিল না অবিনাশ। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক হাসি হাসল। ফাঁসির আসামিও অন্তিম মুহূর্তে এমন হাসি হাসে না। মনে হ'ল সেই হাসিতে এই স্বাধীন ভারতবর্ষের পরাণটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সভা যেখানে চলছিল বাড়ি থেকে পায়ে হাঁটলে সেখানের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মিনিটের। এই সামান্য পথটুকু রিক্‌শয় চলছে অবিনাশ। ফ্লাগ হাতে পিছনে হেঁটে আসছেন কল্যাণ। কয়েক হাজার চোখ এই মুহূর্তে তাকে বার বার দেখছে। যেন কোন রাজকীয় মর্যাদায় সম্মানিত হতে চলেছে অবিনাশ। এমন অভিনব সমাদর কোনদিন ভাগ্যে জোটেনি।

রিক্‌শয় বসে আছে অবিনাশ। তাকে কেন্দ্র করে সারিবদ্ধ জনতা চিৎকারে ফেটে পড়ছে মুহুর্মুহু। 'জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই — বিচার চাই। পার্টির নামে গুণ্ডাবাজি চলবে না, চলবে না। বীর অনন্ত — অমর রহে।'

খুব ভাল করে দেখতে লাগল অবিনাশ। শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো শূন্যে আকাশের দিকে তালে তালে উঠছে, তালে তালে নামছে।

অবিনাশের ইচ্ছা হচ্ছিল এখনই রিক্‌শ থেকে নেমে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু যাবে কেমন করে। সে এখন বন্দি, ব্যাপারটা নির্মম হলেও সত্য। স্বাধীন ভাবে কোন কিছু করার বা বলার অধিকার তার নেই। সকলের ইচ্ছায় ক্ষণিকের জন্য তাকে মহানায়ক সাজতে হবে। অবিনাশ জানে, খুব ভাল করেই জানে

নিজ দলের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার জন্য নেতাদের এ এক কৌশল। এমন করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, হতে পারে না। তবুও তাকে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে অনন্তর জীবন কাহিনি। বলতে বলতে মুর্ছা গেলে আরো ভাল। ওদের ভাষায় — গ্রান্ড সাকসেস্। ট্রাকের উপর আজ অনন্ত স্থির নীরব। সেও তো শেষদিন পর্যন্ত করে গেছে এই সব। কিন্তু কী পেল? নিজেরই রক্তের উপর বিছানা পেতে ঘুমাল চিরকালের মত।

সভার খুব কাছাকাছি এসে গেল অবিনাশ। দেখল, এ কোন স্ট্রীট কর্ণার নয়, এ যে বিশাল জনসভা একেবারে রাজকীয় মিটিং। দলের সমর্থকরা তখন সমবেত হচ্ছেন কাতারে কাতারে। মিথ্যা হলেও এখন ভাবতে বেশ ভাল লাগছে — হাজার হাজার মানুষ ভালবাসত অনন্তকে। সেই ভালবাসার প্রমাণ দিতে ঘরের কাজ ফেলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে নিহতের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। অবিনাশ বার বার জনতার দিকে তাকায়, চোখ ভরে কিন্তু কেন জানি না মন কোনমতে ভরতে চায় না। ঠিক ধরতে না পারলেও বুঝতে পারে কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাঁক রয়ে গেছে।

মঞ্চের কাছাকাছি এসে অনন্তর ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই শোকে ভেঙে পড়ল অবিনাশ। মুখের সেই স্বভাবসুলভ হাসি যা নাকি সে অনেকবারই দেখেছে আজ তা যেন নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হ'ল। মনে হ'ল ঐ এক টুকরো হাসিতেই সে জীবনের সব কথা বলছে। ও হাসি দেশজোড়া নিপুণ ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে এক জীবন্ত প্রতিবাদ। তারই মত অভাগারা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মরণ ফাঁদের দিকে — ও হাসিতে তাই ধরা পড়ছে সকরুণ বিষণ্নতা। অনন্তর ঐ ফটোখানার দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে সাহস করল না অবিনাশ। বুঝতে পারল তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। পাগুলো টলছে অসহায় ভাবে। অতি দ্রুত সব মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে।

ধূসর দৃষ্টি মেলে তবুও প্রাণপণে একবার সামনের দিকটা দেখতে চেষ্টা করল। দেখল অসংখ্য ফুলের মালা, পার্টির ফ্ল্যাগের তলায় ঘুমিয়ে আছে অনন্ত। সকলে তাকে ছুটি দিয়েছে। তীব্র অভিমানে সে চলে গেছে অনেক দূরে। বাঁচার পথ না থাকলে মানুষকে বুঝি এমনি করেই চলে যেতে

হয়।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে সেই ধূসর অস্পষ্টতা গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হ'ল। অবস্থাটা বুঝতে পেরে কয়েকজন যুবক তাকে ধরাধরি করে মঞ্চের উপর নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না অবিনাশ। নেতাদের কথাগুলো বৃষ্টিপড়া শব্দের মত অস্পষ্টভাবে কানে আসতে লাগল। মনে হ'ল চারপাশে গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে পথ হাঁটছে একা। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অনন্তকে, চীৎকার করে ডাকছে। হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন কাঁদছে। খুব তাড়াতাড়ি কাছে এল অবিনাশ। চিনতে পারল মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট্ করছে অনন্ত। পথ জুড়ে রক্তের নদী। তখনো ও বলছে -'বিশ্বাস কর আমি কোন রাজনীতি করিনি। আমায় মারছ কেন?'

আর নড়ছে না দেহটা। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি। দু'চোখ ভরা জল। ও কি কমলা! অনন্তর মা! ছায়ামূর্তি সেই রক্তের উপর মাথা খুঁড়তে লাগল। এক সময় সম্পূর্ণ নীরব হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অনন্তর দেহটা। তারপর কাছে এসে মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে ভেঙে পড়ল বুকফাটা কান্নায়। কাঁদতে কাঁদতে উন্মাদিনীর মত খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই শান্ত হয়ে উদাস চোখে দূরপানে তাকিয়ে রইল। কী যেন ভাবতে লাগল আপন মনে। শেষে গায়ের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নীরবে একটানা কাঁদতে লাগল অতি করুণভাবে।

রক্তের স্রোত এগিয়ে আসছে তার দিকে। রক্ত, শুধু রক্ত! উঃ ভয়ংকর দৃশ্য! এ যে সহ্য করা যায় না।

এবার উঠে দাড়িয়েছে অনন্তর মা। আগুন জ্বলছে চোখে। কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলছে, 'তোরা দেখে নিস্, তোদেরও এমনি করে মরতে হবে।'

এলো চুল, আলুথালু বেশ, মাতালের মত টলছে কমলা। সেই আগুনঝরা চোখে দেখছে অবিনাশকে। অপরিসীম ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছে তার দিকে। 'মরতে এত ভয় পাও তুমি! কেন এমন করে তামাশা দেখতে এসেছ! ছিঃ!

ছিঃ! ছিঃ!’

একখানা ধারাল অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে কমলা। কী ভয়ংকর প্রশ্ন তুলে ধরছে তার সামনে, ‘পারবে না হত্যার প্রতিশোধ নিতে? এই ছুরিটা নাও। চীৎকার করে বল, অনেক অনেক রক্ত চাই।’

এ কী! কেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসছে অবিনাশ। ও কিন্তু এখনো বলে চলেছে, ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠ তুমি। তা যদি না পার পালাও। ছেলের মৃত্যুর মূল্যে এমন অভিনয় দেখার প্রয়োজন হবে না।’

চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই চীৎকার করে উঠল অবিনাশ। ‘আমাকে যেতে দাও। আর আমি থাকতে চাই না।’

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কয়েকজন যুবক ধরাধরি করে বসিয়ে দিল অবিনাশকে। সেই সঙ্গে সবিনয় অনুরোধ — ‘অনন্তর সম্পর্কে কিছু অন্তত বলুন। আপনি না বললে কি মানায়।’

একসময় কয়েদির মতো মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল অবিনাশ। বলার ইচ্ছা না থাকলেও একটা কথাই ঠোঁটের কাছে এসেছিল — ‘আমরা রাজনীতি বুঝি না, জীবনে বাঁচাটাকেই বড় করে বুঝি।’ কিন্তু পারল না। সমস্ত শরীরটা ঝিমাতে ঝিমাতে আবার নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। বুঝতে পারল এবার সে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ছে অন্ধকার ভারতবর্ষের রক্তাক্ত রাজপথে।

ক্ষীণকায় শরীরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মঞ্চের উপর। সহানুভূতি জানাতে ক্রুদ্ধ জনতা গর্জে উঠল — “সইতে পারছেন না, মূর্ছা গেছেন।”

পৌষ লক্ষ্মী
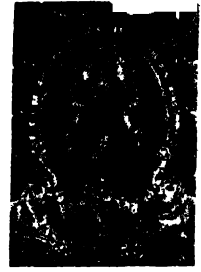
"মা ঠাকরুন, পোষ পাব্বনের চাল দাও গো।

কাঁধ থেকে বেতের ধামাটা নামিয়ে বার দরজার সামনে দাঁড়াল গঙ্গা। পাশে দশ এগার বছরের মেয়ে কালিন্দী। একমাথা রুখু চুল। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা কাপড়। নিটোল কাল রূপের আয়নায় দারিদ্র্যের এক নগ্ন প্রতিমা।

কিছুক্ষণ পরে কেউ আসছে না দেখে আবার ডাক দেয় গঙ্গা। 'কই গো মা ঠাকরুন, দুটি চাল দাও না।"

রাগে পুরোনো দিনের বিধি বিধানের মুণ্ডপাত করতে করতে সিংহীর মত বেরিয়ে এলেন বাড়ির গৃহিণী। অত্যন্ত বেজার বিরক্তির সঙ্গে ধামার ওপর একটা আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে শোনালেন, 'যাও, এভাবে আর পরের বছর এসো না।'

কথা গায়ে না মেখে একটু আবদারের সুরে গঙ্গা বলে, 'দুটো চাল না দিলে আমাদের পাব্বন হবে কি করে মা।'

"এমনি হয় নে আবার পাব্বন খাচ্ছে। আদরের চাঁদ মণি, দুটো ফলালে বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল।"

খোলা দরজাটা মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর কথা বলতে সাহস করল না গঙ্গা। মুহূর্তে সজীব আশাগুলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এল। শীতকালেও সারামুখে বৃষ্টির ফোঁটার মত ঘাম জমে ওঠে। চোখের কোণে জল। মায়ে ঝিয়ে পায়ে পায়ে অপর বাড়ির দিকে এগোয়। সদ্যলব্ধ অপমানের বোঝাটা মনের ওপর যাঁতার মত বসে থাকে। দু'জনের মুখে কোন

রা নেই।

বেনে পাড়ার কাছাকাছি এসে কালিন্দী জিদ্ ধরে। 'ফিরে চলো মা। দুরছাই এমন চাল মেগে দরকার নেই পিঠে খাওয়ার।'

'ওরে মানীর বেটি, এই একটু কথাতেই মেজাজ গরম। আমাদের আবার মান অপমান কিরে।'

মায়ের শ্লেষ মেশানো কথাগুলো শান্ত করতে পারে না কালিন্দীকে। 'না মা তুমি বাড়ি ফিরে চলো। এর চেয়ে উপোস থাকা ভাল।

'বেশি বুড়োমি করিস্ না। সবার বাড়ির ছেলে মেয়েদের হাতে পিঠে দেখে তোর ভায়েরা যখন বায়না ধরবে তখন থামাতে পারবি তো?'

এর কি উত্তর হবে জানে না কালিন্দী। অবাক চোখে মার মুখের দিকে তাকায়। তারপরেই মাথা নীচু করে পিছু পিছু চলতে থাকে।

সারাটা বিকেল মায়ে-ঝিয়ে ঘুরেছে দোরে দোরে। কেউ দিয়েছে, কেউ দেয়নি। তবুও খানিকটা চাল হয়ে গেছে। যাকে বলে রাই কুড়িয়ে বেল। পাব্বনের সময় ছেলেমেয়েদের হাতে দুটো পিঠে তুলে দিতে পারবে এই আনন্দে লোকের সমস্ত তিরস্কার ভুলে যায় গঙ্গা।

কালিন্দী কিন্তু ভুলতে পারে না। মনের মাঝে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দেয়। হঠাৎ মাকে জিজ্ঞেস করে, ''আচ্ছা মা, বাবা তো বারো মাস জমিতে কাজ করতে যায় তবে আমাদের ঘরে ধান আসে না কেন।''

মেয়ের কথায় গঙ্গা শত দুঃখেও হাসে। কথার ছিরি দ্যাখো, তোর বাবার কি জমি আছে যে ধান থাকবে।' কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'সারা জীবন পরের ক্ষেতে খেটে খেটে মানুষটার হাড়মাস কালি হয়ে গেল, পেল না কিছুই।'

বেলা শেষ। হিমেল বাতাস জানান দিচ্ছে আজও কনকনে ঠাণ্ডা পড়বে। পড়ন্ত রোদ্দুরও মাঠের বুক থেকে যাই যাই করছে। আলি পথ ধরে মা মেয়ে ফিরে আসছে ঘরে। গল্প করছিল গঙ্গা, আগেকার দিনের গল্প। তখন মানুষ এমন করে কাউকে ফিরিয়ে দিত না। নাপিত, ধোপা, কামার, খেয়ারি সব্বাইকে পাব্বনের সময় চাল দেবার নিয়ম ছিল। অনেক কালের নিয়ম। যুগ বদলে গেছে। এখন আর এসব কেউ মানতে চায় না। এখন লোকের

বাড়ির সামনে দাঁড়ানোটাই ভিক্ষের সামিল। যাদের অবস্থা ফিরে গেছে তারা সম্মান খোয়াবার ভয়ে আর যায় না, যায় শুধু অভাগারা।

চারপাশে উদাস মাঠ। আগেভাগেই লোকে ধানশুদ্ধ খড় বয়ে নিয়ে গিয়ে সুবিধে মত জায়গায় গাদা দিয়েছে। দূর থেকে গাদাগুলো ধানের মরাইয়ের মত দেখাচ্ছে। মাথায় ধানশিষের চূড়া। আহা! কী সুন্দর, ঠিক যেন মা লক্ষ্মীর মুকুট। তাদেরও যদি অমন গাদা থাকত, মরাইভরা ধান থাকত, তাহলে কী আর দোরে দোরে ঘুরতে হ'ত। এসব কথাই গঙ্গার মনের মাঝে পাক খায়।

যাদের গাদা দেওয়ার কাজ বাকি ছিল তারাও কাজ শেষ করে ফিরে আসছে ঘরে। হাতে ধানের আঁটি। লক্ষ্মী পুজোয় বাঁধুনি বাঁধা হবে। বাড়িতে বাড়িতে আজ উৎসবের ঢেউ। দুধপুলি, পাটিসাপটা, মালপো, সরু চাউলির গন্ধ উঠবে।

গঙ্গা দেখে সরষে ফুল, মুলা ফুল তুলে আনছে ছেলেমেয়েরা। খুশিতে দুচোখ ভরা। এই ফুল, আমের পল্লব আর ধানশিষ দিয়ে বাঁধুনি বাঁধা হবে। ঘট বসিয়ে বরণ করা হবে পৌষ লক্ষ্মীকে। বাঁধুনিগুলো বাঁধা থাকবে ঘটের পাশে। নানা রকমের পিঠে, আতপ চাল, ফল মিষ্টি দুধ পাটালি দিয়ে হবে সংক্রান্তি পরবের নৈবেদ্য। চাল পিটুলি দিয়ে আঁকবে পদ্মফুল। তার ওপর সিঁদুর দিয়ে আঁকা হবে মা লক্ষ্মীর আলতা পরা পায়ের ছাপ। গঙ্গার কাছে এ সব যেন স্বপ্ন। সে কিন্তু এক সময় এসব করেছে। তখন এই নিয়ে সারাটা দিন কেটে যেত অদ্ভুত আনন্দে। ক্লান্তি বলে কিছু থাকত না। এখনো ইচ্ছে হয় বৈকি কিন্তু কোথায় পাবে এত সামগ্রী। না-পারার ব্যথাটা বুকের ভিতর কাঠের আগুনের মত দাউদাউ করে জ্বলে।

সামনে হলুদ রঙের সরষে ক্ষেত। কালিন্দী ফুল তুলার জন্যে পা বাড়ায়। গঙ্গা হাত ধরে টেনে নেয়, 'কি হবে মা ফুল। না-বলে তুলতে যাবি, শেষে কেউ দেখে ফেললে বিপদ বাধাবে।'

'নিই-না দুটো, পুজো করব।'

"না, একদম যাবি না।" ধমক দেয় গঙ্গা। "আমাদের কি টাকার বাক্‌স আছে? মরাই, চালের কলসি, কিছুই তো নেই। বাঁধুনি তৈরি করে বাঁধবি কোথা?" যুক্তিতে কাজ হয়। আর এগোতে সাহস পায় না কালিন্দী।

সন্ধ্যে নেমে আসছে। ঠাণ্ডায় এক কাপড়ে কালিন্দী দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে থাকে। কাঁকালে চালের ধামা। বাড়িতে ফিরে নাড়া জ্বেলে হাত পা সেঁকার কথাটা মাকে জানিয়ে দেয়।

পাড়ার তেমাথায় নলেন গুড় বিক্রি করছে নন্দ। হাউলি বাগানে ওর বাড়ি। নাগরি থেকে লোকে গুড় কিনছে। আঁচলের পয়সা গুলো হিসাব করে গঙ্গা। মাত্র দু'টাকা, আরো কিছু হলে কিছু গুড় হ'ত। ধার দেনার কথা তো ভাবতেই পারে না। দেবেই বা কে। ওদিকে আর না তাকিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরে। নবান্ন উৎসবে সবাই মেতে উঠেছে, শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে।

চৌধুরী পাড়ার মেয়েরা সিদ্ধ পিঠে তৈরির মালসা, ঝারি ইত্যাদি ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুকুরঘাট থেকে। পিঠে তৈরি হবে। অনেক বাড়িতে দুপুর থেকেই লেগে গেছে পিঠে পুলির ধুম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পিঠে খেতে-খেতেই বেরিয়ে আসছে রাস্তায়! ঝাঁটা, কুলো, ছেঁড়া জুতো, হাঁড়ি, ছেঁড়া জামা ইত্যাদি দড়ি দিয়ে গেঁথে এক গাছ থেকে আর এক গাছ পর্যন্ত বেঁধে পৌষ আগলেছে বড়রা।

এসব দেখে গঙ্গা মনের দিক থেকে আরো ঝিমিয়ে পড়ে। পা দুটো বাড়ির দিকে যেন এগোতে চায় না। কী বলবে সে তার মাণিকদের। কত না আশা করে পথের দিকে চেয়ে আছে তারা। হত দরিদ্র রজকপাড়া যেন ঘুমিয়ে পড়েছে আজ।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসার সময় গঙ্গা ছেলেদের বলেছিল, 'তোরা কারো দোরে যাস্‌নি বাবা। সন্ধ্যের আগেই আমরা ফিরব। অনেক পিঠে আনব, খেয়ে ফুরাতে পারবি না।' ফিরতে দেখলেই পিঠে পিঠে করে লাফিয়ে উঠবে, তখন গঙ্গা কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

একই ধরণের কথা চিন্তা করছিল কালিন্দী। আচ্ছা মা, ভাইদের কী দিয়ে ভুলাবে।'

এই সামান্য কথাতেই জ্বলে উঠল গঙ্গা। 'অত পিঠে খাবার শখ কেন। তাদের যেমন তেমন তোরই বুঝি নোলা হয়েছে দ্যাখ।'

মায়ের কথার উপর সমানে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালিন্দী। 'আমাকে পিঠে দিলেও খাব না, তুমি দেখে নিও।'

"বলে অমন সবাই, খাবার সময় তবে কাড়াকাড়ি করিস্ কোন্ লজ্জায়।"

ভাঙাচোরা মন দিয়ে মা মেয়ে বাড়ি ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটটা ছুটে এসে গঙ্গার হাঁটু জড়িয়ে ধরে। 'ওরে দাদা, মা এসেছে রে। ধামায় কত পিঠে আছে দেখবি আয়।"

বাক্ সরে না গঙ্গার। ছোটটি তখনো দাবি জানাচ্ছে, "আগে আমাকে দাও।"

কালিন্দী তাড়া দেয়। "দূর হ, পিঠে পিঠে করে লাফাচ্ছিস্ কেন। পিঠে কোথায় রে হাঁদা।"

সে হাসে। "না-পিঠে নেই, তুই চুপ কর। অমন করলে তোকে আগুন পোহাতে নেব না।" দিদির উপর অভিমানটা মাকে ভাল করে জানিয়ে দেয়, 'বুঝলে মা, দিদি বড্ড মিথ্যে কথা বলে।'

দিনের বাকি ঘটনাগুলো সেই সঙ্গে ফলাও করে জানায়। 'মাগো, দাদা না শিবডাঙায় খেলতে গিসলো। সেখানে রতনকে পিঠে খেতে দেখে চেয়েছিল। সে দাদাকে হ্যাংলা আর ছুঁকছুঁকে বলেছে।'

গামছা ঢাকা ধামা খুলে ছেলেরা পিঠে দেখতে না পেয়ে রাগে ফেটে পড়ে।

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না গঙ্গা। উন্মাদিনীর মত ছেলেদের গালে ঠাস ঠাস করে কয়েক ঘা চড় কষিয়ে দেয়। 'মর না, মরলে আমার হাড় জুড়োয়।' ভাইদের উপর অহেতুক অত্যাচার দেখেও কিছু বলতে পারে না কালিন্দী।

মেয়ের জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বলতে পারে না গঙ্গা।

চেয়ে আনা চালগুলো ভিজিয়ে দিয়ে ছেলেদের কাছে ফিরে আসে। আদর ক'রে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। 'চাল ভিজলেই শিলে বেটে তোদের পিঠে তৈরি করে দেব বাবা। কত আর দেরি হবে। এক্ষুণি হয়ে যাবে।'

গঙ্গা জানে শীতকালে এ চাল ভিজতে সারাটা রাত লেগে যাবে। তবু মিথ্যে আশ্বাস দেয়। এমন আশ্বাস না দিলে অবস্থা সামাল দেবে কেমন করে।

দোরে হ্যারিকেনটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল, ছেলেরা নীরব। দূরের বাড়ি থেকে শাঁখের শব্দ এখনও ভেসে আসছে। মা লক্ষ্মীর পুজো শেষ হ'ল বুঝি।

ওদের বাড়ির ছবিগুলো মনে মনে আঁকতে থাকে গঙ্গা। মা লক্ষ্মীর আলতা পরা পায়ের ছাপে কী সুন্দর মানিয়েছে সব। চালে ভরা কলসিতে বাঁধা হয়েছে মা লক্ষ্মীর বাঁধুনি। ধানের গোলায় বাঁধুনি। কুলোভরা ধানের ওপর সিঁদুর চুপ্‌ড়ি। পাশে চাষের কোদাল, কাস্তে, দাউলি। নতুন চালের পিঠের গন্ধে মৌ মৌ করছে বাতাস। নিজেদের কথা ভেবে আর কত কাঁদবে। অলক্ষ্যে কয়েক ফোঁটা জলও গঙ্গার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

রাত বাড়ে। শীতের কাঁথার আড়ালে পৃথিবী লুকায়। এমন সময় বাড়িতে ফিরে এল বিজয়। গামছায় বাঁধা পিঠেগুলো গঙ্গার দিকে এগিয়ে দেয়। "রাত অব্দি কাজ করায় চৌধুরীরা এগুলো খেতে দিয়েছিল। নিয়ে এলুম। ছেলেদের ডেকে দিয়ে দাও?"

ডাকতে হয়নি ওদের। শাসন এবং ভয় তুচ্ছ করে কাঁথার ভিতর থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। জুল জুল করে তাকায় পিঠেগুলোর দিকে। ওঠে না কেবল কালিন্দী। কাঁথাটা আর একটু টেনে নিয়ে মুখটায় চাপা দেয়।

মাত্র দশটা পুর পিঠে। তিন জনকে দিলে তিনটে করে ভাগে পড়ে, বেশি থাকে মাত্র একটা। মুখও জানবে না। তবু হাসিতে ভরে ওঠে ওদের মুখ।

দু'ভাই খেতে শুরু করে। কালিন্দীর ভাগটা পড়ে থাকে।

গঙ্গার মুখে একটু হাসি এসেও মিলিয়ে যায়। এক সময় স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি খাবে তো?"

হ্যাঁ না কিছুই বলল না বিজয়।

খুবই অবাক হয় গঙ্গা। 'সে কি গো, সারা মরশুম খাটলে ওদের ওখানে, আজ দুটো খাওয়াল না! পাব্বনের দিন বলে কথা, এটা কেমন ধারার ব্যবহার!'

দুপুরের ভিজে ভাত বেড়ে দেয় সকলকে। মা মেয়ে পরে খাবে। বাবার সঙ্গে ছেলেরাও উধম গায়ে পেঁয়াজ লঙ্কা কামড়ে ভাত খেতে শুরু

করে। খেতে খেতে কথা বলে বিজয়। 'মা লক্ষ্মী আমাদের কাঁধে পা রেখে চিরকালই বাবুদের বাড়িতে চলে যাচ্ছে।'

এই ফাঁকে রজক পাড়ার উঁচু ভোঁতায় আগুনের শিখা উঠে। ছেলেমেয়েরা পরবের রাতে নাড়া জ্বেলে আগুন পোয়াচ্ছে। এটা ওদের দারুণ মজার ব্যাপার। ঐ আগুনের পাশে যারা জমেছে তাদের কারুরই বাড়িতে পিঠে হয় নি। সে দুঃখ ওদের নেই। ওরা নাচছে আর গাইছে — "সুখের পৌষ যেও নি, বেঁধে দিলাম বাঁধুনি।"

চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছে সেই সুর।

কালিন্দী তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে ভায়েদের ইশারা করে, 'এই যাবি? চল্ না।'

ওরা খেতে খেতেই বলে 'আমরা যাচ্ছি, তুই যা না।'

খড়ের নাড়া বগলে নিয়ে কালিন্দী আগুনের উৎসবে যোগ দিতে ছোটে। পিঠে না-খাওয়ার বেদনা এই মুহূর্তে আর মনে পড়ে না।

আগুনের উত্তাপটুকু শুষে নিচ্ছে উদম ছেলের দল। লক্ লক্ করে শিখা উঠছে। সারা আকাশটা লাল আলোয় ভরে যাচ্ছে।

গঙ্গা দেখে ঐ আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়েছে দূরে বহু দূরে, বড় লোকের দালানকোঠা পেরিয়ে আরও দূরে। চাদ্দিক কেমন আলো হয়ে যাচ্ছে। সেই আলোর পথ বেয়ে অনেক কাল পরে পৌষ লক্ষ্মী হয়ত তাদেরও ঘরে আসবে।

জাগানিয়া

জেলা শহর কৃষ্ণনগর। এরই একপ্রান্তে মল্লিক বাগান। এই মল্লিক বাগানের অধিকাংশই এখন বহিরাগত মানুষের বসতিতে পূর্ণ। স্থায়ী বাসিন্দাদের বেশিরভাগ চামার বা মুচি সম্প্রদায়ের। ডোম, হাড়ি, বাগদি এবং কাহার সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মানুষও আছে। দালানকোঠা তোলার ক্ষমতা এদের নেই বললেই চলে। মাটির ছোট ছোট ঘর, খড়ের ছাউনি -- এই সব ঘরেই এরা বাস করে। বড় রাস্তার ধারে চালা বেঁধে অনেকে বাবুদের কাছে ছাগল বা মুরগির মাংস বিক্রি করে। তবে বেশির ভাগ মানুষ ট্রলি বা রিক্শা চালায়। সাত সকালে মেয়েরা চলে যায় বাবুদের বাড়িতে ঝি-গিরি করার জন্য। সভ্যতার সমস্ত গতি যেন এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। এতটুকুও এগোতে পারে নি। কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে মদের নেশাতেই, এই হল প্রচলিত জীবনধারা।

তিন পুরুষ আগেকার কথা। এই অঞ্চলটায় শহর তখনো এগিয়ে আসে নি। একরাতে চিন্ময় দাস স্বপ্ন দেখলেন মা মঙ্গলচণ্ডী তাকে ডাকছেন "চিন্ময়, আর ঘুমাস্ না, উঠে পড়। শিলারূপ ধরে আমি তোর উঠোনে হাজির। সূর্যোদয়ের আগেই বার উঠোনে তুই আমার প্রতিষ্ঠা কর। তোর হাত দিয়ে আমাকে যারা পুজো দেবে আমি তাদের প্রতি প্রসন্ন হব। তারা দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাবে, কল্যাণ হবে।"

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই চিন্ময় প্রশ্ন করল, "আচ্ছা মা, আমি পুজো করলে লোকে যদি বাধা দেয় তখন কি উত্তর দেব?"

"বলবি শ্রীক্ষেত্রের কথা। সেখানে দারুরূপী ভগবান প্রথমে শবর

জাতির লোকেদের দ্বারা পূজিত হতেন। পরবর্তীকালে রাজাদের অনুগ্রহে নীলাচলে বিশাল মন্দির হয়েছে কিন্তু শবরদের পূজা পদ্ধতি এখনো বর্তমান। শ্রীক্ষেত্রে জাতির বিচার নেই। সেখানে কি ভগবান নেই। স্বয়ং চৈতন্যদেব কি জগন্নাথ দেবকে পুজো করেন নি।"

ঘুম ভাঙতেই বাইরে এল চিন্ময়। আকাশ ভরে আছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। সেই আলোতে চিন্ময় অবাক হয়ে দেখল স্বপ্নে দেখা শিলাটি তার উঠানে শায়িত। বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে প্রণাম জানাল মাকে। "জয় মা মঙ্গলচণ্ডী" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে আনন্দে সকলকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। "ওরে তোরা মা মঙ্গলচণ্ডীকে দেখবি যদি আয়। রাত শেষ হবার আগেই শিলারূপিনী মায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

এ ডাকে প্রতিবেশীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। বার উঠোনের ফাঁকা জায়গাটায় উঁচু বেদি বানিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। ঢাক বাজল, শাঁখ বাজল, দীপ জ্বলল, মাকে সিঁদুর, নতুন কাপড় এবং ফুল বেলপাতা নিবেদন করে পুজো সারল চিন্ময়। মার জয়গানে উত্তাল হয়ে উঠল সারাটা পল্লি। নতুন আলোয় এ যেন তাদের মুক্তি স্নান।

স্বপ্নে পাওয়া মায়ের কথাগুলো পাড়ার আপন জাতভাই সমতুল যারা তাদের শোনাল। বহু যুগের হীনমন্যতার অবসান কল্পে সকলে তখন মরিয়া। নতুন এক মহাশক্তি জন্ম নিল তাদের মাঝে। তারাও মানুষ, তাদেরও মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার আছে।

মায়ের কাছে অনেক লোক আসত অসুখ সারাবার জন্য, তারা নানা রকমের মানত করত। যারা ভাল হতেন তারা পুজো রেখে যেতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মার করুণার বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা যেত। অবিশ্বাস্য ভাবে রোগ মুক্ত হলেন কিছু উচ্চবর্ণের মানুষ। কিন্তু সমালোচনা থামল না। তারা বলতে শুরু করলেন, "মুচি, কাহার, ডোম, দুলেরা এবার থেকে বামুন হয়ে গেল। এই ঘোর কলিতে পৈতাধারী ব্রাহ্মণের আর প্রয়োজন নেই। এবার ঐ চিন্ময় মুচিটার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ধন্য হতে হবে।"

এই সব ব্রাহ্মণদের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় চিন্ময় এমনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে বাইরে বের হতে সাহস পেত না। সান্ত্বনার একমাত্র ব্যাপার হল কোন মুচি, দুলে, ডোম বা কাহারদের কেউ উচ্চ বর্ণের মানুষের ঘৃণা বা নিন্দার আর কোন গুরুত্ব দিত না। বরং চিন্ময়কে বেশি করে সম্মান জানাতে লাগল।

চিন্ময়ের জীবিতকালেই স্থির হয়ে যায় বর্তমান পূজারির অবর্তমানে বা মৃত্যু হলে বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান হবে মায়ের পূজার অধিকারী। এই নিয়ম মেনে তৃতীয় পুরুষে দায়িত্ব পেয়েছেন ডাঃ দেবজ্যোতি দাস। কলকাতা থেকে এম.ডি. করেছেন। সরকারী হস্‌পিটালে কাজ করেন। চিকিৎসক হিসাবে সুনামের দিক থেকে কৃষ্ণনগর হস্‌পিটালে আলাদা একটা জায়গা করে নিয়েছেন। অবসর সময়ে বিকাল সাড়ে চারটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত প্রাইভেট প্রাকটিশ করেন। অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সম্মানও ডালপালা মেলেছে বৈকি ! লোকে বলে মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া না থাকলে মুচির ঘরে কেউ কখনো এত বড় হতে পারে না। নিজের এবং সমগোত্রীয় সমাজের লোকেদের বিনা পারিশ্রমিকে সকালে দেখে দেন। সেই সঙ্গে সমাজ জীবনে ব্রাত্য মানুষগুলোর সুপ্ত আত্ম সম্মান জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

এ যুগের এ হেন নামকরা ডাক্তার কিন্তু মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় ছিলেন একনিষ্ঠ। ভোর থেকে ঠাকুরঘর ধোয়া-মোছা, ফুল তোলা, মাকে ফুলসাজে সাজিয়ে দেওয়া — সব কিছু আনন্দের সঙ্গে নিজ হাতে করতেন। আপন মনে গাইতেন শ্যামা সঙ্গীত। শুনে মনে হ'ত এ গানে কোন খাদ নেই।

তিন পুরুষের আন্তরিকতায় এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠল কারুকার্যময় বিশাল মন্দির। দেবজ্যোতির পরামর্শে মন্দিরের তোরণদ্বারে লেখা হ'ল ভারত আত্মার অমৃত বাণী — "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!"। গৈরিক পতাকার ঊর্ধ্বভাগে লেখা হল "জয় মা মঙ্গলচণ্ডী" এবং নিম্নভাগে শোভা পেতে লাগল কবির মহাবাণী, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। স্তোত্র মালায় চিত্রিত হ'ল মন্দিরের দেওয়াল। মাঝে মাঝে দু-এক জন সন্ন্যাসী রাতে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতেন। শ্রদ্ধা এবং সেবার আন্তরিকতা দেখে এই সব সন্ন্যাসীরা অবাক হয়ে যেতেন। এঁদের অবস্থানের

কারণে মন্দিরের গৌরব বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল।

লক্ষণীয় বিষয় এই মন্দিরে কোন উচ্চ বর্ণের মানুষ আসতেন না। তাঁরা এখানে এসে পুজো দিতে ঘৃণা বোধ করতেন। তাদের বক্তব্য – "মা যতই জাগ্রত হন, মুচির ছোঁয়া জল কি স্পর্শ করা যায়।" ফলে বারব্রত পালনের সময় তারা যান ব্রাহ্মণ পূজিত আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরে। অথচ তার পূজারি ব্রাহ্মণ হৃদয়নাথ ভট্টাচার্যের চারিত্রিক বদ্‌নামের কথা সবার জানা। তবুও জাতি গৌরবের বন্যায় ওখানে নাকি সব পাপ ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়। মায়ের পুজোর নামে মদ্যপানেও কোন দ্বিধা নেই হৃদয়নাথের।

দেবজ্যোতি ভাবেন ডাক্তারি করার সময় কেউ তো মুচি বলে দূরে সরে যান না। অথচ পুজোর পবিত্র জল নিতে এত আপত্তি কেন? শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সবাই তো সবদিক দিয়ে অনেকখানি উন্নত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে বঞ্চিত এবং অপমানিতেরা যদি কিছুটা আত্মসম্মান ফিরে পাবার চেষ্টা করেন তাহলে ক্ষতিটাই বা কোথায়? হিন্দুধর্ম থেকে বিভেদের কালিমা দূর করতে পারলে প্রতিষ্ঠিত হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সম্মান যার দ্বারা গোটা সমাজ উপকৃত হবে। প্রকৃত গুণের অধিকারী না হয়ে শুধুমাত্র জন্মসূত্রে কাউকে গৌরবের আসনে বসানোর নাম ধর্মান্ধতা।

প্রার্থিত ফল লাভ করে যারা মানসিক পুজো দিতে আসেন তাদের দেবজ্যোতি বলেন, "সব মা এক, মনের মধ্যে কিন্তু কিন্তু ভাব থাকলে আপনি পুজোটা এ মন্দিরে না দিয়ে মা আনন্দময়ীর ওখানেও দিয়ে দিতে পারেন।"

একদিন এক বৃদ্ধ বললেন, "আমি কোথাও যাব না, এখানেই পুজো দেব। আমি ব্রাহ্মণ কিন্তু আমার সততা এবং ভক্তি কোথায়? আমি আপনার হাতের জল নেব। ঐ পাথরের বুকে কি লেখা আছে এটা মুচির ঠাকুর, আর অন্যগুলো ব্রাহ্মণের ঠাকুর? তা যদি না থাকে তাহলে মিথ্যে মিথ্যে জাতের অহংকার দিয়ে ভগবানকে কলঙ্কিত করে কি লাভ?" সেই ব্রহ্মণকে মাতৃপূজার শান্তিজল দিয়ে দেবজ্যোতি ক্ষণিকের জন্য মানুষের মিলন সুখ অনুভব করেছিলেন।

নিঃস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহে হঠাৎ আলোড়ন তুললেন দেবজ্যোতি। ছাত্রজীবনের বান্ধবী ডাঃ অমৃতা চ্যাটার্জিকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে।

সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ এইবার দেবজ্যোতিকে নতুন কায়দায় আক্রমণ শুরু করলেন। মা আনন্দময়ীর পুরোহিত হৃদয়নাথ ভট্টাচার্য এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। এদের সবার লক্ষ্য ছিল একটাই – মুচি মেথর ডোম, দুলে এবং কাহারদের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল সেটা নষ্ট করে দেওয়া। "তোরা বলতিস্ দেবজ্যোতি মায়ের ছেলে, ও কখন কোন ভুল কাজ করে না। কিন্তু তোদের সব ধারণা ভুল। দেখলি তো বিয়ের সময় জাতে ওঠার জন্য কেমন বামুনের মেয়ে ঘরে তুলল। বলি তোদের জাতের ঘরে মেয়ের কি অভাব ছিল। আসলে তোরা জানিস্ না, ও তোদের ঘৃণা করে। তাই ও তোদের মেয়ে ঘরে নেয় নি। যেমনই হোক লেখাপড়া জানা, একটু বেশি বুদ্ধি তো ধরবেই।"

কাজ হ'ল এই প্রচারে। মুচি, ডোম, দুলে, কাহার এবং হাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবজ্যোতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্রভাবে দানা বেঁধে উঠল। পূর্বের শ্রদ্ধার মনোভাবের পরিবর্তে দেখা দিল বিদ্বেষ ও ঘৃণা।

হৃদয়নাথ ভট্টাচার্য এবার সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠলেন। বললেন, "তোরা মন্দিরটা ভেঙে ফেল। যত আপদের গোড়া ঐ মন্দির। যে মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই, সেটা মন্দিরই নয়।"

ধীরে ধীরে জনরোষ তীব্র হয়ে উঠল। ধ্বনি উঠল, "যে আমাদের ঘৃণা করে আমরা তাকে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজারি হিসাবে চাই না। আমরা গড়েছি ঐ মন্দির, আমরাই ভেঙে ফেলব।"

মন্দির চত্বরে একদিন সভা ডেকে দেবজ্যোতি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "আপনারা ভুল বুঝেছেন। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এ এক জঘন্য চক্রান্ত। অমৃতা জাত মানেন না বলেই আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। বিয়ের সঙ্গে জাতের বা মায়ের পূজার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা বিয়ে করেছি ভালোবেসে। ভালোবাসা জাতের বিচার করে না।"

রাণাঘাট হস্‌পিটাল থেকে প্রতিদিন ডিউটি সেরে চলে আসতেন ডাঃ অমৃতা চ্যাটার্জি। স্বামীকে সাহস দেবার চেষ্টা করতেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। বলতেন, "আমরা হারব না, জয় আমাদের হবেই।"

যে মুচি এবং কাহার সম্প্রদায় মায়ের নামে মদ বর্জন করেছিল আবার তাদের মধ্যে মদ চালু করিয়ে দিলেন চক্রান্তকারীরা। এ এক সর্বনাশা খেলা। মানুষকে রসাতলে পাঠাবার সব চেয়ে ভালো পথ হ'ল নেশা ধরিয়ে দেওয়া।

অবস্থা সামাল দেবার জন্য অমৃতার পরামর্শে শেষ চেষ্টায় নামলেন দেবজ্যোতি। সাহায্যের আবেদন জানালেন আপন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকদের কাছে। বোঝালেন কেন এই চক্রান্ত চলছে, এর গোপন উদ্দেশ্যটাই বা কী। বললেন, "যে সব ব্রাহ্মণ জুতোর দোকান খুলে বসেছেন তারা তো আমাদের বৃত্তি কেড়ে নিয়েছেন, তবু তাদের পুজোর অধিকার আছে। এ নিয়ে তো কেউ বিদ্রোহ করেন নি। কত ব্রাহ্মণ কন্যা মুসলমান যুবককে বিয়ে করে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছেন তার বেলায় কিন্তু কেউ একটি কথাও বলতে সাহস পান না। অথচ আমি বা আমার স্ত্রী ধর্মান্তরিত হই নি। তবুও আমাদের বিরুদ্ধে রাতদিন লোক খেপানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য আমাদের সকলকে বিভ্রান্ত করা। এর বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান, নচেৎ আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু আর থাকবে না।"

এত কিছু করার পরও দেখা গেল মন্দিরের দেওয়ালে পোষ্টার পড়েছে। "আমরা দেবজ্যোতিকে মন্দিরের পূজারি হিসাবে চাই না।"

অমৃতা পরিস্থিতি বুঝে দেবজ্যোতিকে বোঝালেন, "মায়ের পুজোর ভার দিনকয়েকের জন্য অন্য কাউকে দিয়ে চলো আমরা রাণাঘাটে চলে যাই। এখানে থেকে আমাদের কোন লাভ নেই। রাণাঘাটে চলে গেলে এসব সমস্যা পিছু ধাওয়া করবে না। সেই সঙ্গে জাত-পাত নিয়ে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেও কেউ সমর্থন জানাবে না। গোলমাল থামলে না হয় ফেরার কথা ভাবা যাবে।"

"না অমৃতা, আমি হারতে রাজি নই। আজকের এই সর্বনাশের ঢেউ শুধু আমাদের নয়, পিছিয়ে থাকা সকল মানুষকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এদের

জাগাতেই হবে, তবেই মাতৃপূজার মূল্য থাকবে।”

মাত্র তিনটে দিনও পার হ'ল না। মঙ্গলবার ভোর হতে না হতেই একদল নেশাগ্রস্ত উন্মত্ত মানুষ ঘিরে ফেলল মন্দির। প্রতিদিনকার মত দেবজ্যোতি মায়ের মন্দির ধোয়া মোছা করছিলেন। কয়েকজন নেশাখোর উন্মাদ দেবজ্যোতিকে জোর করে টেনে আনল বাইরে। “আমাদের কথা না মানলে কেমন শাস্তি পেতে হয় দ্যাখ্।” চলল লাথি, ঘুসি, কিল, চড়।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন দেবজ্যোতি। “আমি কোন অন্যায় কাজ করি নি, তবু তোমরা এমন অত্যাচার করছ কেন?”

এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এল যুবকের দল। দুর্বিনীত মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মহা হুঙ্কারে, “তোদের পেট চেলা করে হৃদয়নাথের দেওয়া মদ বের করে ছাড়ব। তোরা তো অন্ধ, কোন কালে ভাল হবার ইচ্ছে নেই। তোরা মদ খেয়ে মুখে গামছা চাপা দিয়ে জীবন সার্থক করতে শিখেছিস্।”

দৃশ্যপট বদলে গেল মুহূর্তে। উত্তেজিত মানুষগুলো অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

যুবকের দল বলল, “কই এবার একবার গায়ে হাত তুলে দ্যাখ। তোদের এবং তোদের নেতা হৃদয়নাথকেও আস্ত রাখব না। জয় মা মঙ্গল চণ্ডী। তুমিই আমাদের জাগনিয়া।”

রক্তাক্ত দেবজ্যোতিকে মন্দির চত্ত্বর থেকে ধরে দাঁড় করাল ওরা। কপালের অনেকখানি কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। দুচোখে জল। অপরাধী মানুষগুলোর দিকে ক্ষমা সুন্দর চোখে তাকালেন দেবজ্যোতি। কী যেন অপার আনন্দ ওঁর সারা মুখখানিকে নতুন আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে।

জীবন পারের গান

মৃত্যুর পর অর্পণ চট্টোপাধ্যায় এবং জাহানারা খাতুন ডেরা বাঁধল রূপনারায়ণ নদের তীরে কালিকাপুরের জঙ্গলে। কারণ জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর। নদের বুকে বালিয়াড়ি থেকে এই ব-দ্বীপের উৎপত্তি। মুক্ত জলরাশি ঢেউ তুলে নাচছে চারপাশে। তীরের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেছে এক খণ্ড ভূ-ভাগ। বালিয়াড়ির বুকে শোভা পাচ্ছে নিবিড় অরণ্য। এরই মাঝে আছে মহাকালীর মন্দির। কেউ মারা গেলে মন্দিরের উত্তর দিকের মহাশ্মশানে আনত দাহ করার জন্য। একেবারে দক্ষিণ দিকে বদরতলার কাছাকাছি বকুলবাগান ছিল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট। অর্পণ এবং জাহানারা একই গাছে আশ্রয় না নিয়ে পাশাপাশি পৃথক দুটি গাছ বেছে নিল। অর্পণ রইল একটা অশোক ফুলের গাছে, জাহানারা রইল আমগাছে। পরপারের নিয়ম অনুযায়ী দিনের বেলা সব ভূতই অনু পরমাণু হয়ে আলোয় বাতাসে মিশে যেত, আবার দিনান্তে আকাশে সাঁঝতারা ফুটলেই আপন আপন শরীর ফিরে পেত। নদের বালুচরে বসে বিগত জীবনের আনন্দ বেদনার ছবিগুলো আঁকত।

জীবিত অবস্থায় ওরা দুজনেই একসঙ্গে উচ্চ আদালতে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় মেতে উঠেছিল। ধীরে ধীরে ভালবাসা ডালপালা মেলল দুটি মনে। কিন্তু ধর্মীয় কারণে উভয় পরিবারের ঘোরতর বিরোধিতায় প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘর বাঁধতে পারে নি। আশা করেছিল মৃত্যুর পর

এসব বাধা থাকবে না। তখন নিশ্চয়ই সংসার পাতা সম্ভব হবে। কিন্তু এখন দেখছে এখানেও বাধা কম নয়। ভূত হয়েও সেই পূর্ব সংস্কার নিয়ে বিরাজ করছেন সকলে। অনুভূতিগুলোও সেই একই রকম। কিন্তু এখন তো আর বাড়ির বাধা নেই, অতএব এবার তারা স্বামী-স্ত্রী হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চাঁদনি রাত। প্রতিদিনকার মত বালিয়াড়ির নির্জনতায় বসে দুজনে রূপনারায়ণের অপূর্ব দৃশ্য বিস্ময়ভরা চোখে দেখছিল। পলে পলে নতুন দৃশ্য। এক সময় জাহানারা অর্পণের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, "এবার আমাদের ভালোবাসাকে সার্থক করার পালা, তাই না?"

উত্তর দিল অর্পণ "আমি ভালোবাসা দিয়ে তোমার জন্য স্বর্গ তৈরি করব। আমরা হব এ যুগের আদর্শ দম্পতি।"

এমন সময়ে সেখানে হাজির হোল হল্লা ভূত। হল্লাকে দেখে দুজনের আলোচনা থেমে গেল।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে বিশাল গোঁফ নাচিয়ে বলল "তোমরা মনে করেছ ভূতেদের ধর্ম আচার বিচার এ সব কিছুই নেই। কিন্তু জেনে রাখ আমাদের সমাজে মানব সমাজের মত সব কিছু আছে। তুমি হিন্দুধর্মের লোক, ও মুসলমানের মেয়ে, দুজনের বিয়ে কোনমতে সম্ভব নয়।"

"আমরা শুনব না তোমার কথা। মৃত্যুর পর সব বিভেদ লোপ পায়। যে প্রথা মানুষকে শিকল পরিয়ে রাখে সে প্রথা আমরা মানি না।"

তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল হল্লার বীভৎস মুখে। "আমার কথা মানতে চাও না তাহলে। শুনে রাখ আমার নাম হল্লা। কাউকে সায়েস্তা করার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। যখন আমি মানুষ ছিলাম তখন আমার প্রিয় রাজনৈতিক দলকে জেতাতে নর হত্যা, বুথ দখল, ঘরবাড়ি জ্বালানো, পুকুরে বিষ দেওয়া, ধানের গোলায় আগুন লাগানো, বোমা মেরে সবাইকে স্পিকটি নট্ করে দেওয়া — এ সব করেছি। নেতারা আমার জন্যই জিতত। পিঠ চাপড়ে বলত — "সাবাস্ হল্লা, যুগ যুগ জিও। ধর্ষণতন্ত্রের পতাকা ওড়ানোর জন্য তোমার অবদান আমরা চিরকাল মনে রাখব।" জেনে রাখ, এবার তোমাদেরও খতম করে ছাড়ব।"

হল্লার দিকে তাকাল অর্পণ, "কী ভয়ংকর আকৃতি হয়েছে তোমার। তুমি তো সেই সুজয় ঘোষ না? তোমার তো লজ্জা ঘৃণা এ সব কিছুই নেই। একবার আয়নায় নিজেকে দ্যাখো। সেই সঙ্গে মনে রেখো এটা প্রেতলোক।"

জাহানারা বলল, "তুমি একদিন নিজের বোমায় নিজেই ঘায়েল হয়ে মারা গিয়েছিলে। পার্টির হয়ে হল্লাবাজি করতে বলে ভূতেরা তোমার নাম দিয়েছে হল্লা। তোমাকে আমরা চিনি, এখন তুমি আসতে পার। এখানে যম রাজত্ব করেন, তুমি না।"

বদরতলার কাছাকাছি থাকত মুসলিম ভূতের দল। শিমূল গাছের বদখত মোল্লা ছিল ওদের নেতা। জীবিত অবস্থায় আসল নাম ইব্রাহিম। নিকা করে দু'তিন বছর একসঙ্গে থেকে তালাক দিয়ে মজা লুটত। জীবনে মোট আটজনকে তালাক দিয়েছিল। লোকের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা না করলে ঘুম হোত না। বেয়াদব কাজের জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ইব্রাহিমকে অসামাজিক মানুষ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই ইব্রাহিম এখন মামদোদের মহান নেতা।

হল্লার কথা শুনে বদরতলার তালসারি থেকে ছুটে এল বদখত। অর্পণকে বলল -- "ভূত সমাজ এ বিয়ে কখনই মানবে না। হিন্দু এবং মুসলিম ভূতেদের মধ্যে দাঙ্গা লেগে যাবে।"

জাহানারা বললো, "আমরা কি তোমাকে দাঙ্গা বাধাবার জন্যে ডেকেছি?"

টলতে টলতে হাজির হোল বোতল ভূত। দু-বগলে দুটি চোলাই মালের বোতল। এই বোতলভূত জীবিত অবস্থায় ছিলেন মন্ত্রী। মন্ত্রীত্বের জোরে পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি টাকার মালিক বনে গিয়েছিলেন। পুকুর চুরি করার অপরাধে চিত্রগুপ্ত ওনাকে বোতল ভূত করে দিয়েছেন। ইঁদুরের মাংস আর মদ খেয়েই দিন কাটে। সকলের মতামত উপেক্ষা করে বোতল ভূত বলল, "মান্ধাতা আমলের যুক্তিগুলো কেন আনছ বাবা। এটা নতুন যুগ। আগে বিয়েটা হতে দাও, তারপর অন্য কথা। আমি কথা দিচ্ছি তোমরা প্রত্যেকে দু'বোতল করে মাল পাবে।"

হল্লা এবং বদখত মোল্লার মিলিত হুঙ্কারে উত্তেজিত হ'ল অর্পণ।

বলল, "তোদের কি করার আছে করে নিস্। আমরাও এ্যাডভোকেট্। আদালতের রায় নিয়ে তোদের হাড়গুঁড়ো কলে ঢুকিয়ে ষ্টেরামিল বানিয়ে দেব। তোর সাকরেদদেরও ঐ অবস্থা করব। তারপর সারের দোকানে কেজি দরে বেচব।"

কথা শুনে সবার চোখ ছানাবড়া। ভয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সবাই পালাল।

শেওড়া বনের শাঁকচুন্নিরা নাচতে নাচতে বলল, "আগামী বুধবার লগন ভাল। ঐ দিনেই বিয়েটা করে ফেলো। আমরা নাচব, গাব, পেটপুরে অনেককিছু খাব।"

অতি উৎসাহে ওরা ধরে আনল লাড্ডু মহারাজকে। পূর্ব নাম উৎপল মিশ্র। বৌয়ের জ্বালায় ফলিডল খেয়ে মরেছিল। কিন্তু বৌ বিধবা হয় নি। আবার নতুন বিয়ে করে মর্তলোকে দিব্যি আছে। সেই দুঃখে মহারাজ সবার কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। এখন দেখছি মরাটাই বোকামির কাজ হয়ে গেছে।" ভূত সমাজ খুবই সম্মান জানাত লাড্ডু মহারাজকে।

লাড্ডু মহারাজ নমস্কার জানালেন অর্পণ এবং জাহানারাকে। "বাবু, আপনারা রাজি থাকলে আপনাদের বিয়েতে আমি পুরোহিত হ'ব। কিন্তু একটা শর্ত আছে, আমার বৌ মরে গেলে ওকে ঐ হাড়গুঁড়ো কলে ঢুকিয়ে ষ্টেরামিল বানাতে হবে।"

"ও একবার ভূত হয়ে এখানে আসুক না। এলেই আবার আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।" রাজি আছেন তো?" প্রশ্নটা করেই ফিক্ করে হেসে ফেলল জাহানারা।

খুশিতে ডগমগ হয়ে লাড্ডু মহারাজ গান গাইতে গাইতে চলে গেলেন তলতা বাঁশের জঙ্গলে।

আজ যখন বালিয়াড়ির উপর বসে দুজনে গল্প জমিয়েছে তখনই হাজির হলেন পাইলট মহারাজ। ইনি মানবদেহ ধারণ কালে অপরকে ল্যাং মেরে দেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। দলীয় প্রভাবে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করে

সন্ত্রাস চালিয়ে আঁধারতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। মস্তান দিয়ে কাজ হাসিল করাই ছিল ওনার ধর্ম। দেশের সার্বিক উন্নতি স্তব্ধ করে উনি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। চিত্রগুপ্ত ওনাকে বিছুটি বনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। উনি মাঝে মাঝেই কাঁদতে কাঁদতে মাথার চুল ছিঁড়েন। আক্ষেপ করে বলেন, "মরতে হবে জানলে এত খুন করাতাম না।" কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। এখানে এই প্রেতলোকে এসেও পূর্বের স্বভাবটি কিন্তু পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। নায়কের মত অর্পণ এবং জাহানারাকে বললেন, "আপনারা আমার দলের পক্ষে কাজ করলে আমাদের দল আপনাদের সমর্থন জানাবে।"

"আমরা পার্টির ঝামেলায় নেই। আমাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আপনি আসতে পারেন।" ভদ্রতা রেখেই কথাগুলো বলল অর্পণ।

এবার মেজাজি ভঙ্গিতে বললেন পাইলট মহারাজ, "বেশ, কালকেই বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল।"

"হাঁ-হাঁ, আবার মর্তে ফিরে গিয়ে ওসব পার্টিবাজি দেখাবেন। এতই যদি ভালো কাজ করেছেন তবে রোজ রাতে মাথার চুল ছেঁড়েন কেন?"

লাড্ডু মহারাজের কথামত — বিয়ের ব্যবস্থা হল পার বাকসির চরে। কেননা জায়গাটা বিয়ের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। আর মাত্র তিনদিন বাকি। সমস্ত দিক থেকে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। পার বাকসি নতুন সাজে সেজে উঠল। দেখে সবাই তারিফ করতে লাগল — হ্যাঁ, জায়গা বটে। হঠাৎ খবর এলো জাহানারাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায়? সেই আমগাছ এখন শূন্য। কি এমন ঘটল!

শাকচুন্নিরা এসে বলল, "ও আমাদের বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল। পাইলট মহারাজের দল ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।"

"তাহলে উপায় কি?" চিন্তিত অর্পণ ওদের প্রশ্ন করল।

"ভাবতে হবে না আপনাকে। ওদের দশগুণ শক্তি নিয়ে আমরা ওদের আক্রমণ করব।"

মর্তে থাকাকালীন পাইলট, হল্লা এবং বদখতের বিরুদ্ধে বিশাল ক্ষোভ

ছিল। সেই ক্ষোভ এখন বিদ্রোহের রূপ নিল। সব ভূত মিলিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলল। কারও হাতে চিতার জলন্ত কাঠ, কারও হাতে খোচন বাড়ি। ওরা পাইলট মহারাজ এবং হল্লাকে ধরে বোতল বন্দি করে জাহানারাকে মুক্ত করল। ধুরন্ধর বদখত পালিয়ে বাঁচল কোনমতে।

এবার শুরু হ'ল ওদের দুজনের বিচার। গণ আদালতের রায়ে ওদের বিষ্টাভরা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোল।

এত কাণ্ডের পরও কিন্তু ষড়যন্ত্র থামল না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাঁধাল বদখত। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল। এমনই মারামারি শুরু হোল যেন কালবৈশাখির ঝড় উঠেছে। শুকনো পাতা উড়তে লাগল, বন জঙ্গল সব দুলতে লাগল। চতুর্দিকে ফটাফট্ আওয়াজ, নাকি সুরের হুঙ্কার আর চিৎকারে সারা শ্মশান কাঁপতে লাগল।

বাচ্চা ভূতেরা খেলা করছিল। নাচতে নাচতে বলল, "ধেড়েরা সব অন্ধ, বদ্ধ পাগল, ধর্মের আসল রূপ ওরা জানে না, ওদের নতুন করে মরতে দাও।"

ইতিমধ্যে হাত পা না ভেঙে সবাই পালিয়েছিল কিন্তু বদখতকে এমনই দুরমুশ কসা কসেছিল যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ধর্মের নামে প্রচলিত প্রথার কোন দাম নেই। প্রথাগুলো আমাদের মাঝে কৃত্রিম বিভেদের জন্ম দিয়েছে। আসল ধর্ম হোল মানবতা, দেরিতে হলেও এ উপলব্ধি আমার হয়েছে। ওরা বিয়ে করুক, আর আমাদের আপত্তি নেই। শর্ত একটাই, আমাকে পেষাই করা চলবে না।"

যুবক ভূতেরা বলল, "বিয়েটা মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার। এর মাঝে ধর্মকে টেনে আনা ঠিক নয়। সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করতে এরকম বিয়ের প্রয়োজন আছে।"

কলেজ পড়ুয়া যুবক যুবতী ভূতেরা যারা "লিভ টু গেদার" নীতিতে বিশ্বাসী ছিল তারা বলল, "বিয়ে ব্যাপারটাই সেকেলে। ওতে পরাধীনতার গন্ধ আছে। তার চেয়ে খাও, দাও, ফূর্তি চালাও।"

অর্পণ এবং জাহানারা এখন অনেকখানি তৃপ্ত। রক্তরাঙা কৃষ্ণ চূড়ার তলায় বসে ওরা দুজনে আলোচনা করছিল মানব সমাজের বোকামির কথা। মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্মের নামে মানুষ বিভেদের কত প্রাচীরই না তুলেছে। অনুশাসনের পাথর চাপা পড়ে কত জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। একবার দেহ ফিরে পেলে ওরা এই কথাটা মানব সমাজকে জানিয়ে আসতে পারত।

আলাপ চারিতার মাঝে হাজির হল রকেট। জীবিত অবস্থায় গণ সঙ্গীত লিখত শরণ রায়। অভিনয়ও করত। প্রেম করতে গিয়ে পেটে ছুরি চালাল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক। ফলে আস্তানা হল পরলোকে। সেই শরণের বর্তমান নাম রকেট। এখন সারারাত বাঁশবনে বসে গণ সংগীত গায়। রকেট রসিকতা করে অর্পণকে বলল, "দাদা, বিয়ের স্বপ্ন দেখুন, সেটা ভাল। কিন্তু মানুষ যে হারে গাছ কাটছে দুদিন বাদে বৌ নিয়ে থাকবেন কোথায়? দুজনকে দুটো আমচারা দিলাম, যত্ন করে বসাবেন।"

জাহানারা বলল, "রকেট বাবু, ভূতদের কল্যাণের জন্য আর কি ভাবছেন।"

"মানুষেরা আমাদের কোন গুরুত্বই দেয় না, ব্যঙ্গ করে। বলে ভূত বলে কিছু নেই। প্রতিকারের জন্য আমি ভূতেদের একটা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছি। ওয়েল ট্রেনড ভূতেরা মর্তলোকে গিয়ে দেশের নেতা এবং মন্ত্রীদের মাথায় চেপে বসবে। তাঁরা তখন দেশের মানুষদের নানাভাবে যমের বাড়ি পাঠাবেন। আমরা ভূতেরা তখন সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে দেশটা শাসন করব।"

"সত্যি, দারুণ তোমার বুদ্ধি; প্রশংসা না করে পারা যায় না।" জাহানারা রকেটবাবুকে ধন্যবাদ দিল। সেই সঙ্গে জানাল, "আগামী বৃহস্পতিবার আমাদের বিয়ে। তোমাকে এবং তোমার দলবলকে প্রীতিভোজে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালাম।"

গ্রেট ইষ্টার্নে কুক্ ছিলেন রঙ্গনাথ তালুকদার, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল থেকে শুরু করে বহু বিদেশি মান্যগণ্য অতিথির ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ভূত সমাজে কুকড়ু নামেই খ্যাতিটা ছিল বেশি। অর্পণ এবং জাহানারা প্রীতিভোজের আয়োজনের সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিল কুকড়ু এবং তার দলবলের উপর।

শাঁকচুন্নিদের উপর ভার দেওয়া হল নৃত্যগীত পরিচালনার। বরকর্তা হলেন বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি, কনে পক্ষের কর্তা হলেন বাহাদুর খাঁ। জীবিত অবস্থায় ইনি ছিলেন ছাব্বিশ সন্তানের পিতা। বাহাদুর নামটি নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। সানাই বাজানোর ভারটা উনি চাপিয়ে দিলেন মামদোদের উপর।

পূর্ণিমা রাত। লাড্ডু মহারাজ পুরোহিত হিসাবে বিয়ে দেওয়ালেন অর্পণ এবং জাহানারার। নোয়া শাঁখা সিঁদুরে সেজে উঠল জাহানারা। অর্পণ সবার সামনে বৌকে আদর করে বললেন, "আজ থেকে তোমাকে আমি রানি বলে ডাকব।"

উভয় সম্প্রদায়ের সকল ভূত নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সারা রাত ধরে চলল নাচ, গান, খানাপিনা। মর্তের লোক জানতেই পারল না মহাশ্মশানের মাঝে ভূতেরা কেমন করে নতুন যুগকে স্বাগত জানাল।

হৃদপিণ্ড

দেশের সম্পত্তিগত বিরোধ মেটাতে পূজার ছুটিটাকে বেছে নিয়েছিল অনিমেষ। সেই সঙ্গে দীর্ঘ দশবছর পরে আবার নতুন করে জন্মভূমিকে দেখার ইচ্ছা। ঠিক যেন এক ঢিলে দুটি পাখি মারা। এবার কিন্তু আর একা একা নয়। সঙ্গে আছে পুষ্পিতা। শহরের আবহাওয়ায় কেটে গেছে বিগত জীবন। গ্রাম বাংলার ছবি দেখেছে রূপালি পর্দায়। কিন্তু গাঁয়ের বুকে পা রেখে শিউলি শালুকের ছড়িয়ে পড়া হাসির সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। এই বারই প্রথম দেখবে। দেখে যাবে শ্বশুরের ভিটে। সুতরাং এমন যুগ্মভাবে আসার পিছনে পুষ্পিতার আগ্রহ কোন অংশে কম ছিল না।

পদ্মদিঘির নির্জন তীর ঘিরে সুদীর্ঘ পথের দুধারে সবুজ বনশ্রী। ঘন সবুজের আড়াল থেকে পাখির ডাক মনে আনে আনন্দ জাগানো শিহরণ। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের উপর স্বচ্ছ জলরাশি সমুদ্রতটের মাধুরী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। গ্রাম প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যকে দু'হাত বাড়িয়ে ধরার ইচ্ছায় পুষ্পিতা যেন অন্য এক রমণী। অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে বারে বারে উত্যক্ত করে অনিমেষকে। অনিমেষ যতদূর সম্ভব স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রেখে নিজস্ব নির্জনে হারিয়ে যেতে চায়। বর্তমানের ছোঁয়ায় দুরন্ত ছেলেবেলা আবার যেন নেচে বেড়ায় শিরায় শিরায়। মনে হয় এখনই জলে নেমে ফোটা শাপলা শালুকের বুক ছুঁয়ে সাঁতার কাটে।

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ এনে দেয় পুষ্পিতা। হাত বাড়িয়ে আঙুল তুলে দেখায়—"দূরে কালো কালো ওগুলো কি গো?" চিন্তায় ডুবে গিয়ে দূরটাকে

ঠিক অত নিখুঁত ভাবে দেখেনি অনিমেষ। স্ত্রীর কথায় তাকাল সেদিকে। অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অনুমানের উপর বলল, "মনে হয় কিছু মেয়ে শালুকের মূল তুলছে অথবা শামুক কুড়াচ্ছে।"

স্বামীর কথায় পুষ্পিতা যেন আকাশ থেকে পড়ে, "অত দূরে মেয়েরা যেতে পারে! বাপ্‌রে বাপ্‌!" বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটতে বেশ কিছু সময় লাগে। তারপর আবার প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, তুমি যে বললে শালুকের মূল, সেটা আবার কি?"

ঠিক ঠিক উপমা খুঁজে পায় না অনিমেষ। তবু যতদূর সম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করে। "ডাঙায় ওল হতে দেখেছ, উপরে গাছ মাটির নীচে ফল। শালুকের মূলগুলোও ঠিক জলের তলায় পাঁকের ভিতর ওল। তবে আকারে ছোট ছোট গুলির মত।"

"অত কষ্ট করে তুলে কি হবে?"

"কী হবে আবার, সিদ্ধ করে খাবে। বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচবে।"

"তুমি কখনো খেয়েছ?" সকৌতুকে প্রশ্ন করে পুষ্পিতা।

বিজয়ীর হাসিতে ভরে উঠে অনিমেষের মুখ। "খাই নি মানে! দারুণ ভাল বাসতাম। ছেলেবেলায় বাড়ির সকলকে লুকিয়ে কতদিন যে ডুবে ডুবে ঐ সব তুলতাম। কম কষ্ট হ'ত না।" কথাগুলো বেশ মন দিয়ে শোনে পুষ্পিতা, আর আগ্রহের আতিশয্যে অনিমেষ তার বলা থামায় না। "সব শালুকের মূল তো আবার খাবার উপযুক্ত নয়। বেছে বেছে নতুন গাছের মূল তুলতে হবে। তারপর সেগুলো সিদ্ধ করলে খাওয়ার উপযুক্ত হবে।"

"কি রকম খেতে?"

"খুব চমৎকার।"

"কলকাতায় বিক্রি হয় না?"

"হয় বৈকি, খুব কম।"

"তবে আন না কেন। আমিও খাব।"

পুষ্পিতার আগ্রহ খুবই খুশি করে অনিমেষকে। "ঠিক আছে আমি

তোমাকে আসল জিনিস খাওয়াব। বাসিটাসি নয়, একেবারে টাটকা।" ক্ষণিক কী ভাবে অনিমেষ। তারপরেই বলে, "শুনবে ছেলেবেলার কথা?"

"বললে শুনব না কেন।" পুষ্পিতা আগ্রহ প্রকাশ করে।

"ঠিক দুপুরে বাড়ির সবাই যখন বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত আমরা কয়েক জন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তাম। শালুকের মূল তোলা শেষ হলে চলত ফুল তোলার পালা।"

"কী করতে সেই ফুলগুলো নিয়ে?"

"উদ্দেশ্য না থাকলে কেউ কি এমনি তোলে। তার থেকে তৈরি করতাম অপূর্ব সব মালা। হাতে গলায় মাথায় কোমরে শালুক ডাঁটার সাজ। উধম গায়ে আমি তখন মহাদেব। সেদিন তুমি কিন্তু আমার জন্য বেলপাতা আন নি।"

এই রসিকতার জন্য অনিমেষকে ধাক্কা মেরে দুষ্ট হাসি হেসে কাছ থেকে পালায়। তারপর ফিরে এসে দেখায়, "ঐ দ্যাখো ওরা ফিরছে।"

গোটা দলটাই উঠে এসেছে ডাঙায়। বেলা শেষের পড়ন্ত রোদ্দুর ওদের শরীরে। গলায় শালুক ডাঁটার মালা। ফুলগুলো সব লকেটের মত ঝুলছে। কালো চেহারার উপর আট সাট কাপড়ে ঠিক যেন আদিবাসী রমণীর দল। সারাটি মুখ জুড়ে বিশ্ববিজয়িণীর হাসি।

প্রবল আকর্ষণে অনিমেষ এবং পুষ্পিতা পায়ে পায়ে কাছে আসে। উঁকি মেরে হাঁড়িগুলো দেখে। প্রত্যেকের হাঁড়িতে শালুকের মূল আর শামুক, সেই সঙ্গে বৃত্তাকারে জড়ানো আছে নাল সমেত শালুক গুচ্ছ।

"জল ভেঙে অত দূরে যেতে ভয় করে না তোমাদের?" দলের সব চেয়ে বড় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে পুষ্পিতা।

"কেন ভয় করবে দিদিমণি, ভয় করলে খাব কী।" মুখে সেই অদ্ভুত সুন্দর হাসি।

"এতে কত পাবে?"

"পাঁচ ছ' টাকার মত। এতে চলে না কিন্তু এ টুকুই বা কোথায় পাব

বলুন।"

উত্তর শুনে জিভে যেন কাঁটা ফুটে যায় পুষ্পিতার। ভাবে এই অবাক করা মেয়েগুলো এমন ভীষণ দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে আছে কেমন করে! এই দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে ওরা হাসে কি ভাবে! জীবনে এ ভাবের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কোনদিন সে হয় নি।

এই ফাঁকে জীবনের পাতা উলটাতে উলটাতে অনিমেষ আবার ফিরে গিয়েছিল কৈশোরে। পানকৌড়ির মত সে ডুবছে আর উঠছে। জলের গভীরতা ভেঙে তুলে আনা শালুকের মূল কোমরে বাঁধা গামছার থলির ভিতর রাখছে। মাথার উপরে আকাশে কখনো ঘন মেঘ, কখনো চিকন আলো। বুনো হাঁসের দল উঠছে নামছে। সেদিনের স্মৃতি বড় মধুর।

আজ কিন্তু অনিমেষ ঠিক আগের মত সহজ হতে পারছে না। কোথায় যেন দুস্তর বাধা। ইচ্ছে হয় একগোছা শালুক নিয়ে আবার তেমনি করে সাজে। কিন্তু এমন ছেলেমানুষী কোনক্রমেই বরদাস্ত করবে না পুষ্পিতা। এত ভাবার পরেও কিন্তু এক সময় মেয়েগুলোর কাছে শালুক ফুল চেয়ে বসল অনিমেষ। "তোমরা দুটো ফুল দেবে?"

প্রশ্ন শুনে দশ বারো বছরের যে পাঁচ ছটি মেয়ে ছিল তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসতে লাগল। শেষে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে গোটা কয়েক ফুল নিয়ে এগিয়ে এল একজন যুবতি। "নিন না বাবু, দুটো ফুল আর দেব না!"

পরণে ব্লাউজ নেই, কোন অলঙ্কার নেই, এক কাপড়ে কুড়ি একুশ বছরের যুবতির এমন বেশ কখনো দেখেনি পুষ্পিতা। যত অনাদরেই থাক এ মেয়েগুলোর আলাদা একটা রূপ আছে বটে।

মেয়েটির সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে বটে কিন্তু মনে মনে ভয় পায় পুষ্পিতা। এই অসভ্য মেয়েগুলোর সঙ্গে বেশি মেশার কোন প্রয়োজন নেই। বিরক্ত হয়ে স্বামীকে তাগাদা দেয়, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আর দেরি করা ঠিক নয়। এবার বাড়ি ফিরে চল।"

যাবার আগে ফুলের দাম হিসাবে কিছু দিতে গেল অনিমেষ। কিন্তু

মেয়েটি নিতে রাজি হ'ল না।

বুদ্ধি করে গোটা গোছাটাই নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল—আমি সবগুলো নিলাম। আমার দরকার।" একখানা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে দিতে গেল।

এবার আর দাম নিতে আপত্তি করলো না মেয়েটি। কিন্তু বলল, "অত দাম নয়, আপনি দু'টাকা দিন, আমরা এই দামে বেচি।"

"তা হোক, তুমি নাও। আমার কাছে দু'টাকা নেই।" "না, বাবু, বেশি নেব কেন। আজ না থাকে পরে একদিন দিয়ে দেবেন। আমরা রোজ এখানে আসি।"

একমাথা রুক্ষ চুল, তেলের ছিটেফোঁটা নেই। কপালে টিপ নেই, এমন কি সিঁথির সিঁদুরের রেখাও অদৃশ্য প্রায়। তবুও আশ্চর্য সরলতায় এ এক অপূর্ব পল্লি প্রতিমা। ভাল না বেসে পারা যায় না। এরা মুহূর্তে সবাইকে আপন করে নেয়।

"এই যে বাকি থাকল, আমরা যদি আর না আসি।"

"তাতে কি হয়েছে। আমাদের আরও গরিব হবার ভয় নেই। ঠিক চলে যাবে।"

"বেশ কাল আবার আসব। তোমায় কিন্তু আমাদের জন্য সিদ্ধ শালুক মূল এনে দিতে হবে।"

একগাল হাসিতে ভরে ওঠে যুবতির মুখ। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। সেই সঙ্গে সকৌতুক প্রশ্ন, "দিদিমণি খাবেন বুঝি? ঠিক নিয়ে আসব দেখবেন।" কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মূল তুলতে তুলতে যদি অনেক দূরে চলে যাই কমলা বলে ডাকবেন।"

চলে গেল ওরা। অনিমেষ পুষ্পিতাকে বলল, দেখলে তো, এরা আজও কত সৎ, কত সুন্দর। এরা খেটে খায়, কারও কাছে হাত পাততে শেখে নি। নগ্ন দারিদ্র্যের মাঝে এরা আজও হারিয়ে যায় নি। এদের না দেখলে দেশটাকে প্রকৃত চেনা যায় না।

পরের দিন পুষ্পিতাকে সঙ্গে নিয়ে আবার এসেছিল অনিমেষ। মনোরম পল্লি প্রকৃতি অন্য একটি পৃষ্ঠা মেলে ধরেছিল। নির্মেঘ আকাশের মুক্ত আলোয় জলাভূমির এ যেন অন্য এক রূপ। পুষ্পিতা যখন দূর দিগন্তে রামধনু দেখায় ব্যস্ত সেই সময়ে অনিমেষ কমলার সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। মুখে হাসি ফুটে উঠল অনিমেষের। ডাকতে হয় নি, ওকে দেখতে পেয়েই হাঁড়ি ভাসিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। পুষ্পিতাকে পিছনে ফেলে বেশ কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে চলে এসেছিল অনিমেষ। পাছে কিছু মনে করে এই ভেবে একবার পিছন ফিরে তাকাল। দেখল রোদ্দুরের আক্রমণ এড়াতে বসে আছে গাছের তলায়। থাক না ওখানে, দূরত্ব তো সামান্য।

"ঠিক এসেছেন আপনি। আমরা ভেবেছিলাম আর নাও আসতে পারেন।"

"ও রকম ভাবার কোন যুক্তিই নেই। আমি কোন কথা বললে তা রাখার চেষ্টা করি।"

"আপনারা যে কাজের মানুষ। কখন কি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন সে কি আর বলা যায়। তাছাড়া এত তুচ্ছ ব্যাপারের উপর ক'জনেই বা গুরুত্ব দেয়।" কথাগুলো বলতে বলতে জল থেকে উঠে এল কমলা। মুখে সেই অপরাজেয় হাসি। অভ্যস্ত দ্রুততার সঙ্গে হাঁড়ির ভিতর থেকে একটা পলিথিনের প্যাকেট বের করে এনে তুলে দিল হাতে। "এই নিন যা চেয়েছিলেন। খেতে খুব ভাল লাগবে দেখবেন।"

"জান, ছোটবেলায় আমি নিজেই এসব কত তুলেছি।"

"ধেৎ।" পূর্ণ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল কমলা।

"না, না, বিশ্বাস কর, আমি সত্যি কথাই বলছি। আমি যে এই গাঁয়েতেই মানুষ। এখন অবশ্য কলকাতায় থাকি।" কথা বলতে বলতে একটা মূল নিয়ে অপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করে।

মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম এবং শহরের পার্থক্যটুকু কমে যায়। আন্তরিক পরিবেশে আরম্ভ হয় নানান কথা। অতি সহজ ভাবেই এক মনোরম পৃথিবী

পাপড়ি মেলে। সবার মাঝে এমন করে হৃদয়টা উন্মুক্ত করে দিয়েই তো জীবনটা সাজাতে চেয়েছিল অনিমেষ। বাঁধাধরা ছকে প্রাণের এবং মনের এ বন্দিশালা সে চায় নি। কাকে বলবে এ সব কথা, বলার অবকাশই বা কোথায়। ক্ষণিকের অতিথিনীর কাছে বলতে গিয়েও নীরব হয়ে যায়। কিন্তু বিষণ্ণতা চাপা থাকে না। গোপন গভীরের দীর্ঘশ্বাস হাহাকার হয়ে আছড়ে পড়ে।

"বাবু, মনে হয় আপনি বড় দুখী। দিদিমণি আপনাকে বুঝে উঠতে পারেন নি।"

সচকিত হয়ে ওঠে অনিমেষ; "কি করে বুঝলে?"

"হাঁ বাবু, আমরা সব বুঝতে পারি।" স্বরটা কেঁপে উঠল কমলার।

কথা আর বেশি দূর এগোয় না। দু'জনার আলাপন অসহ্য মনে করে কাছে আসে পুষ্পিতা। সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসিতে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলে, "আপনি তো খেলেন, এবার দিদিমণিকে দিন।"

না করে না পুষ্পিতা। আগ্রহের সঙ্গে একটা নিয়ে ছাড়ায় কিন্তু মুখে পুরেই ফেলে দেয়। "ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এসব জিনিষ আবার মানুষে খায়।" তাড়াতাড়ি জলের ধারে গিয়ে বার বার মুখ ধোয়। "বাব্বা, গলার ভিতর পর্যন্ত কিরকির করছে।"

খিল্ খিলিয়ে হেসে উঠে থেমে যায় কমলা, ঠিক দমকা বাতাসে প্রদীপ নেভার মত। "কলকাতার দিদিমণিরা এসব খাবেন কেন বাবু, এ তো গরিবের খাবার।"

কমলার আহত মনকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে অনিমেষ। "তা হোক, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। আগামীকাল বিকালবেলা যাবার পথে আর একটু কষ্ট করলে আমি কিছু কলকাতা নিয়ে যাব। রাজি হলে ঐ বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িও।"

অনিমেষের ব্যবহারে কমলার বিষণ্ণ দুটি চোখ হতে অপমানের সব দাগ ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়। হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায়। "দেখে নেবেন, আমি ঠিক অপেক্ষা করব।"

"তুমি সব কিছুতেই ভীষণ বাড়াবাড়ি কর। কী হবে ঐ সব ছাই পাঁশ নিয়ে গিয়ে। যত সব রাষ্টিক আউটলুক্।" তীব্র শ্লেষের সঙ্গে কথাগুলো শুনিয়ে দেয় পুষ্পিতা।

ভয় পেয়ে যায় কমলা। সারা মুখখানা থম্ থম্ করে। অনিমেষের অসহায় দুটি চোখের পানে তাকিয়ে মাথা নীচু করে জলে নেমে যায়। একবারও পিছন ফিরে তাকায় না।

পুষ্পিতার অস্তিত্বটুকু ভুলে অনিমেষ অপলক তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

"কী গো, ঐ অসভ্য জংলি মেয়েটার প্রেমে পড়লে নাকি?"

স্ত্রীর আক্রমণের কোন উত্তর দেয় না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শামুকের মত গুটিয়ে নেয়। চারপাশ থেকে বোবা কান্নারা যেন তাকে ঘিরে ধরে। সভ্যতা কি এই! মানুষের প্রতি সামান্য সহানুভূতির প্রকাশও কী অপরাধ? ধীরে ধীরে আপন চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে যায়। এক সময় মনে পড়ে যায় পার্কের কোণে নিত্য বসে থাকা সেই বৃদ্ধের গল্প। আজও সে গল্প ভুলতে পারে নি, ভোলা যায় না। একজন ডাক্তার শহরের সভ্য শিক্ষিত এবং ধনগর্বী এক মৃত ব্যক্তির পোষ্টমর্টম করতে গিয়ে হৃদপিণ্ডটা খুঁজে পায় নি। তিনি বলেছিলেন আজকের যুগে বাঁচার জন্য ওটার আর প্রয়োজন নেই বলেই বুঝি হারিয়ে গেছে। মানুষের লেজের মতই ওটা এখন অপ্রয়োজনীয়। এ যুগের বুকের থেকে ওকে হয়ত আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

"বাড়ি চল, আর দেরি করা উচিত নয়।" স্ত্রীকে ডাক দেয় অনিমেষ।

"কী ব্যাপার, রাগ করলে বুঝি? এসেই ফেরার জন্য ব্যস্ত। আমাকে সঙ্গে এনে ভুল করেছ বল। অভিমান অভিযোগ হয়ে ধরা দেয় পুষ্পিতার কণ্ঠে।

"না-না, তা নয়, আরও দেরি করলে আগামীকালের ঝক্কিটা সামলাবে কে?"

শুনে আশ্বস্ত হয় পুষ্পিতা।

ফেরার সময় খুব বেশি কথা বলে নি অনিমেষ। সারাক্ষণ ভেবেছে শুধু ওদের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পর দিকে দিকে কত না পরিবর্তন। কিন্তু প্রকৃত গরিব যারা তারা কেমন নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে। আপন হয়ে এদের পাশে দাঁড়াবার মত কেউ আর এদেশে নেই। অথচ মানবতার দুর্লভ গুণগুলি এদের জীবনে আজও অম্লান।

গত সন্ধ্যা এবং আজকের সকালটা কেটেছে অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে শেষবারের মত কথাবার্তা সারতে দুপুর ছুঁয়ে গেল। খাবার সময়টুকুও যেন চুরি হয়ে গেছে। তার উপর জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে অস্থির। কমলার কথা একটি বারের জন্যও মনে পড়েনি।

চারটে বিশের ট্রেন। রিক্‌শায় ওঠার আগে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল অনিমেষ। আর মাত্র সাঁইত্রিশ মিনিট। বাড়ি থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে ঐ সময়টুকুর মধ্যে। খুবই দ্রুত গতিতে চলছিল রিক্‌শা। কলকাতার ব্যস্ত জীবনধারা আবার উঁকি দিতে শুরু করল এখান থেকেই। মমতা জড়ান নিসর্গ প্রকৃতির দিকে এক আধবার উদাস চোখে তাকান ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে কমলা রিক্‌শার সামনে এসে দাঁড়াল। "কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর আপনি চলে যাচ্ছেন। কালকের কথামত এই নিন আপনার জিনিস।" প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল কমলা। আপন শ্রমের সার্থকতায় খুশিতে ভরপুর।

নিজের বিস্মৃতিতে নিজেই লজ্জিত হয় অনিমেষ। সত্যিই তো। অনেকখানি পিছনে রয়ে গেছে বড় রাস্তার মোড়। ছুটে আসার জন্য এখনো হাঁপাচ্ছে কমলা। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিয়ে দুটো টাকা দিতে গেল তাকে।

মনে মনে বরদাস্ত না করলেও পুষ্পিতা কিন্তু নীরব থেকে গেল এ মুহূর্তে। শুধু স্মরণ করিয়ে দিল—"সময় খুব কম।"

টাকাদুটো অনিমেষের হাতের মধ্যেই রয়ে গেল। কমলা নেবার জন্য হাত বাড়াল না। চোখদুটো ছলছল করছে তার। পুষ্পিতার দিকে তাকিয়ে

বলল, "দিদিমণি, এর চেয়ে ভাল কিছু দেবার ক্ষমতা যে আমাদের নেই। আমি তো দাম নেবার জন্য এখানে আসি নি।" এইবার কমলা এগিয়ে এসে প্রণাম জানাল দুজনকে, যেন অতি প্রিয়জনদের বিদায় জানাচ্ছে।

পুষ্পিতা নীরব হয়ে তাকাল কমলার মুখের দিকে। মনে হ'ল সে যেন কমলার কাছে ভীষণভাবে হেরে যাচ্ছে।

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কমলা, কিন্তু পারল না। মাথা নীচু করল।

"কী বলতে যাচ্ছিলে বল না। কিসের লজ্জা।" অভয় দিল অনিমেষ।

স্বর কাঁপছে কমলার। "বাবু, দয়া করে আমার স্বামীকে খুঁজে বের করে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন?"

"কেন তোমার স্বামী দেশে থাকে না?"

"না বাবু, অভাবের জ্বালায় আমাদের বাঁচাবার জন্যে ঘর ছেড়ে চলে গেছে কলকাতায়। সাত মাস হ'ল কোন খবর নেই।" চোখের জল আর সামলাতে পারল না কমলা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "যে মানুষ দিনান্তে একবার ছেলেকে কোলে না নিলে থাকতে পারত না, সে আজ কত দুঃখে বাড়ি ফেরে নি। ফিরেও সে তো আর খোকাকে দেখতে পাবে না।"

দু'গাল বেয়ে নেমে আসছে বেদনার দুটি নীরব নদী। আবেগে অনিমেষের পা দুটো জড়িয়ে ধরে জানাল করুণ মিনতি, "বাবু, ওকে ভুলেও খোকার কথা বলবেন না, শুধু পাঠিয়ে দেবেন। খোকা নেই জানতে পারলে ও পাগল হয়ে যাবে।"

কোন্ সুদূরে কলকাতা তা জানে না এই নারী। কোন মতেই সে থাকতে পারব না খোকনকে ভুলে, এই স্থির বিশ্বাস ওর জলভরা চোখের মাঝে ধ্রুবতারার মত জ্বলছে।

সময়ের নিশান ভুলে পুষ্পিতারও চোখে জল। তাকিয়ে আছে ওর নিরাভরণ হাতের লাল পলাটার দিকে। শাঁখা নেই, সামান্য ঐ পলাতেই যেন গাঁথা হয়ে আছে ভালবাসার লক্ষ মাণিক।

কী বলবে অনিমেষ। মন তখন কলকাতার গলি থেকে রাজপথ, রাজপথ থেকে গলিতে সন্ধান করে ফিরছে এমন এক দৈন্য পীড়িত মানুষকে যে নাকি সীমাহীন দারিদ্র্যের শিকল ছিঁড়তে স্ত্রীপুত্রের ভালোবাসার স্বর্গকে অতি কষ্টে ভুলে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মত।

"বাবু, দেরি হচ্ছে যে বড়!" রিক্‌শাওয়ালা তাড়া দেয়।

"ঠিক আছে, তুমি ভেব না। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।" আশ্বাস দেয় অনিমেষ।

অপূর্ব কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে কমলার মুখ। "আসুন বাবু।"

অনেকখানি পথ চলে আসার পর হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল অনিমেষ। দেখল কমলা তখনো দাঁড়িয়ে আছে রিক্‌শার দিকে মুখ করে।

খুব দ্রুত গতিতে চলছে রিক্‌শা। আর কিছু দূরেই ষ্টেশন। এমন সময় ধরা গলায় পুষ্পিতা প্রশ্ন করে, "তুমি ওকে মিথ্যা আশ্বাস দিলে কেন?"

"কই মিথ্যা তো কিছু বলি নি।" দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রেখে শান্তভাবে কথাগুলো বলে অনিমেষ।

"নাম ধাম জানলে না, চিনবে কেমন করে?"

পুষ্পিতার প্রশ্ন শুনে বড় করুণ হাসি হাসে অনিমেষ। "খুব সহজে। যে লোকটার হৃদপিণ্ডটা কলকাতায় থেকেও এখনো হারিয়ে যায় নি, জানব সেই ওর স্বামী।"

কখনো বৃষ্টি

সকাল থেকে বৃষ্টি। বেলা বাড়তে আকাশটা নীলে এবং রোদ্দুরে ছিমছাম মেয়ের মত হেসে উঠল। ছাতা নেব কি নেব না--এই রকম ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এই অনর্থক বোঝাটাকে বাড়িতে রেখে যাওয়াই স্থির করল সুদীপ্তা। বাসে চড়ে স্কুলে আসার সময় জানালার ফাঁক দিয়ে মাঠগুলো রুপোর মত দেখাচ্ছিল। গ্রাম বাংলার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এখনো অনেক কিছু হারিয়ে যায় নি, সময় হলেই সেটা ধরা পড়ে। ছোট ছোট ঢেউ পরির মত নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে দিগন্তে বনরেখার দিকে। মনে হয় কারুর ডাক সে শুনেছে। নিজেকেও সে ওই ঢেউগুলোর মত মনে করে। দিব্যেন্দুর ভালোবাসা জীবনকে নতুন করে সাজাতে যেন বারে বারে ডাক দিচ্ছে।

স্কুলে থাকাকালীন ছাত্রীদের পড়ানোর মাঝে চিন্তাগুলো মুছে গিয়েছিল। ছুটির পর আবার যখন ঘরে ফেরার সময় হল তখন সকালের ভাবনাগুলো নতুন করে সামনে এসে দাঁড়াল। ষ্টাফ রুমের একপাশে বসে পাখার তলায় ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল সুদীপ্তা। ভাবতে লাগল কী বিচিত্র এই জীবন। প্রথম কদম ফুলের স্মৃতি বহুদিন আগে হারিয়ে গেছে। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারে নি সংশপ্তক। তখন কিন্তু বুঝতে পারে নি তার আসল স্বরূপ। বাঘের থাবার মত সবকিছু গুটিয়ে

রেখেছিল। যেই শিকার হাতে পেল অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দিল। এসব চিন্তা সে মনে রাখতে চায় না, তবু আসে, এসে কাঁটার মত বিঁধে। মনটা ক্ষত বিক্ষত করে। তখনই জীবনের সবকিছু মৃত্যুর মত বিবর্ণ হয়ে উঠে।

জীবনটা ঠিক সাগর বেলার মত। একটা ঢেউ দাগ কাটার পর অন্য ঢেউটা এসে সে দাগ মুছে দেয়। এটা এখন পরিষ্কার, সংশপ্তকের জীবনে তার আর কোন জায়গা নেই। অবাক হয়, তবুও এ নিয়ে সে ভাবছে কেন? সে যদি নতুন করে জীবনটা শুরু করে তাহলে অপরাধ কোথায়। পৃথিবীর বুকে নতুন করে স্বপ্নে মাতার দিন তার ফুরিয়ে যায় নি। অতএব সে স্বচ্ছন্দে দিব্যেন্দুকে ভালোবাসতে পারে। মাঝে মাঝে দিব্যেন্দু অফার দেয় বেড়াতে যাবার। পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে এ সবের অর্থ বুঝতে পারে। সাড়াও দিয়েছে বেশ কয়েকবার। রূপনারায়ণের তীরে বসে লক্ষ্য করেছে সাঁঝের আকাশজুড়ে অসংখ্য স্বপ্নের আনাগোনা। কিন্তু আর আবেগ নয়, এইবার নতুন করে জীবন শুরুর পালা।

দিব্যেন্দুর কথা ভাবতে ভাবতে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল সুদীপ্তা। আকাশটার দিকে তাকাল, আবার মেঘের মিছিল। পড়ন্ত রোদ্দুরে ইন্দ্রধনুর অপূর্ব তোরণ। আপন আনন্দে হাসল একবার। তারপর মনে মনে প্রশ্ন করল, "এইবার সুদীপ্তা বল, কি করবে তুমি?"

"জানি না কেমন করে শুরু করতে হবে।"

"কেন একটু আগেই তো নতুন করে জীবন শুরুর কথা বলছিলে, তাই কর। মনটা বদলে নাও। বিষণ্ণতার কাছে আত্মসমর্পণ অর্থহীন।"

ঠিক তখনই মনের ভিতর থেকে আর এক সুদীপ্তা হো হো করে হেসে উঠল। 'কী বোকা মেয়ে রে বাবা। জীবনটাকে জীবনের মত করে সাজাও।'

'কিন্তু পুরানো দিন, পুরানো স্মৃতি—এগুলি ভুলি কেমন করে?'

'যেমন করে সংশপ্তক ভুলে গেছে, ঠিক তেমনি করে। অত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন। একটা শ্লেটে নতুন কিছু লিখলেই পুরানো লেখাগুলো আপনা আপনি মুছে যাবে।'

'দিব্যেন্দুও যদি প্রতারণা করে, তখন?'

"সোনা খাঁটি কিনা স্যাকরা যেমন দেখে নেয়, তুমিও দেখে নেবে। খাদ না থাকলে ভয় নেই।"

"কিন্তু মানুষের মনটা তো ভীষণ বস্তু, তাকে জানব কেমন করে?"

"মন দিয়েই মনের বিচার করবে।"

'অত চিন্তা করছ কেন? সমস্যাগুলো আসবে কোন কিছু শুরু হবার পর। তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাধান করবে।'

'ঠিক আছে তাই হবে। অতীতের সব কথা খুলে বলবে দিব্যেন্দুকে। কোন কিছুই গোপন করবে না। প্রকৃত ভালোবাসতে চাইলে বুকে তুলে নেবে। আঘাতটা যদি আসে প্রথমে আসাই ভাল, তেমন বেশি দাগ কাটবে না।'

রূপনারায়ণের দিকে একবার তাকাল সুদীপ্তা। জোয়ার এসেছে। লক্ষ ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে সুমুখ পানে। জীবনে জাগার সঙ্কেত। আবার নিজস্ব চিন্তার মাঝে ফিরে এল। হ্যাঁ, দিব্যেন্দুকে নিয়ে সে নতুন করে বাঁচবে।

আবার সেই অন্য সুদীপ্তা সামনে এসে দাঁড়াল। 'সাবাস্, দেখছ না প্রত্যেকেই চাইছে মনের আদলে নিজস্ব ভুবন।'

নতুন চিন্তার গন্ধে মাতাল হয়ে বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে গেল সুদীপ্তা। সময়ে বাস এল। ভীষণ ভীড়। উঠে দাঁড়ানোর মত জায়গা পাওয়ার সম্ভবনাও নেই। ভাবল আজ না হয় নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যাবে কোলাঘাট ব্রিজ। চারপাশের পৃথিবীটা বহুদিন দুচোখ ভরে দেখে নি। সুযোগ যখন এসেছে তখন তার সদ্ব্যবহার করাই ভাল।

কিছু দূর চলতে চলতে মনে হল সুদীপ্তার, সে একা নয়, আরো দুজন তার সঙ্গে চলেছে! কী আশ্চর্য, একপাশে সংশপ্তক, অন্যপাশে দিব্যেন্দু!

'কাকে দেখছ অমন করে? আমরা দুজন তোমার আদলে তৈরি।'

"কে ডাকল তোমাদের?"

"কেন তুমি তো ডাকলে? এখন তুমিই মনে করতে পারছ না?"

চোখের সামনে ভেসে উঠল এক মনোরম চাঁদনি রাত। দিব্যেন্দুর বাহুর আবেষ্টনীতে ধরা দিয়েছে সুদীপ্তা। চাঁদের চিকন আলো ঢেকে দিচ্ছে বৈশাখের দুরন্ত ঝড়। সব কিছু উড়ে যাচ্ছে, খসে পড়ছে। আকাশ এবং পৃথিবী মিলে মিশে একাকার। বর্ষণস্নাত সুদীপ্তাকে প্রশ্ন করছে দিব্যেন্দু, 'ভাল লাগছে আমাকে?''

উত্তর দিল না সুদীপ্তা। মনোরম হাসিতে ভরে উঠল সারা মুখ। 'তুমি ঠিক পাগলা হাওয়ার মত।'

আরো কিছু বলার আগেই পর্দাটা সরে গেল। ছবিটা প্রায় আগের মতই। মাঝ রাত, পৃথিবীর দিকে চাঁদের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। সাঁওতালদের নাচ গানের শব্দে বাতাস মৌ মৌ করছে। ফিসফিস্ করে বলল সংশপ্তক, 'দ্যাখো চাঁদের আলোটা তোমার মুখের উপর পড়তে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে।'

'বাপ্ রে বাপ্, এ যে মহাকাব্য।'

'সত্যি বলছি কাব্য নয়, মনে হচ্ছিল চাঁদের থেকেও তুমি সুন্দর।'

'তারপর।'

পরের উত্তর এল অজস্র চুম্বনে। সুদীপ্তা বুঝতে পারল নতুন এক পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে আনন্দের দোদুল দোলায় দুলতে দুলতে। মনে হচ্ছিল এ রাত অনন্তকাল ধরে থাক, কিন্তু শুকতারা রাত শেষের ঘন্টা বাজিয়ে দিল।

কথা বলছে দিব্যেন্দু একেবারে কানের কাছে মুখ এনে। 'তোমার রূপ তোমার যৌবন আমাকে মাতাল করে। আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা ধরে বুকের কাছে টেনে নিতে চাইল সংশপ্তক। ''আমাকে ভুলে যেতে অনেক চেষ্টা করেছ। পার নি। ভালোবাসার মুহূর্তগুলো কেউ ভুলতে পারে না। তুমি আমার। চল না, আবার নতুন করে জীবন শুরু করি।''

অপূর্ব এই দ্বন্দ্বের মাঝে সুদীপ্তা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখল একটা ঝোপের মধ্যে বাসা বেঁধেছে দুটো পাখি। বাচ্চা দুটো ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে ঠোঁট

ফাঁক করে ওদের দুজনের কাছে খাবার চাইছে। মনোরম অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর যত আনন্দ এখানে যেন দানা বেঁধেছে। ঠিক এমনটাই চেয়েছিল সে, পায় নি। আবার নতুন করে পেতে হবে।

সহসা মনে হল ওদের দুজনের একজন ওর ডানহাত, অন্যজন ওর বাম হাত ধরে জবাবদিহির অপেক্ষায় একেবারে মুখোমুখি।

সংশপ্তক কথা বলল প্রথমে। 'চল, ফিরে চল।'

'নিয়ে গিয়ে রাখবে কোথায়? কোথায় ছিলে তুমি? হাত ছাড়।'

বিজয়ীর হাসি দিব্যেন্দুর চোখে। "এস আমার সঙ্গে। প্রতিজ্ঞা করছি জীবনের সব কিছু তুমি পাবে।"

কী যেন ভাবতে লাগল সুদীপ্তা। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। এত বড় স্পর্দ্ধা! স্কাউনড্রেল কোথাকার। জামার কলারটা ধরে টান মারল সংশপ্তক।

মুহূর্তে চোখ দুটো জ্বলে উঠল দিব্যেন্দুর। "খুব সাবধান। হাড় ক'খানা ক্যারাটের আওতায় চলে আসবে।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঘুষি চলে গেল নাকের উপর।

রক্তাক্ত শরীরে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে দিব্যেন্দুর গলাটা টিপে ধরার চেষ্টা করল সংশপ্তক। একইভাবে চেষ্টা চালাল দিব্যেন্দু। শেষ পর্যন্ত উভয়ে উভয়ের গলার নাগাল পেয়ে গেল। উন্মত্ত জিঘাংসায় দুজনেই অস্থির।

"থাম তোমরা, নচেৎ আমি আত্মহত্যা করব।"

সুদীপ্তার চীৎকারে ওদের বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'ল। ধূলামাখা রক্তাক্ত দেহে উঠে দাঁড়াল দুজনে।

হিংস্র একটা হাসি কাটা ঠোঁটের উপর দিনের শেষ রশ্মির মত খেলে গেল দিব্যেন্দুর।

"বল, তুমি আমার?"

একটুও চিন্তা না করে উত্তর দিল সুদীপ্তা, "হ্যাঁ, আমি তোমার।"

"আমার নয়?" ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় সিংহের মত ফুলছে সংশপ্তক।

সুদীপ্তার মুখে রহস্যময়ী হাসি, 'হ্যাঁ আমি তোমারও।'

"কাকে চাও?" আক্রোশে উভয় স্বর তখন এক হয়ে গেছে।

সমান দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল সুদীপ্তা, "তোমাদের দুজনকেই।"

'না, না, তা হয় না, একই আকাশে দুটো সূর্য থাকে না। এখনো বল কাকে চাও।'

চোখ জ্বলছে দিব্যেন্দুর। 'তুমি ভীষণ খারাপ। মৃত্যুই তোমার একমাত্র শাস্তি।'

দিব্যেন্দু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সুদীপ্তার গলার দিকে হাত চলে গেছে সংশপ্তকের।

"খবরদার, ওকে মেরো না, ছেড়ে দাও। আমি দাবি ছেড়ে দিচ্ছি। ও তোমার। তোমাদের মিলনে আমি সুখী।" কথা বলতে বলতে হাঁফাচ্ছে দিব্যেন্দু। কিন্তু সারা মুখে ফুটে উঠছে অনুপম দেবশ্রী।

হাত সরিয়ে নিয়েছে সংশপ্তক। মুখে জয়ের আনন্দ।

অবাক সুদীপ্তা। এ কী জঘন্য নিষ্ঠুরতা! সংশপ্তকের দিকে তাকাতে ভীষণ ভয় করছে।

"দাঁড়াও দিব্যেন্দু, তুমি ইচ্ছে করলেই যেতে পার না। আমি বাঁচব কেমন করে।" চোখে জল এসে গেল সুদীপ্তার।

ক্ষণিক নীরবতা। সেই নীরবতার মাঝেই তিনটি নির্জন দ্বীপের মত তিনজন তাকাল পরস্পরের মুখের দিকে। তারপরেই মাথা নীচু করে পায়ে পায়ে চলে গেল দিব্যেন্দু, ঠিক যেমন করে পৃথিবীর উপর দিয়ে দিন চলে যায়।

অতীতের দানবটা তখনো দাঁত বের করে হাসছে।

গর্জে উঠল সুদীপ্তা, "কি চাও তুমি। আমার জীবনের সব কিছু তুমি

পেয়েছিলে। তাকে সম্মান করতে পারনি।"

"তুমি নিজের সঙ্গে বৃথা লড়াই করছ। আমি তো এখন অতীত, না ডাকলে আসব কেন? তুমি যদি না আমাকে ভুলতে পার, দোষটা কি আমার।"

"কথা দিচ্ছি, আমি ভুলে যাব তোমাকে। আর এস না তুমি। কেন যে তোমায় মনে করেছিলাম তা আমি নিজেও জানি না।"

বিজ্ঞের মত হাসল সংশপ্তক। "আমি জানি কারণটা। আমি তোমার স্মৃতি ও সত্ত্বায় অবিস্মরণীয়।"

"আমি মানি না তোমার হেঁয়ালি। তুমি প্রাণ নিয়েছ, প্রাণ দিতে পারনি। তুমি কাউকে ভালোবাসতে পারনি। চাই না তোমাকে।"

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক ধাক্কায় সংশপ্তককে ফেলে দিল দূরে। তাকাল নীচের দিকে। দেখল সেই বিশাল দেহটা গড়াতে গড়াতে একেবারে নদীর জলে গিয়ে পড়ল। দুরন্ত স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল মহা আনন্দে।

এমনই সময়ে আকাশটা ডেকে উঠল ভয়ঙ্কর শব্দে। চোখ ঝলসান আলোয় সে চিৎকার করে উঠল 'বাঁচাও।'

কিন্তু পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে বোবার মত তাকাল চারপাশে। কেউ কোথাও নেই। পথ চলছে সে একা। খুব ভাল করে দেখল নদীটা। না, কেউ কোথাও ভেসে যাচ্ছে না। জলের উপর বাদল মেঘের ছায়া ক্রমশ গাঢ়তর হচ্ছে। মাছধরার নৌকাগুলো ময়ূরীর মত ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে। মেঘের কানাৎ ছুঁয়ে বেলা শেষের আল্পনা আঁকছে সূর্য।

সুদীপ্তা চলতে থাকে।

শহরের সীমানায় আঁকা বাঁকা হয়ে দামোদরের এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে উত্তর দিকে। ঐ দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল ছকু, এই পাড়াটার সীমানা ছাড়িয়ে গেলেই বুঝি মানুষের জীবনটা ঐ রাস্তাটার মত সোজা হয়ে যায়। মনের ভিরতটা ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে ওঠে, কিছুই ভাল লাগে না। তবুও সব আবেগ সংহত করে মনে মনে ভাবে, এস্‌পার ওস্‌পার যাই হোক একটা করবেই। এটাই হবে শেষ লড়াই। বাধা অনেক, তবু সে জিতবে; জিতবেই। আর সে জেতার ভাগীদার হবে লুসি। লুসিকে নিয়ে কোথায় উঠবে সে কথা পরে ভাবলে চলবে। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে, এত বড় পৃথিবী, ঠাঁই যেখানে হোক জুটে যাবে। চলে যাবে অনেক দূরে, দশ-বিশ খানা গ্রাম পেরিয়ে এই শহরের সমস্ত গন্ধ মুছে ফেলে একেবারে ভিন্ গাঁয়ে। গতর খাটিয়ে খাবে, ইজ্জত থাকবে। এখানকার মত জীবনটা লজ্জায় কখনো নুয়ে থাকবে না।

খাঁ খাঁ রোদ্দুর, মদের দোকানের সামনে কৃষ্ণচূড়াটা যেন গর্মিতে ধুঁকছে। তবুও রঙের বাহার কম নয়, যেন একরাশ আগুন। দুপুরের পশ্চিমী হলকায় গা পুড়ে যায়। কিন্তু সে সব এখন কিছুই গায়ে লাগছে না। ঠিক চোরের মত পাড়ার চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। পাড়া বলতে ক'ঘরই বা। রাস্তার ঢাল জুড়ে সামান্য ছাড়াছাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে কুষ্ঠরোগীর মত আট খানা দোচালা। সামনে একখানা করে চটের পর্দা। এরই ভিতর মাতালরা খোঁজে রাতের স্বর্গ। দেহ বিকোয়, টাকা আসে, খেয়ে বাঁচে। কিন্তু এমন করে বাঁচতে চায় না ছকু, সে কারণেই পালিয়ে গিয়েছিল। পাড়ার

মেয়েদের জন্যে খদ্দের ধরার ফড়েদারি প্রথাটা আদৌ ভাল লাগে নি তার।

মাঝে কটা দিনই বা গেছে, তাতেই গোটা পাড়াটা নতুন বলে মনে হচ্ছিল ছকুর। রাস্তা থেকেই লুসিদের দাওয়ার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। উদ্দেশ্য লুসির চোখে চোখ পড়লেই জানিয়ে দেবে সে এসে গেছে। বেশ কয়েকবার তাকাল। হতাশ হল লুসিকে একবারও বাইরে বেরোতে না দেখে। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ নেই, সেটাই মনে মনে ভাবল।

ঠিক দুপুর বলেই মদের দোকান বন্ধ। নেশাখোর লোকের আনাগোনায় বাতাস এখন উত্তাল নয়। কিন্তু সকাল বেলাকার জমে ওঠা মৌতাতের চিহ্ন এখনো ছড়ান। একরাশ বমি উগরে গেছে নিশ্চয় কোন বেহেড। ঘেয়ো মাছি উড়ছে ভন্ ভন্ করে। নেড়ি কুকুরটা খাবার লোভে একবার করে এগোচ্ছে, উৎকট টক্ গন্ধে পরক্ষণেই লেজ গুটিয়ে সরে যাচ্ছে। শীর্ণকায় বাচ্ছা দুটো ছড়ান শাল পাতায় লেগে থাকা আলুর দম চাঁটছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল ছকু। হঠাৎ কোথা থেকে রাধী পাগলী এসে খেদিয়ে দিল ওদের। অত্যন্ত ব্যস্ততায় পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছকুর পানে তাকিয়ে হি হি করে হাসল। তারপর পাতা চাঁটতে চাঁটতে চলে গেল দোকানের পিছনের রাস্তা দিয়ে। যখন যৌবন ছিল তখন এই রাধী ছিল রাধারানি। এখন যৌবন নেই, অসময়ের জন্যে মেয়েও বিয়োতে পারে নি; তাই এককালের রাধারানি আজ রাধী পাগলী। ওর কথা ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছকু! কী জীবন, হায় রে।

সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার ভাবটা নতুন করে মাথা চাড়া দিল। আর সব রাগটা পড়ল বমির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নেড়ি কুকুরটার উপর। একটা মাটির চ্যাঙড় তুলে ছুঁড়ে মারল ছকু। 'শালা, এ পাড়ার মায়া ছেড়ে পালাবি কিনা বল।'

এক ঠ্যাং উঁচিয়ে কেঁউ কেঁউ শব্দ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল কুকুরটা।

মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ছকুর। 'যা শালা, আর কোনদিন আসিস্

না। এলেই মরবি।'

এই ফাঁকে আর একবার পাড়ার দিকে তাকাল ছকু। জাগে নি কেউ, সবাই ভাত ঘুমে। রোজকার মত আজ আমতলায় চাটাই বিছিয়ে ঘুমাচ্ছে চাঁপা, রূপা, বাসন্তী। ঘুমাবে না কেন, রাতের ধাক্কা খাওয়া নেতিয়ে পড়া দেহটা মেরামত করে নিচ্ছে। টোকাপানা ফুলের মত ফুটে উঠবে রাতের শিশির পেলে।

আজকের এই ছবিটার সঙ্গে কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার দিনের ছবিটার ছিল বিরাট ফারাক, সে একটা আলাদা আবহাওয়া, আলাদা দিন। নতুন করে লুসিকে আবিষ্কার করার দিন।

রাগ করেই কাজে যায় নি সেদিন, মুখেও তুলে নি কিছু। সকাল থেকে ঠায় রাস্তার উপর বসে বসেই কাটছিল সারাটা দিন। মা ডাকল, বোন ডাকল খাওয়ার জন্য, কিন্তু সবাইকে মেজাজ দেখিয়ে খেদিয়ে দিয়েছিল ছকু। কেনই বা দেবে না? ওরা ভাবছে লুসির উপর নজর ফেলাটা অন্যায়। ওরা এখনো ভাবে মেয়ে যেখানে মূলধন, সেখানে মেয়ে ফুঁসলে নেওয়ার চেষ্টাটা ভীষণ খারাপ। কিন্তু খারাপটা কোথায় শুনি।

না খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করতে বোনটা তখনো দাঁড়িয়েছিল, চোখে চাপা কান্না। মা কিন্তু জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় মনের ঝাল মিটিয়ে নিল ইচ্ছে মতন। 'পেটে ধরলে কি হবে, ও একটা আস্ত পাঁঠা। ওর জন্য সোহাগ দেখাতে অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলি কেন ল্যা, ভাল করে সাজগে যা, খদ্দের না ধরলে খাবি কি।'

কথা শুনে হাসছিল লুসি। বসে ছিল ওদের থেকে মাত্র হাত তিরিশেক দূরে রাস্তার পূর্ব ঢালে। চুলে বিলি কাটতে কাটতে উকুন বেচে দিচ্ছিল লুসির মা। ছকুর পানে আড় চোখে তাকাচ্ছিল লুসি, মায়ের কাছ থেকে ছাড়া পাবার আশায় বার কয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করল। 'উঃ যা লাগছে, ছেড়ে দাও, আমি নিজেই চুল বাঁধব।

মেয়েকে বোঝাল লুসির মা, 'হাল ফিসিনে চুল বাঁধতে পারবি না তুই।'

ফুঁসে উঠেছিল লুসি, 'ও এক্ষুণি খদ্দের পাগড়েছিস্ বুঝি?'

'অবুঝ হচ্ছিস্ কেন, বোস।'

উঠে পড়ে লুসি। বুক নাচিয়ে মাকে বুঝিয়ে দেয়, সে আর তাকে তোয়াক্কাই করে না। মায়ের কাছ থেকে একেবারে তার সামনে এসে ফিক্ করে হেসে উঠেছিল। 'কি গোঁসাইজী, গোঁসা ভাঙল নি।'

ওর হাসিটা যেন হিলহিলিয়ে ছোবল মারছিল। ধমক দিয়েছিল ছকু, 'পালা বলছি। দাঁত বের করতে লজ্জা করে না।'

'রোদ গিললেই পেট ভরে যাবে তো? আর খাবে না তো কোন দিন?' জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করেছিল লুসি।

একটা কঞ্চি তুলে নিয়েছিল ছকু, 'নজরের সামনে থেকে যাবি কিনা বল।'

হাসিতে ভেঙে পড়ছিল লুসি। 'খুব যে বীরত্ব, মার না, মার। এই তো দাঁড়িয়ে আছি।'

লজ্জায় কঞ্চিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। 'খুব যে দাপট রে।'

'উঁহু মোটে নয়।' হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে লুসি। 'বলি পেট জ্বলছে কার, আমার না তোমার?'

'তাতে তোর কি?'

মুহূর্তে সেই মিষ্টি হাসির ঝিলিকটা মুছে গেল চোখের তারা থেকে। অভিমানের মুখখানা যেন রাস্তাটার মত নির্জন হয়ে উঠছিল। মাথা নীচু করে বলেছিল 'বেশত আমি চলে যাচ্ছি, তোমার জন্যে লুকিয়ে ভাত রেখেছিলুম, আমিও খাব না কিন্তু।' অত্যন্ত ম্লানভাবে তাকাল লুসি। চোখে জল।

ছকু তাকিয়ে রইল মুখখানার দিকে, ওর জ্বল জ্বলে সিঁথিটার দিকে, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ।

ভালোবাসার এমন সুন্দর ছবি জীবনে এই প্রথম। সিঁদুরের ঐ লাল দাগটার যে এমন বিশেষত্ব থাকতে পারে সেটা আগে বুঝতে পারে নি। কিন্তু এখন ঐ রেখাটাই যেন জীবনের পরিধিকে চিহ্নিত করে ফেলেছে।

আনন্দে লুসির কাঁধের উপর হাত রেখেছিল ছকু। 'রোদে সিদ্ধ হচ্ছিস্ কেন, বাড়ি যা। আমি দোকানে খেয়ে নেব।'

দেরি দেখেই লুসির মা এদিক ওদিক তাকিয়ে মেয়েকে খুঁজতে একেবারে বাঁধে উঠে এসেছিল। ব্যাপার স্যাপার দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম। 'হ্যালা খচ্চরি, এই তোর বাঁধে যাওয়া। বলিহারি ছল। খাওয়া দাওয়া না করে এখানে দাঁড়িয়ে পিরিত মারাচ্ছিস্ কোন্ লজ্জায়।'

মুখ ভেংচায় লুসি। 'বেশ করব, তোর কি?'

আরো জ্বলে ওঠে লুসির মা। 'কি খানকি মেয়ে গো, এ্যাঁ, আমাকেই ভেংচি কাটে।'

'গাল দিবি না বলে রাখলুম', মাকে ধমক দেয় লুসি। চলে যাওয়ার আগে আর একবার ছকুর দিকে তাকায়।

সব কিছু ভুলে ছকু শুধু রাঙা সকালের মত ওর সিঁথিটার দিকে তাকিয়েছিল, চোখ ফেরাতে পারেনি। মুখ-চোখের সেই ভঙ্গি স্মৃতিতে এখনো স্পষ্ট। কদিন বাইরে ঘুরে কাটানর সময় ঐ সিঁথিটার স্বপ্নেই বিভোর থাকত ছকু।

এই সেদিনও ওর সিঁথিটা ফাঁকা ছিল। একদিন তার মায়ের সঙ্গে লুসির মায়ের কি কথাবার্তা হয়েছিল তা সে জানেনি। তবে দুপুর বেলায় খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল লুসির মা। পরে জানতে পারল লুসির বিয়ে। বিয়ে তারই সঙ্গে। নতুন কাপড় পড়ল ছকু, শাঁখ বাজল। দু'চারজন বুড়ি এসে আশীর্বাদ করে গেল। সন্ধ্যে বেলায় লুসিদের বাড়ির ভেতরের ছবিটা যেন গোটা পাড়ার থেকে আলাদা হয়ে গেল, এক এক করে পাড়ার সবাই এসে খেয়ে গেল লুসিদের বাড়িতে। মাংসভাতের ঢালাও ব্যবস্থা। এক পাঞ্জাবি ড্রাইভার আশার খদ্দের হয়ে সেদিন এসেছিল। ব্যাপারটা কানে যেতেই দিল দরিয়া হয়ে খরচ করে দিলে, কিন্তু রাতে আশাকে নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকল আর এদিক পানে একবারও এল না।

বিয়ে সে অনেকবারই দেখেছে, এমনকি একবয়সের জুটি আশারও। কিন্তু এ বিয়ে শুধু অনুষ্ঠান। আর কিছু নয়। সংসার বাঁধার ব্যাপারটাই এখানে

নেই। যত ঝক্কি ঝামেলা সব মেয়ের তরফের, যে বিয়ে করবে সেদিনটায় তার বরাতে জুটবে ভাল খাবার, তার উপর একখানা নতুন কাপড়। বিয়ের পরদিন থেকে সে কিন্তু কার্যত তার স্বামী নয়, রাতে যার যে খদ্দের জুটবে সেই হবে স্বামী। বিয়ের পর ঐ আশার পেছনে দামোদরটা বছরখানেক ঘুর ঘুর করেও পাত্তা পেল না। শেষে মনের জ্বালা মেটাল একশিশি ফলিডল খেয়ে। সেই প্রথম গোটা পাড়াটা চমকে উঠেছিল, কিন্তু চলতি নিয়মের কোন হেরফের হ'ল না।

অদ্ভুত সে রাত। মরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছকু কোন দিন ভুলতে পারবে না সেই স্মৃতি। এখনো মনের কোণে আঁঠার মত লেগে আছে সেই মিষ্টি স্বাদটুকু। রাত তখন নটার মত। সবাই খাওয়া সেরে চলে গেলে শুরু হ'ল অনুষ্ঠান। লোকের মধ্যে সে, তার বোনটা এবং মা, আর লুসি, লুসির মা। পিঁড়ির উপর দাঁড়াল সে। জলের ঝারি নিয়ে সাত পাক ঘুরল লুসি। চোখে কাজল, কপালে চন্দনের টিপ, গলায় ফুলের মালা, মাথায় মুকুট। একরাতেই লুসি একেবারে আলাদা। চোখ ফেরাতে পারল না ছকু। আদুরে মুখখানার আলাদা একটা গরিমা। নিজেই বরণ করল। মালা বদলের মুহূর্তে হয়ত বা কোন গোপন লজ্জায় একবার মাথা নোয়াল।

'লজ্জা কিরে, দে পরিয়ে দে,' আদরের সুরে বলল লুসির মা।

নিজের গলা থেকে মালা নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিল ছকুর গলায়। গোধুলি লজ্জায় তাকাল মুখের দিকে। তেমনি ভাবেই ছকু নিজের মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। মালা বদল হল পর পর তিনবার। তারপর সিঁদুর মাখানো লক্ষ্মী ঝাঁপিটা দিয়ে ওর সাদা সিঁথির উপর এঁকে দিয়েছিল লাল চিহ্ন।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ওদের সেই রাতের মত একই ঘরে থাকতে দিয়েছিল। আলো জ্বলছিল। কিন্তু দুইজনেই চুপচাপ। বাতাসীদের ঘর থেকে কোন এক মাতাল খদ্দেরের বেহিসেবি খিস্তি আর অসাধারণ দাম্ভিকতা রাতটিকে উলঙ্গ করে তুলেছিল। তবু মনে হচ্ছিল এ রাত তাদের কাছে সুন্দর।

এক সময় ঘুম এসে গিয়েছিল। শুয়ে পড়ার আগে লুসির দিকে ফিরে

তাকাল ছকু। কাঁদছে লুসি। কোলের কাছে টেনে নিয়েছিল মুখখানা। 'কাঁদছিস কেন?'

স্থির চোখে মুখের দিকে তাকাল লুসি। 'জান তো আমাদের নিয়ম। কাল থেকে খদ্দের এলেই কাজে লাগাবে।'

বুকের ভিতরটা এই সামান্য কথাতেই যেন কেঁপে উঠেছিল। লুসিকে বাঁচানোর সাধারণ ইচ্ছাটা প্রবল জিদে পরিণত হল সেই মুহূর্তেই। 'তুই ভাবিস্ নি লুসি। 'আমরা পালাব।'

লুসির চোখে সে আনন্দের বর্ণনা কোন কালেই দিতে পারবে না ছকু। এমন ব্যবহার করে বসল যেন লুসি তার সত্যিকারের বউ।

'যাবে তুমি! ঠিক বলছ?'

'হাঁরে, তুই দেখে নিস্।'

'তবে কালকেই চল।'

'অত উতল হলে চলে। আগে আস্তানা খুঁজি।'

ওর কথায় অগাধ বিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাল লুসি। ওর চন্দন মাখা মুখখানা দেখতে দেখতে বাকি রাতটুকু শেষ হয়ে গিয়েছিল।

খদ্দের জুটল তৃতীয় রাতে, হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে এসে দাঁড়াল লুসি। 'আমাকে নিয়ে পালাবে কিনা বল।' চোখে গভীর অস্থিরতা।

'এখনো যে বাড়ি পাইনি রে।'

'সে কি! তুমি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছ।' কেঁদে ফেলল লুসি।

খদ্দের তখন গালাগাল শুরু করে দিয়েছে লুসির মাকে। 'ডবগা ছুঁড়ি দেখিয়ে পাঁচিশ টাকা নিয়েছিস বেশ্যা মাগি। মাল কোথা গেল বল।'

বোঝাতে চেষ্টা করছিল লুসির মা। 'প্রথম রাতটায় কোন্ মেয়ে না বাঁক ধরে। তারপর কিন্তু সব ঠিক হয়ে যায়।' মেয়ে খোঁজার জন্যে ঘরবার শুরু করে দিয়েছিল। নজরে আসতেই সে কি বিক্রম। 'খানকি, চলে আয় বলছি। তোর জন্যে খদ্দেরের কাছে ঝাঁটা খেতে হবে নাকি।'

বচন শুনে বুকের ভিতর দামামা বেজে উঠল ছকুর। 'ও যাবে নে কোনমতে।'

আর যায় কোথায়। পাগলা কুকুরের মত তেড়ে এল লুসির মা। 'বটে, এতখানি তোর বুকের পাটা। কেমন করে রাখতে পারিস্ আমি দেখব-দেখব-দেখব।' হাতের চেটোয় তিন কিল মেরে তিন দিব্যি করল। 'কানাকড়ির মুরদ নেই, মুখপোড়া যেন পিরিতে নেয়ে এসে হাজির হয়েছে। লাইনে মাথা দেগে যা না।'

নেশায় টলতে টলতে এবার যে এগিয়ে এল তাকে দেখেই ছকু অবাক। 'বাবু আপনি!'

'চিনতে পেরেছ ছোকরা আমি কে? আমি তোমার বাবা।' নিজের বুকের উপর আঙ্গুল রেখে মুচকি হাসছিল সমীরণ কুণ্ডু। 'ওর মায়ের গাল খাচ্ছিস্ তো। কেন ঝামেলা পাকাচ্ছিস্ বাবু।'

সামনে ওরা দু'জন, পিছনে লুসি। মাঝখানে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছকু।

বকা কিন্তু বন্ধ করে নি সমীরণ কুণ্ডু। নেশায় টলো ডোঙার মত দুলছিল। 'এই মুলুকে কত শালা তাবড় তাবড় চাঁই আমাকে ভয় করে, আর তুই তো ক'দিনের ফচ্‌কে।'

কোমরে দু'হাত রেখে একেবারে ছকুর মুখোমুখি দাঁড়াল সমীরণ কুণ্ডু। মাথা দুলিয়ে অদ্ভুত স্বরে বলল, 'চিনতে-পেরেছিস্।'

'হাঁ পেরেছি, খবরদার অমন মেজাজ দেখাবেন না বলে দিলুম।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ছকু।

'বটে বটে, যার রক্তের ঠিক নেই তাকে আবার মেজাজ দেখায়।' গর্বিত হাসিতে ফেটে পড়ল এবার।'

'আবার গাল দিলে কিন্তু—' বাঁহাতে জামার কলারটা ধরেই ডান হাতের শক্ত মুঠিটা ঠিক নাকের ডগার উপর তুলে ধরল ছকু। 'গাল দাও না এবার, দাও।'

'গোস্তাগি হয়েছে তোর। গায়ে হাত তোল্ না, তোল্।' মুখে তখনো আস্ফালন করলেও দু'চোখের উপর ভয়ের স্পষ্ট ছবিটা নজর এড়ায় নি ছকুর।

ছেড়ে দিল ছকু। মনে করেছিল চলে যাবে। কিন্তু দেখল ভবি ভুলবার নয়।

এবার লুসির মাকে লক্ষ্য করে শুরু করল পাঁয়তারা। 'আমার টাকা ফেরত দে মাগি। তিরিশ টাকায় তোর মেয়ের চেয়েও ঢের ভাল মাল জুটবে।'

সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ টাকা ফেরত দিয়ে লুসির মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

নোট গুলো পকেটে রাখতে রাখতে হাসল আপন মনে। 'এ শর্মা আজ ফিরে যাবে না।'

ছকুর চোখে চোখ রাখল এবার। 'এতক্ষণ তো খুব লাফালাফি করলি রে ছোঁড়া, এবার তোর বোনের ঘরে গেলে রুখতে পারবি?'

ঠাস্ করে গালের উপর একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল ছকু। 'জেল খাটতে হয় সেও ভাল, দাপট আমি ঘোচাবই।'

কিন্তু মুহূর্তেই বড় একটা রামদা নিয়ে হাজির লুসির মা। 'দাঁড়া রামপাঁঠা, খদ্দেরকে অপমান করলি, তোকে আমি দুফালা করে ছাড়ব।'

লুসির বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না ছকু। এ অবস্থায় তাকে ঠেলতে ঠেলতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার সুযোগটুকু করে দিয়েছিল।

সে রাতের মত ঘটনার ইতি হয়ে গেলেও আসর জমে উঠল সকালে। খিস্তির বান ডাকাল লুসির মা। ছকুর মা বোনকেও বাদ দিল না। এভাবে অপরের মেয়ের মন ভুলিয়ে কেলেঙ্কারির ব্যাপারটায় সায় দিল না পাড়ার কেউ। সুযোগ বুঝে লুসির মায়ের সে কি লাফানি।

'আমার মেয়ের উপর নজর দিলেই আমি আর এমনি ছাড়ব না, ঝাঁটাপেটা করব।'

গোলমাল থেকে রেহাই পাবার আশায় কাঠের গোলায় কাজে চলে গিয়েছিল ছকু। দুপুরে বাড়ি ফিরতেই আবার ক্ষেপে উঠল লুসির মা। তিরিশ টাকা খোয়া যাওয়ার দুঃখ সহজে ভুলতে পারছিল না।

সকাল থেকে চুপচাপ থাকার পর এবার আর থাকতে পারল না ছকুর মা। 'ঝাঁটা আমরাও ধরতে জানি। কিছু বলি নি বলে একেবারে যাচ্ছেতাই শুরু করে দিয়েছে। নিজের বক্না সামলে রাখ্, পরের এঁড়ে ধরে টানাটানি করিস্ কেন?'

ঠিক যেন জোঁকের মুখে নুন। খানিকক্ষণ গজ গজ করে চুপ করে গেল লুসির মা।

কিন্তু নিজের মায়ের গর্জন থামল না। 'কোন সাহসে ভাব করতে গেছিস্ লুসির সঙ্গে। লজ্জা নেই তোর।'

'না, লজ্জার এতে কিছু নেই। তুমি নিজে জান না কারণটা কি? ওর সঙ্গে আমার কে বিয়ে দিয়েছিল শুনি?'

উত্তর শুনে চোখ কপালে উঠল। কিছুক্ষণ একেবারে গুম, তারপরেই ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'তার মানে?'

'মানেটা সোজা, লুসিকে নিয়ে আমি সংসার করব।'

'আমাদের সমাজের নিয়ম তুই মানবি না?'

'না, আমি ভালভাবে বাঁচতে চাই।'

'তুই ঘেন্না করিস আমাদের?' চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

'আমি নই। ঘেন্না অপরে করে, জেনেও যদি না জানার ভান কর।'

'তুই আমায় বচন ঝাড়ছিস্, জ্যান্ত ভেড়া কোথাকার। দোষটা কোথায় শুনি।'

তর্কের ভিতর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহসী হয়নি ছকু। কিন্তু ভিতরে যে দারুণ জ্বালা আছে সেটা বুঝতেও দেরি হয়নি।

কিন্তু ছকুর মা তখনো সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল, 'মানুষ হবার অত

যদি ইচ্ছা তবে এই বেশ্যা পল্লিতে আছিস্ কেন। উড়তে শিখেছিস্ চলে যেতে পারিস্ না। কে ধরে রেখেছে তোর মত মেড়াকে।'

'বেশ রাত পোহালেই দেখে নিও আমি কি করি।' পাল্টা জবাব দিয়েছিল।'

রাগে আর ঘরে ঢোকেনি ছকু। রাত কাটিয়েছিল কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বাঁশের পাটাতনের উপর শুয়ে। মদের বিশ্রী গন্ধে ঘুম আসেনি চোখে। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল এক কাপড়েই চলে যাবে এখান থেকে। সঙ্গে নিয়ে যাবে অনেক স্মৃতি, সমীরণ কুণ্ডুর মত সমাজপিতাদের অনেক ছবি।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখল পাড়ার উপরই শুয়ে আছে। চিন্তায় চিন্তায় দেহের ভিতরটা যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তবুও এর ভেতর থেকেই আলাদা একটা মানুষ জেগে উঠেছে। অনুভবের এই শক্তিটুকু জাগিয়ে দিয়ে গেছে লুসি। সে কারণেই সে একা পালাতে পারে না। দুঃখ অপমানকে সঙ্গী করেও তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই বাঁধের এ কোলে এই পাড়া, ও কোলে মদের দোকান, এ সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে আর একটা জীবনে তাকে পৌঁছাতে হবেই।

প্রস্তুতির জন্যেই সে মাঝের কয়েকটা দিন চলে গিয়েছিল বাইরে। আজ আবার ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে লুসির টানে।

বেলা পড়ে আসছিল। সিনেমাতলার দিকে গাঁয়ের যাত্রীদের আনাগোনার পথের এখন অন্যরূপ। চাঁপা, রূপা, বাতাসী ঘুম থেকে জেগে উঠলেই তাকে দেখে ফেলতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জেনে যাবে লুসির মা। সুতরাং এখন লুসির সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা না করে আড়ালে থাকাই ভাল। এই চিন্তা করেই বাঁধ থেকে ঢালে নামার জন্য উত্তর দিকে এগিয়ে চলল ছকু।

মদের দোকানের পাশে রুটি তৈরির কারখানার চুল্লি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে একবার দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে খিদেটাও যেন চন্‌মনিয়ে উঠল। টুকিটাকি কাজটা সেরে দিলে এক আধটা রুটি নিজের হাতেই তুলে দেন এরসাদ মিস্ত্রি, কিছু বলতে হয় না মুখ ফুটে। ছেলে বেলায় ময়দা দলে কত

পাউরুটি নিয়ে গেছে ছকু, কিন্তু এমন জোয়ান বয়েসে রুটির জন্যে হাত বাড়াতে কেমন যেন বাধে। যাওয়ার আগে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

পিছন থেকে হঠাৎ মোটর বাইকের শব্দে ফিরে তাকাল। বাইকের উপর সমীরণ কুণ্ডুকে দেখে আত্মারাম খাঁচা। পুলিশ নিয়ে ধরতে আসছে না তো। ছুটে পালাবার সময় টুকুও পেল না ছকু।

মোশন চেক করেই মাটিতে পা ঠেকিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এখানে আসি বলে কাউকে কিছু বলিস্ নি তো?'

'ভদ্দরলোক তোমরা, শুধু ঐটুকু বাঁচাতেই এত ভয়।' সুযোগ পেয়ে হেসে ফেলে।

অনুরোধের ভাষাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে কুণ্ডুর চোখে। 'তামাসা রাখ ছকু, যা জানতে চাইছি বল।'

হাসতে হাসতে বাইকে ষ্টার্ট দেন কুণ্ডু। 'বাঁচালি বাবা।'

কিছুটা আনন্দ অনুভব করে ছকু। বিষ ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়। কারুর বাইরে ঘা, কারুর ভিতরে কিন্তু কেন এই অবস্থা তার কোন হদিস্ পায় না।

আর একবার পাড়াটার দিকে তাকায়। এখনো ঘুমাচ্ছে রূপা, চাঁপার দল। ওর দ্যাখতাই কেমন লাউডগার মত বেড়ে উঠেছিল। দেখতে দেখতে কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। গালের টুস্ টুসে মাংসের জায়গায় উঁচু হয়ে উঠেছে হাড়, স্তনগুলো হয়েছে কুমোরের তৈরি মালসার মত, শরীর বলতে পাছাটাই যেন সব। পুরু ঠোঁটে রঙ মাখালেও চিকন ফোটে না। সন্ধ্যে হলেই সাজগোজ করে বাচ্চা মেয়ের মত ছুটোছুটি করবে রাস্তা থেকে খদ্দের ধরার জন্যে। অনেক রাতে ইশারায় ডেকেছে রূপা। সাড়া দেয় নি ছকু। পা ফস্কায় নি বলেই আজো সে খোঁড়া হয় নি, চলতে পারছে।

এরসাদ মিস্ত্রির সেঁকা রুটিগুলো লেভেলে ভরতে ভরতে একটায় কামড় দিয়ে বসল ছকু।

রকম সকম দেখে হাসল এরসাদ মিস্ত্রি। 'সবুর করলে মধু দিয়ে খেতে

পেতিস্ তো।’

খেতে খেতে দুচোখ বন্ধ করে উত্তর দিল ছকু, ‘বাজে বকুনি, এখন পেট জ্বলছে।’

‘শুধু রুটি খেয়েই কি তোর পেট ভরবেরে শালা।’

এ গালাগাল চিরকালের। বাচ্চা বেলা থেকে শুনে আসছে। এতে উত্তাপ নেই, মিষ্টি স্বাদটুকু মেলে। রাগ না করে হাসে ছকু। ‘আর একটা খাব?’

মিস্ত্রির হাসিতে সম্মতি মেলে।

কিন্তু তামাসা করতে ছাড়ে না মিস্ত্রি, ‘রসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছিস্, এতে পেট ভরবে।’ হাসিতে দাড়িতে ভরা মুখখানা আরো সুন্দর হয়ে ওঠে।

আসল ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ছকুও হাসে। ‘এখনো রস আছে দেখছি।’

‘থাকবে নে শালা। মোর গিন্নির ঠসক দেখলে তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, ভিরমি খাবি।’

তামাসার মাঝে গোপন আনন্দে চমকে ওঠে ছকু। ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে মিস্ত্রি। এক বিবিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে ওর জগৎ। এ আনন্দের স্বাদ বেশ্যাপাড়ায় খদ্দেরগুলো পায় নি। জীবনে একটা আকাশ, তার ভিতরেই স্বপ্ন দিয়ে গড়া লাখো লাখো তারা। মিস্ত্রিকে দেখে এখন ঈর্ষা হয় ছকুর। কী ভীষণ সুখি ও। লুসিকে নিয়ে সেও ঐভাবে যদি কাটাতে পারে।

আরো খানিক ভালোবাসার স্বাদ পাবার লোভেই প্রশ্ন করে ছকু, ‘তোমার বুড়িকে তুমি এখনো ভালোবাস?’

কাজ করতে করতেই জবাব দেয় মিস্ত্রি। ‘তোর মতন চোবাকান্ত দুনিয়ায় কেউ আছে। তাকে মুই ভালোবাসব না তো কাকে বাসব রে শালা।’ ‘সে যে মোর বউ।’ আগুনের তাপে ঝলসে যাওয়া মুখখানা যেন ভর জোয়ারের গাঙ হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে লুসির মালা দেওয়ার ছবিটা ঝিলিক মেরে ওঠে চোখের

সামনে। লুসি অন্য কেউ নয়, তার বউ। চিরাচরিত রীতি সে মানবে না। প্রত্যেক মেয়ের কাছে রাতের খদ্দেরই তার স্বামী এই নিয়ম তৈরি করে যারা অধঃপতনের রাস্তাটা চওড়া করে দিয়েছিল এই মুহূর্তে তাদের উপর গোটাকয় লাথি মারতে ইচ্ছা করছিল।

'কি ভাবছিস্‌রে শালা, পা পিছলেছিস্‌ বুঝি?' হাসে মিস্ত্রি।

'না'

'তবে আনমনা হচ্ছিলি। ভালোবেসেছিস বুঝি?'

লজ্জায় মাথা নীচু করে ছকু। মুখের হাসিটুকু গোপন থাকে না। এই এরসাদ মিস্ত্রি এখন যেন ঠিক ঐ কৃষ্ণচূড়ার ছায়া। পাতাগুলো ঝিমিয়ে গেছে, কিন্তু মাটির উপর ছায়াটুকু, যেন অশেষ মমতায় গড়া।

মিস্ত্রির কথায় পালটা প্রশ্ন করে ছকু। 'কি করে জানলে তুমি?'

'সে খবর আমি জানি।' বিজ্ঞের মত হাসে মিস্ত্রি।

একেবারে কাছে এগিয়ে আসে ছকু। 'বল না মিস্ত্রি, এখন আমি কি করি।'

অনুরোধে মনটা গলে যায় মিস্ত্রির। একবার ছকুর মুখের দিকে তাকায়।

'বিয়ে করেছিস্‌, বউ নিয়ে চলে যেতে পারিস্‌ না। তুই শালা ব্যাট্‌ ছেলে নয়।'

মন্ত্রের মতো ছকুর বুকের ভিতর এক সঙ্গে অনেক আশা মার্চ পাস করে যায়। আবেগে জড়িয়ে ধরে এরসাদ মিস্ত্রির হাত দুটো। 'তুমি ঠিক বলেছ।'

অভিভাবকের মত স্বরটা গম্ভীর হয়ে ওঠে মিস্ত্রির। 'এরসাদ মিয়া ঝুট্‌ বলার আদমি নয়। এখানে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবি, যা বলছি তাই কর।'

'আমিও তাই ভেবেছি।' অস্বাভাবিক প্রত্যয়ে কথা বলে ছকু।

আদরে পিঠে চাপড় মারে মিস্ত্রি। 'সাবাস্‌, একেই বলে মরদ। সেই সঙ্গে জেনে রাখ মোদের জন্মের জন্যে মোরা কেউ দায়ি নই। সে কারণে মানুষের মতই মোরা বাঁচব।'

এবার আর থামে না মিস্ত্রি। ছকুর মুখের দিকে তাকিয়ে এক নাগাড়ে বলে চলে—'মোর তো বাবার নামটা পর্যন্ত জানা নেই। মোকে মানুষ করেছিল যে রসুল মিঞা তাকেই মুই আব্বা বলে জানি। শুধু পরিচয়টুকুর অভাবে নসিব বরবাদ হয়ে যাবে এ কেমন করে মানা যায়। মুই বুঝি ব্যাভার, 'ঠিক মানুষের মতন।'

মিস্ত্রির কাছে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে বাইরে আসে ছকু। বেলা প্রায় শেষ। আকাশের পশ্চিম দিকটা তামাটে। ঝিরে ঝিরে বাতাসে ঝিমিয়ে পড়া কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো সতেজ হয়ে এখন মাতালের মত দুলছে। খদ্দের জমে উঠছে মদের দোকানে। চানাচুরের ঠোঙা হাতে মাল টানছে কয়েক জন। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে রূপা, বাতাসী, চাঁপা। মাথায় ফুল গুঁজেছে, চোখে কাজল, সারামুখে পাউডার, সেন্টের উগ্র গন্ধে এতটা দূরের বাতাসও আমোদ। মনে মনে গাল দিল ছকু--এর থেকে আখড়াই পার্টির সঙ্গুলো অনেক ভাল।

চারপাশটা আরো ভাল করে দেখল ছকু। বাসন্তীর মা পর্যন্ত খদ্দের ধরতে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে একেবারে মাতালদের সামনে।

নজরে পড়তেই ছকুকে দেখে হাসল। 'বুড়ির কুলতলায় ফিরিছিস্ তাহলে।'

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিল ছকু। এদের মাঝে লুসিকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। বুকের ছাতিটা বেড়ে গেল অনেকখানি। লুসি' কথা রাখবে, দারুণ মেয়ে। সহজে নিজেকে হারাবে না।

বাঁধ থেকে নেমে এসে ঘরের সামনেটায় দাঁড়াল। লুসিকে ডাকার অছিলাতেই গলা খ্যাঁকার দিল।

খানিক বাদেই উঁকি দিল লুসির মুখখানা। মুখে সেই হালকা হাসিটা আরো জীবন্ত।

'ফিরেছ তা হলে।' কথা বলল চাপা গলায়।

'আজ যাবি তো?' চাপা গলায় প্রশ্ন করল ছকু।

সম্মতি জানিয়ে হাসল লুসি। 'আরো খানিক বাদে, রাত বাড়লে।'

'তোর মা কোথায়?'

আঁতকে উঠে একবার ঘরের দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে বলল ছকুকে।

'ঘরেই আছে!' চলে আসার আগে ব্যস্ততার সঙ্গে খুব নীচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, তুই রেডি থাকিস্, আমি এইখানেই কাছেপিঠে থাকব।'

রাস্তায় উঠে আসার জন্য পিছন ফিরতেই দেখল রূপা, চাঁপা ওকে দেখে গা টেপাটেপি করছে। এ সব কিছুই আজ গায়ে মাখল না। আত্মগোপনের জন্য আরো কিছুটা সতর্ক হ'ল।

ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল শহরের বুকে। চণ্ডী টকিজ হাউসের সামনে রঙীন আলোর বাহার, যেন মস্ত একটা প্রজাপতি উড়ছে। আলো দোকানে দোকানে। কিন্তু এত কাছে থেকেও এই পাড়াটা একেবারে আলাদা। গোটা পাড়াটা অন্ধকারে কুপি জ্বলে যেন হারিয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডটা খুঁজছে। চুপিসারে এক একজন খদ্দের আসছে, ঢুকে যাচ্ছে ডেরার ভিতর।

চাঁপা খদ্দের বাগিয়েছিল সাত তাড়াতাড়ি। দোরে খিল পড়েছে, ভেতরে মিটমিটে আলো। বাইরে থেকে প্রতিটি বাড়ির একই দৃশ্য। গোটা পাড়াটাকে পেঁচার মত দৃষ্টি ফেলে দেখতে লাগল ছকু, বিশেষ করে লুসিদের ঘরখানা। ঠিক আসবে লুসি। সুতরাং ওৎ পেতে বসে থাকতেই হবে। তারপর, হাঁ, তারপরেই চলে যাবে এই নোংরা পরিচয়টুকু খোলসের মত ফেলে রেখে। একটা উপকার করেছে চাঁপার দল, আসার খবর চাহুর করে নি কাউকে। সে রকম হলে কেউ নেই আসুক বোনটা অন্তত একবারও দেখা দিয়ে যেত।

মদের দোকানের ভিতরের আলোটা বল্লমের মত এসে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার উপর। পাতার আড়ে থোকা থোকা ফুল, বাতাসে নাচছে। খুব ভাল লাগে ছকুর। ফুলগুলো লুসির মত হাসতে হাসতে—কেমন যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সব ভুলে গাছটাকেই দেখতে লাগল ছকু।

আরো খানিক অপেক্ষা করার পর অস্থির হয়ে উঠল। কি ব্যাপার, লুসি আসছে না কেন! এমন সময় লুসিদের বাইরের দরজায় খিল পড়ল। বুকের ভিতরটায় দড়াম্ করে একটা শব্দ উঠল, আঁতকে উঠে চোখ বুজল ছকু। এ অবস্থা কিসের ইঙ্গিত দেয় সেটা সে ভাল করেই জানে। এত তাড়াতাড়ি হেরে গেল লুসি! কল্পনার সুন্দর জগতটা মুছে গিয়ে মনের উপর নেমে এল অন্ধকার, কী ভীষণ শক্তি নিয়ে এই কদিন সে ঘুরেছে মাইলের পর মাইল, কিন্তু এই মুহূর্তে এই ঠাঁইটুকু ছেড়ে যাওয়ার মত শক্তিও তার নেই, আবার বসে থাকার মত দুঃখও আর নেই।

তবু শুধু অবুঝ আশাতেই আরো কিছুক্ষণ বসে রইল। কি হবে পালিয়ে গিয়ে, নতুন জীবনের প্রয়োজন শেষ করে দিয়েছে লুসি। এখন বুঝতে পেরেছে বিকেল বেলাকার কথাগুলো ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাড়িতেই ফিরে যাবে, ফড়েদারি করবে। যতই জঘন্য হোক, ঐ কাজই সে করে যাবে। অস্থিরতায় ছকুর বুকখানা যেন বোশেখের মাঠের মত ফেটে গিয়ে হা হা করতে লাগল।

হঠাৎ কানে এল লুসির মায়ের গলা। ক্ষীণ হলেও শব্দ স্পষ্ট।

'মজা লোটো, একেবারে নতুন। বখশিস্ চাই কিন্তু।'

কান খাড়া রেখে কথাগুলো গিলতে গিলতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ছকু। রাস্তা থেকেই দেখা গেল আলো নিভিয়ে নিজের কামরায় খিল দিচ্ছে লুসির মা।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্তের নীরবতা। তারপরেই শোনা গেল সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠস্বর। 'আরে অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

শব্দের উপর কান রেখে মনে মনে ভয়ঙ্কর ছবিটা তৈরি করে চলল ছকু। লোকটা এগিয়ে এসে নিশ্চয়ই ওকে ধরবে। আর স্থির থাকতে পারল না ছকু, পায়ে পায়ে চোরের মত এগিয়ে এসে জানালার কাছটিতে দাঁড়াল। ছোট ফাঁকটুকুর ভেতর দিয়ে ঘরের ভিতরটা নজরে এল।

ঘরময় এদিক ওদিক করতে করতে ঘেমে উঠেছে লুসি। ধরতে ব্যর্থ হয়ে রেগে যাচ্ছে লোকটা। দাঁতের পাটিগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে।

আত্মরক্ষার জন্যে বাধা দিল লুসি। এখনো নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি। এ লড়াই ভালোবাসার জন্যে। অদ্ভুত আনন্দে সারা মনটা ভরে উঠল ছকুর।

কিন্তু এ কি! বুড়োটা ধরে ফেলেছে লুসিকে। শুরু হয়ে গেছে ধ্বস্তাধ্বস্তি। বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা দ্রুতগতিতে ওঠানামা করতে থাকে, পেশিগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। জানালাটা লাথি মেরে ছাড়িয়ে ফেলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ বুড়োটা লুসিকে ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করে বসে পড়ে মেঝের উপর। 'হাতটা এমন করে কামড়ে দিলি, বেশ্যা মাগি।'

চিৎকার শুনে খিল খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে লুসির মা। স্তব্ধ পরিবেশটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। 'খিল খোল খচ্চরী, আমিই মজা দেখাচ্ছি তোকে। নিয়ে আয় তুই একশ'টা টাকা, নিয়ে আয়। কোন নাঙের কাছ থেকে আনবি।'

রক্তাক্ত হাতেই এগিয়ে এসে খিলটা খুলে দেয় লোকটা।

প্রচণ্ড আক্রোশে একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে এলো পাথাড়ি ঠেঙাতে শুরু করে লুসির মা। প্রতিবাদ করে না, ছাই এর মত সাদা হয়ে যায় মুখখানা, একেবারে নির্বিকার। দু এক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। বাঁ চোখের ভুরুটা তাল আঁটির মত ফুলে ওঠে। তবুও একটি কথাও বলে না লুসি। আঘাত এমনিভাবে অগ্রাহ্য করতে দেখে খুন চেপে যায় লুসির মায়ের মাথায়। মার থামায় না। মার খেয়ে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে লুসি। চোখের কোন থেকে কয়েক ফোঁটা জল গাল বেয়ে নেমে আসে।

কিন্তু দাউ দাউ আগুনের মত লুসির মায়ের রাগ যেন আরো অনেক তেজে জ্বলে ওঠে। 'পিরিতে মূর্চ্ছা যাও, এখন কল্লা দেখাচ্ছ খান্‌কি।' চুলের মুঠিটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে একেবারে বাইরে এনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। মাটির উপর আছড়ে পড়ে লুসি।

ঘেন্নায় সজোরে দরজা বন্ধ করতে করতেই আরো খানিক মনের ঝাল মিটিয়ে নেয় লুসির মা। 'যা খান্‌কি, এবার তোকে বারো জনে লুটুক,

আর না হলে তোর সেই মজা নাগুয়ের কাছে চলে যা। জানব তুই মরে গেছিস্।

এখানের এত উত্তেজনা কিন্তু সাড়া জাগায় নি পাড়ার কোথাও। যে যার খদ্দের নিয়েই ব্যস্ত।

লুসির মা থাকার জন্যেই তীব্র উত্তেজনাকেও সংযত করতে বাধ্য হয়েছিল ছকু। কিন্তু এখন আর চিন্তার কোন অবকাশ নেই, বিশেষ করে এই মুহূর্তে। তৎপর নেকড়ের মত লুসির যন্ত্রণাকাতর সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে বাঁধের উপর উঠে এল। চলতে শুরু করল দ্রুত গতিতে। পিছনে পড়ে রইল শহরের আঁকাবাঁকা পথ।

সামনের পথটা শহর ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে। এই পথেই চলতে হবে তাকে। অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে আজ তারা এই পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে। আনন্দে পা দুটো নেচে উঠল। ভালোবাসার স্পর্শে নিশ্চয়ই চেতনা ফিরে আসবে লুসির।

পথ বরাবর একটা তারা মাথার উপর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। নাম জানে না ছকু। শুধু মনে হ'ল ওটা যেন এরসাদ মিয়ার মুখ। মনে মনে সালাম জানাল তাকে। এর থেকেও কঠিন লড়াইয়ে এবার তারা জিতবেই।

পূর্ণিমা মামিমা

আমি শান্তি নিকেতনের পৌষ মেলার যাত্রী। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছাতে দেরি করে ফেলেছিলাম। এ সময়টা এমনিতেই বেশ ভিড় হয়। মাইকের ঘোষণা শুনতে পেলাম -- শান্তি নিকেতন এক্সপ্রেস দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে নয় নাম্বার প্লাটফরম্ হতে ছাড়বে। বুঝলাম ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। ছুটতে ছুটতে একটা কামরায় দাঁড়াবার জায়গা আছে দেখে উঠে পড়লাম, ট্রেনও ছাড়ল। সব সীটই ভর্তি। হঠাৎ দেখলাম একটা ব্যাগ সরে গেল, পূর্ণিমা মামিমা আমায় ডাকছেন বসার জন্য। এ যেন স্বর্গ হাতে পাওয়া, কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি বসে পড়লাম।

ছোট প্রশ্ন করলেন মামিমা, "কি করছ এখন?"

"কী আবার করব, এখনো বেকার।"

"যাচ্ছ কোথায়?"

"শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা দেখতে।" এবার আমার পালটা প্রশ্ন, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম বালিগঞ্জে, এখন বাড়ি ফিরে চললাম।"

সামান্য কটি কথা কিন্তু মিষ্টি হাসিতে ভরা। যতদিন যতবার দেখেছি ততবারই কথার শেষে হাসিমাখা মুখখানি সবার থেকে আলাদা হয়ে ধরা দিয়েছে।

স্মৃতির ক্যানভাসে দীর্ঘ সাত বছর আগেকার ছবিগুলো নতুন করে ভেসে উঠল। মনে পড়ল অন্য এক পৌষের সকালের কথা। জানালার ফাঁক

দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম একজন মেয়ে বাসন মাজছেন। আশ্চর্য সুন্দর কণ্ঠস্বর, বাসন মাজতে মাজতে আপন মনে হরিনাম করছেন। সাত সকালে খানিক দূর হতে ভেসে আসা গান মনকে নাড়া দেয় বৈকি। পুকুরের চারপাশটা গাছগাছালিতে ভরা, নির্জন পরিবেশ। শহরের ব্যস্ততা এখানে নেই, হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এ যেন এক চিত্রার্পিত রূপ। অনুকূল পরিবেশে অনেক সময় অতি সাধারণ জিনিসও অসাধারণ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তাই, সমস্ত কিছু বদলে যাচ্ছে হৃদয়ের আকুলতায়, নামের ভিতর দিয়েই আত্মনিবেদন করছেন পরম দয়িত শ্রীকৃষ্ণের কাছে। আবেগে কাঁপছে স্বর। কৌতূহল বশত পাশের বাড়ির মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যে বিধবা মেয়েটি ঘাটে নাম গান করছেন ওনাকে চেনেন?"

"চিনব না আবার, ও তো পূর্ণিমা, আমার কমল ভাইয়ের বউ।" মুখখানা হাসিতে ভরে গিয়েও আবার কেমন যেন মলিন হয়ে উঠল। "জান বাবা, আমার কমল ভাই চার বছর হল মারা গেছে। দুটিতে মাণিকজোড় ছিল।"

চোখের জল মুছে কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। "আমাদের কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্য একটু বাদেই ও এখানে আসবে। ওর যে দয়ার শরীর, আমি আর তেমন কাজ করতে পারি না জেনে ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখবে ওর মত সরল মেয়ে আর হয় না।"

সম্পর্কটা কি হবে তা মাসিমা আগেই ঠিক করে দিয়েছিলেন। দেখলাম উনি এসেই আঁটি সাঁটি করে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজে লেগে পড়েছেন। কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলে উঠান ধুতে শুরু করেছেন। সামনা সামনি দেখার আশায় বাইরে এলাম। দেখলাম ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। যত্নের অভাবে শরীরের সৌন্দর্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার চুল জট পাকিয়ে আছে। হাসতে গেলে ঠোঁটে এবং চোখের কোণে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মনের অতল গভীরে একটা চাপা বিষণ্ণতা কি যেন হারিয়ে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুখের হাসিটা সব সময়েই লেগে আছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈর্ষণীয় সরলতা।

প্রথমে আমিই কথা বললাম, "আপনি আজ সকালে কি সুন্দর নাম গাইছিলেন। খুব ভাল লাগছিল।"

কেবল মাত্র একবার আমার অচেনা মুখটার দিকে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমরা যে বৈষ্ণবের মেয়ে গো, আমাদের এখানে এবাড়ি ওবাড়িতে যত মেয়ে আছে সবাই নাম গান করে। আমিও করি।"

"আচ্ছা, আপনি ছোট বেলা থেকেই কি ঠাকুরের নাম গান করতেন?" "মরণ, আমি ঠাকুরদের নামগান করতে যাব কেন, ও যখন বেঁচেছিল তখন গাইতাম রেকর্ডের গান। বাংলা, হিন্দির টপগানগুলো যখন মাইকে বাজত আমি শুনে মুখস্থ করে নিতাম, তারপর মনের সুখে চুটিয়ে গাইতাম।"

"উনি কিছু বলতেন না?"

"সে শালা বারণ করবে কি, ইচ্ছে হলেই গাইতাম। সে হাসত, বলত আর একখানা গা তো শুনি।" "লোকে কিছু বলত না?" "হাঁ, বলত বৈকি, বলত ও হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার দজ্জাল মেয়ে, লজ্জা শরম কিছুই নাই।" এবার উনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা তুমিই বল, দু একটা গান গাইলেই কি মানুষ খারাপ হয়ে যায়? তোরা যে চিটিংবাজি করে দিন কাটাস্ সেটা বুঝি ভাল।"

মোট কথা পূর্ণিমা মামিমা তখন নদীর মত আপন বেগে পাগল পারা। সভ্য সমাজে থেকেও মার্জিত হওয়ার কোনরকম প্রয়োজন অনুভব করেন নি। গ্রাম্যজীবনের সেই জেদি মনোভাবটাই বরাবরের জন্য থেকে গিয়েছিল। প্রতি দিনের আলাপ চারিতায় আমি ওনার সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানতে পারতাম। অপূর্ব সরলতায় উনি নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতেন, বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করতেন না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি তো বাঁকুড়ার মেয়ে, জেলা পার এতদূর এই বীরভূমে বিয়েটা হ'ল কি করে?"

সেদিন উজ্জ্বল হাসিতে ওনার মুখখানা ভরে উঠেছিল। একটা প্রশ্নেই খুলে গেল মনের দুয়ার। অতীতের ঘটনাগুলোকেস্মৃতির রঙ তুলি দিয়ে আঁকতে লাগলেন আমাদের সামনে। শুনতে লাগলাম এক মনে, বর্ণনার মাধুর্যে সব কিছু যেন জীবন্ত। এ জেলায় কেমন করে এলেন সেই বর্ণনাই সেদিন

শোনাচ্ছিলেন। বললেন — তখন আমার বয়স বছর চোদ্দ। আমার দাদা আর ও ছিল বাঁকুড়া ইরিগেসন ডিপার্টমেন্টের নাইটগার্ড। ও দাদাকে জানিয়েছিল ওর বউ ওরে ছেড়ে চলে গেছে। সে আর কোনদিন ফিরবে না। অনেক চেষ্টা করেছে ফিরিয়ে আনার জন্য কিন্তু সব বিফল। সে তার বাল্যকালের প্রেমিক ছাড়া কারও ঘর করবে না। দাদাকে ওর জন্য মেয়ে দেখে দিতে হবে। ও নতুন সংসার পাতবে। দাদা বাবার সঙ্গে গোপনে আলোচনা সেরে ওকে ডেকে এনে আমাকে দেখাল। রেগে গেলাম আমি। "এই শালা বুড়ো, আমাকে নিয়া যাবি কোথায়? আমি পাবড়া দিয়া তোর মাথা ফাটাইয়া দিব। এই বেলা পালায়ে যা।"

ও বুড়া তখন আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছিল। বলল, "সবার মত পেলে তোরে আমি নিয়ে যাব।"

"আমি ছিলাম সবার ছোট, বেশ আদুরে। তখন আমার চেহারাটাও ছিল সুন্দর। সেদিনের চেহারার সঙ্গে বর্তমানের চেহারার কোন মিল নেই। এখন তো অর্ধেক হয়ে গেছে।"

গাড়িতে এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন মামিমা। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় থাক"।

বললাম, "হাজরা পার্কের কাছে।"

"কেমন লিখছ গল্প কবিতা?" আমি নীরব। আমার নীরবতা লক্ষ্য করে উনি বলে চললেন, "তোমরা সব বুদ্ধি করে নকল গল্প লেখ। সত্যিকারের গল্প লিখতে পার না। আমাকে নিয়ে লেখ, লোকে জানবে অজানা এক জীবনের ইতিহাস।"

বললাম, "আপনার জীবনটাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যে অতবড় লেখক নই।"

"বেশ তবে লিখতে যেও না। তোমাদের মত লেখাপড়া জানলে আমি নিজেই আমার জীবনের সব কথা লিখতাম।"

বুঝলাম মামিমা আগের মতই এখনও জেদি।

অতীতের সেই কথাগুলো আবার নতুন করে জেগে উঠল। এ কথা ওনার বিয়ের আগেকার কথা। "আমাকে দেখে ওর খুব ভাল লেগেছিল। ভালবাসা কারে বলে সে সব আমি জানতাম না। আমি গোঁ ধরলাম — বাবা, মা, দাদা বৌদিদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমি তখন সারাটা দিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম। গরমের দিনে ভোরের বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকত আমি তখন একা ঘোষেদের খেজুর গাছে উঠে কাঁদি ঝাড়া দিয়ে খেজুর পাড়তাম। কেউ আমাকে ধরতে পারত না। কখনো জাল নিয়ে খালের জলে মাছ ধরতে যেতাম। আমের দিনে লোকের গাছ থেকে পাকা আম চুরি করতাম। এ সবের মায়া কি সহজে কাটান যায়? শেষ পর্যন্ত ওর সাথে দাদা বিয়েটা দেওয়ালো। কতবার ইরিগেসন বাংলোয় ওর ঘর হতে বার হইয়া পাঁচিল টপকাইয়া রাতের অন্ধকারে সোজা বাড়ি পালিয়ে এসেছি। পরের দিন নিতে এলে বলেছি— "এ শালা, তোর সাথে আমি যাব না। তোর বাড়ি ভুতের বাড়ি, একটা ছোট ঘরে লোক নাই, জন নাই, অমন একা একা থাকা যায়।" কত সাধাসাধি করে নানান জিনিস দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ও আমাকে ফিরিয়ে আনত। মেয়েটা জন্মাবার পরেও কিন্তু আমার দামালপনা এতটুকুও কমে নি। আবার নতুন বউ হারাবার ভয়ে ও আমাকে কিছু বলত না, খুব ভালবাসত। ধীরে ধীরে আমিও মানুষটাকে ভালবাসতে শিখলাম।"

দেখতাম কথা বলতে বলতে ওর সারাটা মুখ আনন্দে ভরে উঠছে। কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। "রাতের কাহিনি শুনবে, রাতে আমরা দুজনে মিলে অফিস বাংলোয় যে সব আম, জাম, কুল পেঁপের গাছ ছিল তাতে ফল হলে সামান্য কিছু রেখে সব পেড়ে নিতাম। অফিসার বাবুরা এ সব কিছু বুঝতে পারতেন না, ভাবতেন হনুমানে নিয়ে গেছে। আমি ওকে বলতাম, সরকারি গাছের ফল শুধু বাবুরাই খাবে কেন। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের পয়সা নেই কিনে খাবার, চাইলেও দেবে না। অতএব চুরি কর, এতে পাপ নেই।"

প্রতিদিন পূর্ণিমা মামিমা নিজের জীবনের কথাগুলো অত্যন্ত সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গি করে বলতেন। শুনে মনে হ'ত যেন ছবি দেখছি।

একবার বললাম, "বাঁকুড়া থেকে এ জেলায় এলেন কীভাবে সেটা তো শুনলাম না।"

"কেন গো এ জেলাতেও ইরিগেসন অফিস আছে, নিজের ভিটে ছেড়ে কেউ কি বাইরে থাকতে চায়। ও দরখাস্ত করল বদলির, মাস কয়েক পরে মঞ্জুর হতেই চলে এলাম শ্বশুরের ভিটেয়। এসে দেখলাম পাঁচ ভাই সবাই আলাদা। কেউ কাওকে দেখতে পারে না, সামান্য অছিলাতেই তুমুল ঝগড়া লেগে যায়।"

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা বাঁকুড়ার লোকে যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা কি এখানেও বলেন?"

"প্রথম প্রথম আমি বাঁকুড়ার ভাষায় কথা বলতাম, ওরা বুঝতে পারত না। পাড়ার লোকেরা আমাকে নিয়ে ছড়া বানাত। আমিও মনের সুখে গালাগাল দিতাম। ওরা বুঝতে পারলে চুলের মুঠি ধরে আমাকে বাঁকুড়ায় চালান করে দিত। এদের ভাষা এখন বলি, কিন্তু বাঁকুড়ার টান রয়ে গেছে।" দেখলাম বাঁকুড়ার ভাষা বলার জন্য এখনও তিনি গর্ব অনুভব করেন।

আর একদিন বিকালে শোনাল যাত্রা শুনতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার মজার কাহিনি। কলকাতার অপেরা দল যাত্রা করবে। টিকিটের দামও নেহাত কম নয়। দুজনারই ঝোঁক হল যাত্রা শুনতে যাবার। ও আগে ভাগেই দুখানা টিকিট কেটে এনেছিল। যাত্রার দিন একসঙ্গে ঘর থেকে বের হলাম। কিন্তু প্যাণ্ডেলে ঢোকার সময় ছাড়াছাড়ি হ'ল। মেয়েদের সিট একদিকে, পুরুষদের অন্যদিকে। মুখ ব্যাজার করে ও অন্য গেট দিয়ে ঢুকল। একসঙ্গে বসে যাত্রাশোনা আর হ'ল না। যাত্রাপালা তখন বেশ জমে উঠেছে, এই বুঝি যুদ্ধ লাগল। ঠিক সেই সময় যারা টিকিট কাটতে পারে নাই, প্যাণ্ডেলের বাইরে ছিল তারা বাঁধভাঙা বন্যার মত ঢুকতে লাগল। পুলিশ তাদের রোখার জন্য লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাতে লাগল। কারা যেন আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে মারের ভয়ে সবাই ছুটে পালাচ্ছে। বাড়ির পথ অনুমান করে আমিও ছুটলাম। কিন্তু কোন দিকে যে যাচ্ছি তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে হয়রান। শেষে পাড়ার কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল, ভয় কাটল।

কিন্তু পাড়ার পথে ওরে কোথাও দেখলাম না।

প্রায় অর্ধেকের বেশি রাস্তা চলে এসেছি, এমন সময় দেখলাম ও বাড়ির দিক থেকে আসছে। আমারে খুঁজতে খুঁজতে চলেছে। ওরে পার হইয়া এলাম, খুব মজা হচ্ছিল আমাকে দেখতে পায় নাই বলে। অন্য মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়ল। চিৎকার করে ডাকল, "এ মুখপোড়া, বউ ফেলাইয়া যাস্ কোথায় রে। এই নিয়ে যা তোর বউকে।"

ও ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, মুখে হাসি ফুটল, "তোরে পাইয়া আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। প্যাণ্ডেলের ভিতর যা মারামারি, পেটাপেটি, দুজনায় বেঁচে ফিরলাম এটাই ভাগ্যি। আর কোনদিন যাত্রা শুনতে যাব না।"

"তুমি যে আমারে ফেলাইয়া পালাইলে বড়।"

"মায়ের ভয়ে পালিয়েছিলাম। আমি বাঁচলে তবে তো বউ।"

"বাঃ; তোমার কথাগুলো কী সুন্দর, আমি মরে গেলে তুমি তাহলে খোঁজ করে আবার একটা বউ আনতে ছুটতে।"

কোন উত্তর না দিয়ে ও বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তুমি শালা খুব স্বার্থপর। একটা লাঠি পেলে এখনি তোমারে পিটাইয়া দিতাম।"

"বড় ভুল হয়ে গেছে, চল বউ ঘর চল।" ছুটে এসে হাতটা ধরে ফেলল। বাকি পথটায় ও একবারের জন্যও হাত ছাড়ে নি। কিন্তু আমার মনটা তখনও ফুঁসছে। বচন দিতে শুরু করলাম, "খেয়াল আছে তোমার, তুমি আমার থেকে বারো চোদ্দ বছরের বড়। বুড়োর ছুকরি বউ হলে সবাই একটু আধটু আদর করে। তুমি আমার জন্য কি করেছ।"

আকাশে নবমীর চাঁদ। ঘাসের উপর জমা শিশিরগুলো চিক্ চিক্ করছে। দেখলাম, ওর মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। আমার হাতখানা ছেড়ে দিল। "আমি বড় হতভাগা রে বউ। প্রথম বউটারে ভালোবাসতে গেলাম। বিনিময়ে সে আমাকে মারধর করে গালাগাল দিয়ে পালাল। কোন দিন সে

আমার হয় নি। অনেক কষ্টে তোরে পেলাম। তুইও দেখছি আমাকে ঘেন্না করিস্।" আমি যেই জোর করে ওর হাতটা ধরলাম, অমনি সব খেদভুলে গিয়ে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সেদিন বুঝেছিলাম ভালবাসা বয়স মানে না, জাত মানে না, প্রকৃত ভালবাসা সব ভেদ মুছে দেয়।

পূর্ণিমা মামিমা অল্প শিক্ষিতা। মাস মাহিনা এবং মৃত স্বামীর সুবাদে উইডো পেনসন নেবার সময় কোনমতে সইটা করতে পারেন। ওনাকে যত দেখতাম ততই মনে হত জীবনটা ওনার আলোছায়া মাখা কবিতার মত।

মেয়ের পর এক এক করে আরও দুটি ছেলে জন্মাল। সংসারটা যখন সুখের হাত ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছিল তখনই এল বিপর্যয়। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো ওর স্বামী। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল জ্ঞাতি গোষ্ঠী। ওদের সুখটা অপরের সহ্য হবে কেন। নরোত্তম বলে ওর মেজ ভাসুরের ছেলে গুণ্ডাবাজি করে দিন কাটাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে অকথ্য গালিগালাজ এবং মারধর করে ভিটেছাড়া করাই ছিল তার কাজ। আপন ছোট ভাই এবং জ্যাঠামশাইকে এই ভাবে তাড়িয়ে এবং জালিয়াতি করে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করেছিল। এবার হাত বাড়াল পূর্ণিমা মামিমাদের দিকে।

একদিন বর্ণনা করছিল ঐ মাতালটার কার্যকলাপ। বৈশাখের পড়ন্ত বিকালে ওর চোখেমুখে ফুটে উঠল মধ্যাহ্নের বহ্নিদীপ্তি। "শোন তবে ঐ মানুষটার দস্যিগিরির কথা। পুকুরে সামান্য ঘাট ব্যবহার করা নিয়ে ঝগড়া শুরু হতেই ও ছুটে এসে আমার রুগ্ন শয্যাশায়ী স্বামীটাকে মারল। সে জানলই না কেন তাকে মারা হচ্ছে। যে লোক দুদিন বাদে মারা যাবে তাকে এভাবে বাড়িতে এসে মারাটা সহ্য হ'ল না আমার। একটা বড় রামদা নিয়ে রুখে দাঁড়ালাম। 'তোকেও আমি ছাড়ব না। ও মরার আগে তোকেই আমি শেষ করব।" ভয় পেয়ে প্রাণ নিয়ে পালাল।

ট্রেন দেখতে দেখতে ব্যাণ্ডেল পেরিয়ে এল। মামিমা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবার বললেন, "তুমি তো অনেক কিছুই জান না, সব কথা জানাতে পারি যদি তুমি কথা দাও।"

"কী কথা দেব বলুন।"

"আমি যাদের কথা বলব তোমার কলম দিয়ে তুমি তাদের অন্যায়ের মুখোশটা খুলে দেবে, পারবে না?"

আমি জানি আমার সে ক্ষমতা নেই, তবুও বললাম, "চেষ্টা করব।"

"তোমার মামা মারা যাওয়ার পর ঐ নরোত্তম চৌধুরী আমার সই জাল করে বাইশ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। কেস্ করে কি করব, তিনটে ছেলে মেয়েকে কেটে ফেলার ভয় দেখায়। বিপদে বিশ্বম্ভর ঠাকুরপো পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল কিন্তু এক বছর পরে চাইতে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। বলল, "কে তোর টাকা নিয়েছে, প্রমাণ কই। আমি তোর টাকা ধার নিয়েছি, এ কথা লোকের কাছে বললে মাথা ফাটিয়ে ছাতু করে দেব।"

বংশের লোক হয়ে দুজনে মিলে এমন সর্বনাশ করবে ভাবতেও পারি নি। না খেয়ে না পরে তনুর বিয়ের জন্য ঐ টাকাটা রেখেছিলাম। আমি তো অসহায়, কিন্তু তুমি দেখ ওরা একদিন ঈশ্বরের রোষে ছারখার হয়ে যাবে। এটা ঘটবেই, এত অধর্ম ভগবান সইবে কেন। এখন আবার নতুন করে বলতে শুরু করেছে — বড় বাড় বেড়েছে, এবার ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারব। কী যে ঘটবে জানি না।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বকতে শুরু করলেন, "তোমার মামা মারা যাওয়ার পর বিশ্বম্ভর চৌধুরী আমার যাতে চাকরিটা না হয় সেজন্য দম থাকতে কম করে নি। প্রতিদিন অফিস গিয়ে নানা রকমের কুৎসা প্রচার করেছে আমার নামে। আমি চাকরি না পেলে ওর খুব আনন্দ হ'ত। কিন্তু তা হ'ল না, অফিসের লোক ওরে পাগল বলে খেদায়ে দিল। তারা নিজেরাই আমার জন্য ফর্ম ফিল আপ থেকে শুরু করে সব কিছু করে দিল। অফিসের বড় বাবু বললেন, "আমরা সব বুঝে গেছি। তোমার কোন ভয় নেই, আমরা আছি, আমরা তোমাকে দেখব।" অফিসের সবাই আমার বড় আপন।"

"আচ্ছা মামিমা, এখনো কি আপনি দুরন্তপনা ভালবাসেন?"

প্রশ্ন শুনে হাসলেন মামিমা। "কেন থাকবে না, মরার আগে পর্যন্ত ও জিনিস থাকবে। এ বছর বাংলোর গাছ থেকে এক থলে পাকা কুল পেড়েছিলাম। অফিসের ছাদে রোদ বেশি। ওখানে শুকনা করলাম। পরে

ঘরে এনে আচার বানিয়ে বাবুদের কোয়াটারে দিয়ে এলাম। সবাই খুশি। আম কিংবা আমলকী পাড়তে এখন আর গাছে উঠি না। বাবুদের যখন আগেকার দিনের গাছে ওঠার কথা শোনাই তখন তারা খুব হাসেন।"

আমরা দুটি প্রাণী যখন অতীত এবং বর্তমান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম তখন ট্রেন একটার পর একটা ষ্টেশন পেরিয়ে চলেছে। "আচ্ছা মামিমা, আপনি কি ইলেকট্রিক লাইনের পোষ্টটা বদলাতে পেরেছিলেন?"

"পারব না মানে, আমি ভাল পোষ্টের দাম জমা দিলাম, খারাপ পোষ্ট নেব কেন। ওরা পাঠিয়েছিল এমন খুঁটি যা সহজেই ভেঙে পড়বে। ওদের পুঁততে দিলাম না, ফেরত পাঠালাম। অফিসে নালিশ করলাম। সেই খুঁটির পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত ভাল সিমেন্টের খুঁটি লাগাল।"

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনি এখনও ভাগবত শুনতে যান?"

"আমাদের বৈষ্ণবপাড়ার অনেক মেয়ে যায়, আমিও যাই। গান শুনি, প্রসাদ পাই। রাত দশটার মধ্যে বাড়ি চলে আসি।"

"এ সব শুনতে গিয়ে কিছু পেয়েছেন বলে মনে হয়?"

"কৈ কিছুই তো পাই নি। সময়টা কাটে এই পর্যন্ত। সবাই দেখি সংসারে নানা জ্বালায় জ্বলছে। কেউ বলে না আমি ভাল আছি। ভাগবত ত্যাগের কথা বলছে। আমি কিন্তু আমার তিন ছেলেমেয়ের মঙ্গলের চিন্তা ছাড়া ভগবানের জন্য বেশি সময় দিতে পারি না। না গেলে লোকে মন্দ বলবে তাই যাই।"

প্রকৃতির উপর অপরাহ্নের ছায়া। বর্ধমানে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য থামল। মামিমা চা কিনে আমাকে দিলেন, নিজেও নিলেন। গাম্ভীর্যের কোন ভাব ওনার চোখে মুখে নেই।" এইবার আপন জনের মত উপদেশ দিলেন, "আমি বলি তুমি ছোটখাট একটা কারবার খোলো। চিরকাল টুইশানি করে চলতে পারে না।"

কী করে বোঝাব এ যুগে চাকরি পাওয়া বা মূলধন যোগাড় করে ব্যবসা করা কত কঠিন, সান্ত্বনা শুধু একটাই, আমাদের মত লেখাপড়া জানা

লোকেদের সাড়ে নিবানব্বই জনই বেকার। বললাম, "একেবারে বেকার নয়। ছোটখাট একটা পোলট্রি করেছি। কোন মতে চলে যায় আর কি।"

এবার হাসতে হাসতে বললেন, "চুল পাকতে গেল, সংসারী হবে কবে?"

"মনের মধ্যে ওসব স্বপ্ন নেই। বোনটার সংসার করে দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ। আমার কথা থাক, আপনি বরং আপনার কথা বলুন।"

মুখখানা কেমন যেন মলিন হয়ে উঠল মামিমার। "আমার যা বলার সবই তো বলেছি। আর নতুন করে কি বলব। সংসারে আসার অনেক পরে আমাদের ভালোবাসার জন্ম। তোমার মামাকেই তো মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু সে চলে গেল। সেই ফাঁকা জায়গাটায় স্বয়ং গোপীনাথকেও বসাতে পারি নি। মনে মনে কৃষ্ণের ছবিটা আঁকতে গেলে তার মুখখানিই ভেসে উঠে। আমি এক পাপিষ্ঠা, তাই বুঝি অমনটা হয়। তার কথা মনে হলেই মনটা হু হু করে উঠে, নাম গান করি ভুলে থাকার জন্য কিন্তু ভুলতে পারি না।" মামিমার চোখে জল।

বুঝলাম ভালবাসার জগতে সংসারের হিসাব নিকাশ তুচ্ছ হয়ে গেছে, এমন কি আরাধ্য দেবতাও। জীবনে কি চাইতে হয়, কী পেতে হয় তা আমরা জানি না। কিন্তু ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদন করে জীবনপূজা সমাপ্ত করে। ট্রেন অজয় নদ পার হয়ে বোলপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর কিছুক্ষণবাদেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। মামিমাকে মনে হ'ল স্নিগ্ধ এক বেলফুল, বীরভূমের আলোয় বাতাসে আপন মনের সৌন্দর্য এবং সুরভি ছড়িয়ে দিয়ে প্রেমের চিরন্তন জগতটাকে ভরিয়ে রেখেছে।

নানা রঙের শাপলা শালুক ফুটে আছে বিলের জলে। এই জলের আয়নায় লজ্জাবতী মেয়ের মত ঐ নীল আকাশটা মাথার উপর পাতলা মেঘের আবরণ সরিয়ে আপন মুখখানি দেখে। জল পায়রার আনন্দ সুন্দর চোখে ফুটে ওঠে মায়াময় নির্জন পৃথিবীর অদ্ভুত কারুকার্য। চারপাশ ঘিরে প্রসন্ন নীরবতা। এসব এরা দুজনে মিলে দেখে। দেখতে ভালোবাসে বলেই আসে। ওদের জীবনে এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। প্রথম আবিষ্কারের গৌরবটুকু অবশ্য কৌশিকের। এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে মিতু, কারণ কৌশিক তাকে ডেকে না আনলে সে কোনদিনই এখানে আসতে পারত না।

মাঠের মাঝে এক সার ইউক্যালিপটাসের পাহারা ঘেরা এই জায়গাটা নতুন হস্‌পিটাল ভবন থেকে খুব বেশি দূরত্বের মধ্যে নয়। এক ডাকেই সাড়া মেলে। সে কারণে এখানে আসার জন্য উভয়ের বাবা মার দিক থেকে কোন রকম নিষেধ বা আপত্তি থাকে না। এই সময়টার জন্য যে স্বাধীনতাটুকু পায় তাতেই ওরা তৈরি করে খেলাঘরের পৃথিবী। স্কুলের ছুটির পর একজন আর একজনকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে করতে আসবেই। দুজনায় বসবে একটা উচু জায়গায়।

অন্য দিনের মত আজও ওরা আসে একটু দেরিতে। এই দেরিটুকুর জন্য একা একা ভীষণ অসহ্য লাগছিল মিতুর। কৌশিক আসতেই ক্ষোভের

সঙ্গে জবাব চাইল, "এতো দেরি করলি যে?"

"এমনি দেরি হয়নি, ভীষণ একটা মজার কথা শুনলাম। হাসপাতালের চৈতালিকে নাইটগার্ড শিবু নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"কেন পালাল?"

"তুই কি বোকা রে, কেন বলে কারণটা জিজ্ঞাসা করছিস্, শুনলাম ওরা বিয়ে করবে।" এমন একটা দারুণ মজার খবর দিয়ে সব জান্তার হাসি হাসল কৌশিক।

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে উঠতেই মিতু বলল, "তাহলে ঐ জলপায়রা দুটোর মত ওরাও ভালবেসে ঘর বাঁধবে বল্।"

যে চৈতালি এবং শিবুকে নিয়ে এই আলোচনা তারা কিন্তু বর্ত্মানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ত্রিসীমানায় নেই। তবুও আজগুবি মন্তব্য এবং সরস আলোচনায় সবাই যেন যৌবনের খুব কাছাকাছি পৌছাবার চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। তফাৎ শুধু এক জায়গায়, যাদের বয়স বেশি তারা বয়সটা কিছুটা কমিয়ে এনেছেন, আর যৌবন আসে আসে এমন যারা তারা একলাফে এক বেলাতেই যৌবনে পৌছে গেছেন। আর একেবারে দশ এগারোর কিশোর যারা তারা কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে— রুদ্ধ অজানা রহস্যের চাবিকাঠি, তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। ঘটনার ঢেউ এদের মনের তটেও যে আছড়ে পড়েছে দুজনের আলোচনাই তার প্রমাণ দেয়।

অল্প কথায় ঘটে যাওয়া কাহিনিটা এইভাবে সাজানো যায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুইপারের কাজ করত বাতাসী এবং তার উঠতি বয়সের মেয়ে চৈতালি। চৈতালির রূপ খুব নজরধরা না হলেও যৌবন মাধুর্যে শরীরটা খুব নজরধরা হয়ে উঠেছিল। এই সহজ-সত্যটা সবাই যেন হুড়মুড় করে আবিষ্কার করে ফেলল। এতদিন কিন্তু চৈতালিকে কেন্দ্র করে মাঠের মাঝে গুটিকয় মানুষের ছোট এই দ্বীপটিতে উতল দখিনা বাতাস বয়ে যায় নি। সে কারণে চৈতালি এবং নাইট গার্ড শিবুর মধ্যে প্রথম কদম ফুল ফোটার মজাদার খবরটা কারুর কাছে পৌছায় নি। খবরটা ছড়িয়ে দিল চৈতালির মা বাতাসী নিজেই। হাঁকডাক করে, কান্নাকাটি করে, নিজেই নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে হাসপাতালের সব

লোকজন জড়ো করে গালাগাল দিতে লাগল। "সারাটা পৃথিবী খুঁজলে আমি যে পোড়ামুখীকে আর পাবো না গো। সে পোড়ামুখী যে গোপনে পিরিত করে পাইলে গ্যাছে শিবে ন্যাকাটার সঙ্গে, ওদের যে রেজেস্‌টারিও হয়ে গেছে গো। ঝাঁটা মারি অমন লাভ ম্যারেজের মাথায়।"

বাতাসী মনে করেছিল তার দুঃখে সবাই একটু চোখের জল ফেলবে কিন্তু সকলকে মুখ টিপে হাসতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে পালাল নিজের কোয়াটারে। ভেতর থেকে সশব্দে খিলটা এঁটে দিল।

সবাই জানল চৈতালি শিবুর সঙ্গে ভালোবাসা করে কেটে পড়েছে। কিন্তু তারা কোথায় পালাল তা কেউ জানার চেষ্টাও করল না। নগদ লাভ হতে বঞ্চিত হল বাতাসী। কারণ মেয়ের প্রতিমাসের টাকাগুলো সে নিজেই হাতিয়ে নিত, এখন আর তা সম্ভব নয়।

শুধু মিতুর বাবা কৌশিকের বাবার সঙ্গে ওদের অনুপস্থিতিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসলেন। কারণ এঁরা উভয়েই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক হওয়ায় পরিচালন দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে দুজনেই আশাবাদী ছিলেন ওদের ফেরার ব্যাপারে। ওরা ফিরবে বিয়ের ব্যাপারটা ভালোভাবে মিটিয়ে নিয়ে। ওরা ফিরবেই কারণ এ বাজারে কেউ চাকরি ছাড়বে না।

এতক্ষণ মুখ খোলে নি কেউ। দুজনায় হাসতে হাসতে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ মিতু কৌশিককে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, বিয়ে জিনিসটা নিশ্চয়ই খুব মজার, নাহলে ওরা পালায় কেন?"

"আমি তোর কথার উত্তর দিতে পারব না, বড় হলে যখন বিয়ে করব তখন উত্তর দেব।" কৌশিক দুচোখ বুজে পরম বিজ্ঞের মত বসে রইল।

মিতু বলল, "ওরা পরস্পরকে ভালবাসত। এর বেশি কিছু আমি বলব না।"

এইবার শুরু হল চৈতালির বিষয়টা নিয়ে প্রতিযোগিতা। "নাই বা বললি, আমি তোর চেয়ে বেশি জানি।" সগর্বে জানাল কৌশিক। আজ মিতুকে

অন্য দিনের থেকে যেন কিছুটা আলাদা দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। এবার আন্তরিকতার সুরে প্রশ্ন করল কৌশিক, "আচ্ছা, ওদের চলে যাওয়ার জন্য তোর মনখারাপ হয় না।"

"না, হয় না।"

"কেন রে?"

এইবার মুন্সিয়ানা দেখাল মিতু। "ও বাস্, তুই বুঝি জানিস্ না, ঝাঁট দিতে গিয়ে কতবার রোগীদের দুধ চুরি করে খেয়েছে ঐ মেয়েটা। ঐ নিয়ে বাবা ওকে কতবার বকেছেন। এই রকম নোলাটা কি ভালো!"

"আমার বাবাও কম বকেছেন ঐ শিবেকে। ডিউটি না করে শুধু ঘুম মারবে। সামান্য ফাঁক পেলেই উধাও। প্রয়োজন হলে ডাকাডাকি করলে বেরিয়ে আসবে বাতাসীদের কোয়াটার থেকে। ওকি কম আড্ডাবাজ।"

চৈতালি এবং শিবুর নিন্দায় দুজনেই সোচ্চার হয়ে উঠল। মিতু বলল, "বিয়ে করলে কেউ পালায় নাকি, ওরা এবারেও নিশ্চয়ই কিছু চুরি করেছে।"

"তুই একেবারে কিচ্ছু জানিস্ না, কারুর কিছু খোয়া যায় নি। খোয়া গেলে এতক্ষণে থানা পুলিশ হয়ে যেত।"

শুরু হওয়া তর্ক যুদ্ধে এবার কৌশিক যেন বিজয়ীর মালাটা নিজেই নিজের গলায় পরিয়ে দিল।

অভিমানে রাঙা ঠোট দুটি কেঁপে উঠল মিতুর। "সবজান্তা যেন, বল্ দেখি ভালবাসা কি?"

"সে খুব ভাল, বিশ্বাস কর্।" চট্পট জবাব দিল কৌশিক।

"মিথ্যা কথা, সবাই তাহলে হাসল কেন?" এতক্ষণে কৌশিককে হারাতে পেরেছে মনে করে আপন মনে ভীষণ খুশি হ'ল মিতু।

"আমি ঠিক জানি না, কিন্তু মনে হয় ভালোবাসা জিনিসটা আর পাঁচটা জিনিসের মত নয়।" কিছুটা দমে গেলেও পুরোপুরি হার মানল না কৌশিক।

এমন সময় বিলের অপর প্রান্তে উড়ন্ত এক জলপায়রা চারপাশে চক্কোর দিতে দিতে টুপ্ করে অপরটার পাশে নেমে এল। ঘাড় উঁচু করে দেখতে লাগল সঙ্গিনীকে। আনন্দে মাঝে মাঝে মাথাটা দোলাচ্ছিল। সঙ্গিনীটাও সোহাগ-সুন্দর মুখখানা এগিয়ে দিচ্ছিল ওর দিকে।

পাখি দুটো দেখতে দেখতে আবার ওদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। চারটে চকোলেটের নিজে দুটো নিয়ে অপর দুটো কৌশিককে দিল মিতু। "ওরা খুব সুন্দর, নয়? চেয়ে দ্যাখ দুটিতে কেমন পাশাপাশি আছে।"

কৌতূহল দমন করতে না পেরে এবার কৌশিক প্রশ্ন করে, "রাত্রিতে ওরা কোথায় থাকে বল্ দেখি।"

"এইখানেই কোথাও থাকে নিশ্চয়, কিন্তু দেখিস্ এরাও একদিন চৈতালিদের মত পালিয়ে যাবে।" কী জানি কি ভেবে খুব সহজভাবেই কথাটা বলে ফেলে মিতু।

"না, যাবে না, ঐ লাল শালুকগুলো যতদিন ধরে ফুটবে ততদিন ওরা ঠিক থাকবে। মিলিয়ে নিস্ আমার কথা। হঠাৎ দীঘির বুকে বড় লাল শালুকটা দেখিয়ে বলল, "আমি কিন্তু সাঁতার জানলে ওটাকে তুলে বাড়িতে নিয়ে যেতাম।"

"বারে, ওটা আবার তোলে নাকি, কী সুন্দর দেখতে, তুললে আমি কিন্তু রাগ করব।" প্রবল প্রতিবাদে মিতু মাথা ঝাঁকাল। সঙ্গে সঙ্গে বিন্যস্ত চুলগুলো কাঁধের উপর নেচে উঠে ওকে আরও সুন্দর করে তুলল।

"না রে না, মিছে কথা। কেউ কি কখনো ওটাকে তুলে নষ্ট করে। দ্যাখ্ না, একটা ফুলেই বিলটা আলো হয়ে গেছে।" মিতুকে শান্ত করার জন্য কথাগুলো বলল কৌশিক। সৌন্দর্যের আকর্ষণ দুর্নিবার বলেই বোধ হয় মনের ভাবটুকু গোপন করতে পারেনি। মিতু বাধা দেওয়ায় তার কোন ক্ষোভ নেই। সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর হাসির মতন নিজেকে মেলে ধরেছে ফুলটা। হঠাৎ কি যেন গোপন খুশিতে ভরে ওঠে কৌশিকের মুখখানা। "দ্যাখ মিতু, তোর প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। ভালবাসা ঠিক ঐ ফুলটার মত সুন্দর।"

এবার আর আপত্তি করে না মিতু, খুশি হয়ে কৌশিকের কথা মেনে নেয়।

ধীরে ধীরে বাতাসে নূপুর বাজিয়ে এগিয়ে আসে সন্ধ্যা। দিগন্ত প্রসারিত মাঠের বুকে দু'চোখ মেলে ওরা দেখে পাখি, ফুল আর হৃদয়ের মত জলাশয়। আলোকিত পৃথিবীকে শেষ প্রণাম জানাতে সন্ধ্যাতারার দীপ জ্বেলে দেখা দেয় গোধূলি। নীরব বিষণ্ণতায় অশ্রুমুখী পৃথিবীর এ যেন আর এক রূপ। কুমারীর মত ভীরু বুকে কাঁপছে কত গোপন অজানা ব্যথা।

প্রতিদিনের মত নিয়মিত সময়েই ওরা ঘরে ফিরে আসে।

সারি সারি ইউক্যালিপটাস এতক্ষণে বৈদ্যুতিক আলোর নোলক পরে দেবদাসীর রূপ নেয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি জীবনমৃত্যুর প্রত্যক্ষ পরিণতির উপলব্ধিজাত শাশ্বত সত্যটিকে ব্যক্ত করে মহাকালের মহাতীর্থে পরিণত হয়। জীবন যন্ত্রণার ভিতর এ ছবি আলাদাভাবে দেখতে হয়। এরই মাঝে চৈতালি হয়ত সে পরশমণির সন্ধান পেয়েছিল।

মাত্র দুদিন বাদেই চৈতালিকে নিয়ে শিবু ফিরে এল নিজের ডেরায়। এই দুদিনেই কেমন অপরূপা হয়ে উঠেছে চৈতালি। মাথার সিঁদুর, হাতে শাঁখা। নতুন সাজে তাকে বেশ গর্বিতার মত দেখাচ্ছিল। কারুর তামাসাকে এতটুকুও আমল দিল না। বর্ষার দুরন্ত নদীর মত সমালোচনার শুকনো বালিয়াড়িটা হারিয়ে গেল খুশির বানে। বিগত দুদিন হাসপাতালের কাজে যোগ দিতে না পারার জন্য ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে দুজনে ক্ষমা চেয়ে নিল। বোশেখি ঝড়ে অনেক কিছু ওলট পালট হয়ে যাবার পরেও যেমন সব কিছু দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে, এ ক্ষেত্রেও ঘটল তাই।

রাতের লুকিয়ে পড়া তারারা যেমন দিনের কাছে কিছু বিস্ময় জমা রেখে যায় তেমনি কিছু বিস্ময় জেগে রইল এই দুই কিশোর কিশোরীর মনে।

দিনগুলো চলছিল ছন্দময় গতিতে। হঠাৎ ছেদ পড়ল। কৌশিকের বাবার বদলির আদেশ এল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। গুটিকয় মানুষের এই ক্ষুদ্র জগতটায় খবরটা ছড়িয়ে পড়তে বেশিক্ষণ দেরি হ'ল না। সেদিন বিকালেই

কৌশিকের কাছ থেকে সংবাদটা জেনে ফেলল মিতু। এমন অজ পাড়া গাঁ ছেড়ে ওরা চলে যাচ্ছে শহরে। সেখানে আছে ওদের নিজেদের বাড়ি।

খবরটা শুনেই মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিতুর। বেড়াতে গেল একই সঙ্গে কিন্তু কোন কথাই বলল না, হয়তো বা বলতে পারল না। বহতা নদীর একই ধারা হঠাৎ যেন দ্বিমুখী।

পরের দিন সকালেই মিতুকে খুঁজতে এল কৌশিক। আজ দুপুরের পরেই চলে যাবে ওরা। ওর আসার উদ্দেশ্য ছিল শেষ বিদায়ের আগে দেখা করে যাওয়া। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ কৌশিকের ডাকে ছুটে এল না মিতু। মা ডাকলেন, কৌশিকের আসার কথা জানালেন, তবুও বন্ধ দরজা আর খুলল না। ঘরের মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে মুখস্থ করতে লাগল স্কুলের পড়া। ঠিক এইভাবে মিতুকে কেউ কোনদিন দেখে নি। আহত অভিমানে ফিরে গেল কৌশিক।

আজ খাওয়া দাওয়া সেরে মিতু কোথায় যে সরে পড়ল কেউ তা জানল না। স্কুলেও গেল না। মা এক আধবার জেদি মেয়েটার খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করলেন। শেষে কাছেপিঠে কোথাও আছে মনে করে খুব বেশি খোঁজ করলেন না।

রিক্‌স এসে গেছে। ভীষণ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল কৌশিককে। পিছনের রিক্‌সটায় একা বসল।

বিদায় জানাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সবাই চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। সবার চোখে জল, এতদিনের গোপন ভালোবাসার সম্পর্কটুকু এখন আর গোপন থাকল না। আনন্দে কৌশিকেরও চোখে জল। প্রণাম করতে গিয়ে ডাক্তার বাবুর পায়ের উপর মাথা রেখে কেঁদে উঠল চৈতালি। বেদনার আশ্চর্য ভুবনে নিবিড় আন্তরিকতায় চৈতালি যেন এই মুহূর্তে অনন্যা।

রিক্‌স কিছুদূর চলে যাবার পর বসে পড়ল চৈতালি। "ডাক্তারবাবু গো, আর কি কেউ আমাকে মেয়ের মত ভালবাসবে।" তার করুণ কান্না প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হাসপাতাল চত্বরের বাতাসে।

রুমালে চোখ মুছতে মুছতে আর একবার পিছন ফিরে তাকালেন অমিয়বাবু। এতদিন এই মানুষটার ব্যক্তিত্বের কাছে ষ্টাফের অনেকেই দাঁড়াতে সাহস করে নি। আজ কিন্তু ভেঙে গেছে সর্বপ্রকার মানমর্যাদার লৌহ প্রাচীর। জীবনের গোপন মাধুরী হয়ত এমনি করেই ফুটে উঠে।

রিক্স থেকে বার বার এদিকে ওদিকে, চারপাশে তাকায় কৌশিক। নিদারুণ অস্থিরতায় কী যেন খুঁজতে থাকে। রিক্স জোর কদমে এগিয়ে চলল বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে। কৌশিক কিন্তু মাথাটা একবারও পিছন থেকে সামনের দিকে ফেরাল না। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সবুজ ময়দান, বাড়িঘর, সার সার গাছ, সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

ফুলটা আজও ঠিক তেমনি ভাবে ফুটে আছে। জলপায়রা দুটো চরে বেড়াচ্ছে আগের মতই। একা একা জলে নামতে ভীষণ ভয় করছিল মিতুর। সাঁতার সে জানে, তবুও ভয় করে। ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে, আরও দেরি করলে হয়ত আর দেখাই হবে না কৌশিকের সঙ্গে। শেষে মরিয়ার মত জলে ঝাঁপ দিল। ঐ লাল ফুলটা ভালবাসত কৌশিক। বিদায় বেলায় ওটাই সে তুলে দেবে ওর হাতে। অনেক কষ্টে সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল লাল শালুকফুলটার দিকে। সেটা তুলে নিয়ে ফিরে এল ডাঙায়। জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে জলপায়রা দুটো উড়তে শুরু করেছিল। এইবার ওরা ডানা মেলে ধীরে ধীরে নেমে এল জলের উপর। অবুঝ চোখে ওরা তাকিয়ে রইল মিতুর মুখের দিকে।

এ সব দেখেও আজ আর কিছু ভাবতে পারছে না মিতু। ডাঙায় ফিরে এসেও এখনো ভয় কাটে নি, বুকের ভিতরটা ওঠানামা করছে দ্রুতগতিতে। তবুও সারা মুখে অদ্ভুত তৃপ্তির আনন্দ ফুটে উঠল।

ভিজে ফ্রকটা এঁটে ধরেছে শরীরটাকে। মাথার চুল থেকে এখনো টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে কাঁধের উপর। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এক রকম ছুটতে ছুটতে কৌশিকদের কোয়াটারের দিকে ছুটে চলল মিতু।

থমকে দাঁড়াল ইউক্যালিপটস্ গাছগুলোর কাছে এসে। কেউ কোথাও নেই কেন? তবে কি ওরা চলে গেছে? দূরের পথের দিকে তাকাল। ঐ তো

এখনো দেখা যাচ্ছে রিক্‌সগুলো। কে যেন এখনো মুখ ফিরিয়ে আছে তার দিকে। ও নিশ্চয়ই কৌশিক।

মুহূর্তে সব কিছু কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল মিতুর। লাল শালুক ফুলটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল বুকের উপর। চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে এল ধীরে ধীরে। একই জায়গায় ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দুচোখের কোণে টলমল জল ধারায় জেগে রইলো ভালবাসার আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবী।

রাত্রির পৃষ্ঠা থেকে

এবার আমরা এসে দাঁড়ালাম শ্মশানভূমিতে। এর আগে সারাটা পথ জুড়ে অগণিত কুকুরের প্রতিরোধ ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সদাই ভয় এই বুঝি তীক্ষ্ণ দাঁতে আমাদের রক্তাক্ত করে ফেলে। তবুও সারাক্ষণ পথ চলেছি নীরবে, যেহেতু সাধুবাবা এবং অপর সঙ্গী অনিমেষের মুখে কোন কথা ছিল না। কথা যেটুকু বলার তা অনিমেষ আগেই সাধুবাবাকে জানিয়েছিল। মনের দরজা খুলে অতীত জীবনের সব কথা বলেছিল এক এক করে। আর ব্রহ্মচারী তারাবাবা সব কিছু শুনেছিলেন নীরবে। শেষে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে মৃত্তিকার আবার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেব আগামী অমাবস্যার রাতে শ্মশান ভূমিতে।"

কিছু বিধি নিষেধ পালনে প্রতিশ্রুত ছিল অনিমেষ। যেমন ভয় করা বা অন্য কোন চিন্তায় মনটাকে দুর্বল করা চলবে না। আমি সাধুবাবার মন্ত্র দীক্ষিত শিষ্য নই, আমি অনিমেষের সঙ্গী হিসাবে অভিযানের সময় থেকেই নীরব।

ব্রহ্মচারী তারাবাবাই কথা বললেন প্রথম। "পা থেকে চটি খুলে রাস্তার পাশে ঐ আমগাছটার গোড়ায় রেখে দাও। শ্মশান বড় পবিত্র ভূমি, ওসব পরে শ্মশানে ঢুকতে নেই।"

যন্ত্র চালিতের মত আমরা তাই করলাম। ইতিমধ্যেই ছ'সাতটা কুকুর ঘিরে ফেলেছে আমাদের, আদর শুরু করেছে কিছু খাবার পাবার আশায়। তারাবাবা ওদের মুখের উপর আলো ফেলে দেখে নিলেন। আদর করলেন সবচেয়ে বড়টাকে। "বুড়ি মা, এ সব রইল দেখিস্।"

ওরা আদরে গলে গিয়ে পায়ের উপর মুখ রেখে গড়াগড়ি দিতে লাগল। বুড়িটা চারপাশ ঘুরে ঘুরে নানান অঙ্গ ভঙ্গিমায় লেজ নাড়তে শুরু করল। যেন কতকাল পরে ফিরে পেয়েছে হারানো প্রিয়জনকে।

এরপর দেখলাম আরও একপাল কুকুর। তাদের প্রত্যেকের মুখেই পচাগলা নরমাংসের টুকরো। একটা মড়াকে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে, শুধু কঙ্কালটুকু বর্তমান। শ্মশানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য পূর্ব থেকেই মানসিক প্রস্তুতি ছিল কিন্তু এ দৃশ্য দেখে মনের ভিতরটা ভয়ে কেমন যেন নড়ে উঠল।

চারপাশে নিবিড় আঁধার। তারাবাবা শ্মশানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। আমরাও তাই করলাম। এই মুহূর্তে শ্মশানভূমিতে তারাবাবার মহিমা যেন শতগুণ বেড়ে গেল। মনে হ'ল আমাদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা এক মহিমাময় পুরুষ। দৃষ্টির অগোচরে যে বিশাল অতিপ্রাকৃত জগৎ আছে তার সঙ্গে ওনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। মনে হ'ল তুচ্ছ আমাদের জীবন, আমাদের সাংসারিক মায়া বদ্ধতা। তারাবাবা টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে চল্লেন, আমরা অনুসরণ করতে থাকলাম।

শ্মশানে পর পর পাঁচটা পাকা চুল্লি বর্তমান। সেগুলোকে দেখিয়ে বললেন, "এগুলো হ'ল মায়ের যোনিদ্বার। জীব যেখান থেকে আসে সেখানেই ফিরে যায়।" কথাগুলো বলতে বলতেই উনি প্রণাম জানালেন।

কয়লা এবং কঙ্কালের টুকরোয় চুল্লিগুলো উঁচু হয়ে উঠেছে। মধ্যরাতের নীরবতায় ঐ চিতাগুলো ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হ'ল। যতই কিছু করি না কেন একদিন এখানে আসতেই হবে। মানুষের জীবন ট্রাজেডি তো এটাই।

আমার ভয় হচ্ছিল এখনি যদি কোন প্রেতাত্মা মুখ হাঁ করে সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে হয়ত মূর্চ্ছা যাব। কিন্তু তারাবাবা আছেন, ভয় নেই। তারাবাবা যেন সাহসের দুর্জয় দুর্গ, সাক্ষাৎ দেবতা।

হঠাৎ একটু দূরে তাকালেন একবার। তারপরই তালি দিলেন তিনবার। "এই সরে যা, এরা নতুন লোক। কথা না শুনলে শাস্তি দেব।"

নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মার দর্শন। ভয়ে উন্মাদের মত হয়ে চোখ দুটো মেলে দিলাম সামনের দিকে। কোথাও কিছু নেই, দেখলাম ছোট একটা উইটিবি। তার উপর ভাঙা পাঁচিলের টুকরো পড়েছে। সব মিলিয়ে এমনি এক অদ্ভুত আকৃতির সৃষ্টি হয়েছে যাতে প্রথম দর্শনেই মনে হতে পারে এক মা ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই অনিমেষের। সে যেন অনেক বড় কিছুর সম্মুখীন হতে এখনই প্রস্তুত। সেই রকম দৃঢ়তাই লক্ষ্য করলাম।

তারাবাবা এইবার জলের ঘটিটা অনিমেষের হাতে দিয়ে বললেন, "যা, এইটায় করে গঙ্গা থেকে জল ভরে আন। সাবধানে আনবি, জল যেন না পড়ে।"

এক পা এগোলে যেখানে আমার হৃদকম্প শুরু হ'ত, অনিমেষ সেক্ষেত্রে ঘটিটা নিয়ে সহজভাবেই চলে গেল। চারপাশে অগণিত মাথার খুলি, কঙ্কাল, চিতার আধপোড়া কাঠ ছড়ানো। এ সবের ভিতর দিয়ে যেতে হলে দস্তুর মত বুকের পাটা থাকা চাই। গঙ্গা থেকে আমাদের অবস্থান প্রায় চারশ' হাত দূরে। তারাবাবার কাছ থেকে মাত্র তিনহাত তফাতে থাকলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই জল আনার ভার আমার উপর পড়লে কখনই যেতাম না।

শ্রীরামপুর থেকে বল্লভপুরের শ্মশান পর্যন্ত সবটাই পিচঢালা রাস্তা। দু'পাশে ইলেকট্রিক পোষ্টে আলো। নদীর ওপারে বারাকপুরে তখনো সারি সারি আলোর প্রদীপ। গঙ্গার ওপার যেন স্বর্গ, আর এপার লোডশেডিং এর দৌলতে সত্যিই এক প্রেতভূমি।

তারাবাবা তান্ত্রিক সাধু। ওঁনার মতে অন্ধকার পরিবেশ সাধনার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সুতরাং আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে আমাদের সামনে অমাবস্যা রাত। ভাদরের আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের উপস্থিতি অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তোলে। চারপাশে জঙ্গল। এরই মাঝে বার্ধক্যজীর্ণ দ্বাদশ শিব

মন্দির। এই সব মন্দিরকে গ্রাস করেছে অশ্বথ এবং বট। এরা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সূর্যের আলো পেতে উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে নিম, শেওড়া, বকুল এবং অগণিত গাছের গলাগলি প্রেতের স্থায়ী আস্তানার পক্ষে যথেষ্ট, তবুও এখানে মানুষ আসে পুজো দিতে। পুজো দেয় তিনমুণ্ডি এবং পঞ্চমুণ্ডির আসনে। রাতে এক সময় এই শ্মশান নকশালদের হেড অফিস হয়ে উঠেছিল। এখন আর সে আনাগোনা নেই। ফলে তান্ত্রিক সাধকরা আবার তাদের রাজ্য ফিরে পেয়েছেন।

জঙ্গলের আঁকা বাঁকা পথে অনিমেষ হারিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। এমন কি তার টর্চের আলোর গতিবিধিও অদৃশ্য। চারপাশটা একবার দেখলাম। জীবাত্মাকে দেখে উল্লাসে কোন প্রেতাত্মা নাচছে কিনা। না, সে সব কিছুই না। কুকুর চোখে পড়ল না। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার ফলে আঁধার এবং দৃষ্টি শক্তির মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। ফলে সবকিছুই দৃশ্যমান। আলো ছাড়াই সব কিছু দেখতে পাচ্ছি এটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা।

শ্মশানের মাঝে ইঁটের তৈরি ছোট এক চালাঘর। ভিতরে মাটির তৈরি প্রতিমা — খড়গধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামা। আঁধার ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্করী রূপ। তারাবাবা বাইরের রোয়াকটায় বসে যোগাসনে প্রাণায়াম শুরু করলেন। আমি বসে বসে ভাবতে শুরু করলাম অনিমেষের কথা। কী বিচিত্র পরিবর্তন ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর জীবনকে।

এক সময় কলেজে আমার সহপাঠী ছিল অনিমেষ। ভয়ানক মডার্ণ। ভূত প্রেত তন্ত্রমন্ত্র, এমন কি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সেই যুবক আজ কিভাবে অদৃষ্টের কাছে নতজানু, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সায়েন্স স্ট্রিমের সবাই জানত অনিমেষের ফিউচার প্রমিসিং। অবশ্য মৃত্তিকা চৌধুরীও কম যায় না। বিভিন্ন সাবজেক্টে দুজনের মধ্যে নাম্বার পাওয়ার সে কী কঠিন প্রতিযোগিতা। ডিবেটের সময়ে যুক্তির প্রবল বন্যায় একে অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন কি নির্বাচনের সময়েও পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন উত্তর মেরু হলে অপরজন দক্ষিণ মেরু। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ ছাড়া অপর কোন ক্ষেত্রে কোন মিল ছিল না। এজন্য সবাই বলত, "ওদের জুটিটা মন্দ নয়, শুধু

যুদ্ধ, এ্যামেজিং কম্পাউণ্ড অব কনট্রাডিকসন্।"

এরই ভিতর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা অনুরাগ ও পূর্বরাগের কথা গোপন করেনি অনিমেষ। সব বলেছে। প্রেম যখন দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে সেই সময়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বনাশা পথে। কলেজে পড়ার সময় পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল আমার সঙ্গে। পরে ওর ইউনিভারসিটিতে এবং আমার চাকরিতে প্রবেশ দুজনের মেলামেশার ক্ষেত্রে দূরত্ব তৈরি করেছিল। সেই সময়ে শুনেছিলাম মৃত্তিকা নাকি গান শেখার জন্য রবীন্দ্রভারতীতে ভর্তি হয়েছে। তিনটি জীবন তখন তিনটি বিশেষ ধারায় বইতে শুরু করেছে। এই সময়ে অনিমেষ এবং মৃত্তিকার মাঝে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ মাঝে দু'একবার অনিমেষের সঙ্গে মৃত্তিকার দেখা হলেও বড় একটা কথা বলাবলি হয়নি। বরং দেখেছি কথা সংক্ষেপ করে ও যেন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চায়। ওর এই ব্যাপারটা আমাকে আশ্চর্য করে দিত।

ঐ সময়েই শহর এবং শহরতলিতে নকশালী তৎপরতা যথেষ্ট রকম বেড়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের মহোৎসব। অতর্কিতে কার ভাগ্যে কখন মৃত্যুর নোটিশ এসে যাবে কেউ তা জানে না।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কত মতবাদ দিন কতকের জন্য ডালপালা মেলে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নকশাল আন্দোলন সেই রকম একটা কিছু ভেবেছিলাম। কিন্তু নর হত্যার বিভীষিকা দেখে চমকে উঠেছিল সকলে। আবার এ কথাও সত্য রাজনীতির নাম করে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের দিকটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এরকমই সময়ে একদিন অনিমেষ এল আমার কাছে। এল গভীর রাতে চোরের মত। পরণে ফুলপ্যান্ট, গায়ে হাফ হাতা গেঞ্জি। বুকটা খোলা। একরাশ রুক্ষ চুল, ঠিক যেন কোন ব্যর্থ প্রেমিক বা উঠতি ফিলজফার। একবার হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। বিষণ্ণ হাসি। "কিরে আমাকে দেখে অবাক হচ্ছিস্ — কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন হয় সে কি তুই জানিস্।"

তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। বলার বা জিজ্ঞাসা করার মত কিছু থাকলেও কিছু বলা বা জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। সে অবকাশ অনিমেষ

দেয়নি। আপন মনে বকে গেছে।

এক এক করে মেলে ধরছিল ওর জীবনের পৃষ্ঠাগুলো। হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে পড়ল অনিমেষ। "আসি রে, পুলিশ পিছু নিয়েছে। তোকে বিপদে ফেলতে চাই না।"

"অনিমেষ, তুই কি সত্যিই নকশাল হয়ে গেছিস্?"

ব্যঙ্গের হাসি হাসল অনিমেষ। "দেখে তোর কি মনে হয়?"

"নকশাল হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এমনভাবে মানুষ হত্যা শুধু আমি কেন কোন লোক কোন দিন সমর্থন জানাবে না।" আমি সংযত ছিলাম ঠিকই, তবু ব্যথিত চিত্তের উষ্ণতা আমার এই কথার মধ্যে প্রতিবাদের মত ফুটে উঠল।

"কয়েকটা মৃত্যুর জন্য যত সব বুর্জোয়া প্যানপেনে দুঃখ। একমাত্র ঘৃণা দিয়ে ওসব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ঐ বুর্জোয়ারা হাজার হাজার গরিব তৈরি করে দিনের পর দিন তাদের যখন হত্যা করে, কই তখন তো কেউ প্রতিবাদ করে না। অনেক মৃত্যুকে রুখতে দু'চারটে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

কথার উত্তরে বললাম, "তোমরা এক্সপ্লয়টারদের মারছ একটা যুক্তি দেখিয়ে, কিন্তু নিরীহ ভালোমানুষ হত্যার পিছনে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য আছে শুনি?"

অনিমেষ নিরুত্তর। মনে হয় আমার এই প্রশ্ন ওর ভিতরে ঘা দিয়েছে।

সুতরাং এবার তিরস্কারের পালা। "ভীষণ অসহিষ্ণু তোমরা, তোমাদের মতের এবং পথের পথিক না হলেই সরিয়ে দিতে হবে, এর পিছনে কোন যুক্তি নেই। এভাবে চললে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটবে। দেখে নিও আমার এই কথা একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হবে।"

ক্লান্ত অনিমেষ পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে টেবিলের উপর রাখল। তার পরেই দেহখানা এলিয়ে দিল বিছানার উপর।

লক্ষ্য করলাম ওর কালিমাখা চোখের কোণে জল। "অনিমেষ, তুই কোন কথা গোপন করিস্ না। তোর কি হয়েছে আমায় স্বচ্ছন্দে বলতে পারিস্।"

আমার মুখের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ। ঠোট দুটো কেবল কাঁপতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। ইঙ্গিতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশে বসার জন্য অনুরোধ করল।

আমি ওর নির্দেশমত পাশে বসলাম। ঘরের নীরব বিষণ্ণতাকে গাঢ়তর করে তুলল ও নিজেই। "সব শেষ। আর আমার বাঁচার ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা থাকলেও বাঁচতে দেবে না আমারই দলের লোক। তার আগে আমি যদি মৃত্তিকার সঙ্গে একবার - - - - -।"

মনের ঔৎসুক্য রুখতে পারলাম না আমি। বলে ফেললাম, "কেন রে, তোর এই ব্যাপার দেখে মৃত্তিকা কি তোর কাছ থেকে সরে গেছে?"

"যে সব চিন্তা মনের ভিতর দুর্বলতা জাগায় তাকে কি বাঁচিয়ে রাখতে আছে?" ওর এই কথা এবং হাসির মাঝে ফুটে উঠল গভীর রহস্যময়তা।

"মা যখন বুকের রক্তে দুধ তৈরি করে সন্তানকে বড় করে তোলে তখন কি সেটা দুর্বলতা বলে মনে করিস্? স্নেহের এই পবিত্র বন্ধনের মাঝে তোরা অন্য জিনিস খুঁজে পাস্, ধন্য তোদের। আমি তো মনে করি শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের সংজ্ঞা হ'ল হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সকল মানুষকে সত্যিকারের ভালোবাসা। গাছটাকে মেরে ফেলে যারা ফুল, ফলের আশা করে তাদের আশা কখনো পূর্ণ হয় কি?" প্রতিবাদে গর্জে উঠলাম।

"না, আমাদের হিট্‌লিষ্টে নাম উঠলে কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। খতম করে দিতে হয়।"

ওর উত্তেজনাময় কথাগুলো ঘরের দেওয়ালকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। তারপরেই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। "জানিস্ মৃত্তিকার বাবা আর মৃত্তিকাকে হত্যা করেছি আমরা।" কাঁদছে অনিমেষ। অন্য এক প্রতিহিংসার আগুন ওর সারা চোখে মুখে। "ওরাই আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল ওদের হত্যা করার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন কমরেড্। শেষ পর্যন্ত যারা প্রস্তাবটা দিয়েছিল অপারেশনের ভার দিল তাদেরই হাতে।"

ওর কথার ফাঁকেঅতীতের কয়েকটি হত্যা কাহিনির ছবি ভেসে উঠল

চোখের সামনে। যে সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গিতে মানুষকে সবার মাঝে হত্যা করে বুক উঁচু করে বিনা প্রতিরোধে মিলিয়ে যায়, সেই নারকীয় ছন্দ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কাজেই মৃত্তিকা চৌধুরীর বাবা এবং মৃত্তিকার হত্যা কাহিনি আমাকে বিস্মিত করলেও বিচলিত করতে পারে নি। কারণ যেখানে উদ্দেশ্যহীন সেখানে যুক্তিহীনভাবে রক্তের হোলি খেলায় অস্বাভাবিকতা বলে কিছু নেই, বরং সেটাই স্বাভাবিক। অনেক ঘরেই জমে আছে ব্যথার দীর্ঘশ্বাস। মৃত্তিকাদের মৃত্যু আরও কিছু সংযোজন মাত্র।

কেউ কিন্তু ভুলতে পারবে না মৃত্তিকাকে। অত্যন্ত সুন্দরী না হলেও সুন্দরী। সে সৌন্দর্য যৌবন গর্বিতা লাস্যময়ীর নয়, অপূর্ব গাম্ভীর্যমণ্ডিত, আপন স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। অনিমেষকে ভালোবেসে ওর ভাগ্যকে যে ঈর্ষণীয় করে তুলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রেমের পূজারিনি হয়ে নিজের জীবনকে নিবেদন করে গেল। তার মৃত্যুর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা সবাই।

চোখের জল এখন আর বাধা মানে না। মনের গোপন দুয়ার খুলে দিল অনিমেষ। "জানিস ওরা কি করল। পাছে দুর্বলতা গ্রাস করে সেইজন্য ওরা আমাকে ট্রান্সফার করল পুরুলিয়ায়। নির্দেশ পালন না করে বেরিয়ে এলাম ওদের ব্যূহ থেকে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ওরা কিন্তু অপারেশন সাক্সেসফুল করল। আসন্ন বিপদের বার্তাটুকু দিয়ে ওদের সতর্ক করতে পারলাম না, যা হবার তা হয়ে গেল।" ওর গলার স্বর ভারী হয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে চোখের জল মুছছিল।

"ওর শেষ চিঠিটা আমার হাতে এসেছিল।" কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আবার শুরু করল কথা। "কি অপূর্ব ভালোবাসা মিশেছিল প্রতিটি কথায়, আর ছিল আমাদের ভ্রান্ত কর্মধারার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী।"

হঠাৎ বন্ধ করল বলা। পাগলের মত কান পেতে যেন কার আগমন ধ্বনি শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে থাকার পর আবার বলতে শুরু করল। "ঘটত না কিছুই যদি না ঐ সমালোচনায় ভরা চিঠিখানা দলের হাতে পড়ত। এ টুকুকেই সবাই ভীষণ সিরিয়াস ভাবে নিল। ভবিষ্যত অনিষ্টের আশংকা করে ওরা তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিল। ওরা ভেবেছিল দলের অনেক খবর আমি

গোপনে চালান দিয়ে ফেলেছি মৃত্তিকার কাছে। সে কারণে ওরা সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে নি। হত্যা করেছিল কিডন্যাপ্ করার একদিন পরে বল্লভপুরের এই শ্মশানে। সুদাম আমাকে জানিয়েছিল সে রাতের প্রতিটি বিবরণ। ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়েও বুক কাঁপেনি মৃত্তিকার। প্রতিবাদে তখনো মুখর। তার সামনে আমাকেও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তখনই নাকি তার চোখে প্রকাশ পায় করুণ মিনতি, "না, ওকে মারবেন না, ও কোন অন্যায় করে নি।" কথা শেষ হবার ফাঁকেই বন্দুকের গুলি ওর দেহটাকে ঝাঁঝরা করে দিল। তারপরে দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দিল গঙ্গার জলে।"

এতক্ষণ আমি সব কথা শুনছিলাম নীরবে। এবার প্রশ্ন করলাম, "তাহলে যে পথ ভুল সে পথ এখনো আঁকড়ে আছ কেন? উচ্চ আদর্শকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমার মতের বিরুদ্ধে আছে বলে আমি তাকে হত্যা করব এটা কোনমতেই মানতে পারি না। মানবতাকে হত্যা করে মানব কল্যাণ আমি স্বীকার করি না।"

মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত ক্লান্ত অনিমেষ যেন নতি স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এবার অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হ'ল। হাতটা ধরে ফেলল। "তুই বিশ্বাস কর, আর দল বা বিপ্লব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। মৃত্তিকার মৃত্যুর পর ওরা দল থেকে এমনিতে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ওরা নিজেরাই এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে আত্মগোপনের সোজা রাস্তাটা বেছে নিয়েছে। এর উপর মৃত্তিকার হত্যার ব্যাপারে সমস্ত শিবিরটাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সমালোচনার ঝড়ে এখন অনেকেই ক্ষতবিক্ষত।"

"তাহলে তুই এখন কি করতে চাস্?"

"এখন আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

"সে তো আড়ালে বসে কাঁদলেই পারতিস্। পকেটে পিস্তল রেখে ঘুরছিস্ কেন?"

ওর দুচোখে এবার আগুনের ঝিলিক। মৃত্যুর আগে প্রতিহিংসা চাই। তাই আমি আত্মরক্ষা করে চলেছি।"

"বদলা নেবার জন্যই কি আমার সাহায্য চাইছিস্?"

"না, ঠিক অতটা ভীরু আমি নই।" স্বরে ফুটে উঠল দৃঢ়তা। "একটা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে হবে। বল করবি কিনা?"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলতে শুরু করল। "আমার শেষ ইচ্ছা মৃত্তিকাকে একবার দেখার। সেইজন্য শরণ নিয়েছি ব্রহ্মচারী তারাবাবার। উনি তারাপীঠ সিদ্ধ। থাকেন বল্লভপুরের শ্মশানে। যেতে বলেছেন সামনের অমাবস্যা তিথিতে। তোকে আমার সঙ্গে পেতে চাই।"

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। বিপ্লবের খর রৌদ্র থেকে এমনি করে নির্বাক বটের মত ভারতের কৌপীন পরা সন্ন্যাসীর কাছে যাবার জন্য প্রার্থনা। এ যে অসম্ভব। যে আধ্যাত্মিকতাকে আধুনিক ভারত মূল্য দিতে অপরাগ তারই দরবারে ভিক্ষুকের মত আত্মসমর্পণ! পাগলের মত এ কী বলছে অনিমেষ!"

অনিমেষ তখনো আমার হাতখানা ধরে। "কি রে, যাবি তো?"

সেদিন অনিমেষকে ফেরাতে পারি নি। পারি নি বলেই বিস্ময়কর পৃথিবীর একটা জাগ্রত আগ্রহকে কোলে নিয়ে অনিমেষের গঙ্গা থেকে ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে আছি।

"তারা — তারা — তারা, মাগো!" হঠাৎ সাধুবাবার গম্ভীর আরাবে পূর্ণ হয়ে উঠল শ্মশান প্রান্তর।

খানিক বাদেই মাথায় জলের ঘটি নিয়ে ফিরে এল অনিমেষ। হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

ওকে দেখে হাসলেন তারাবাবা, "এখনো তুই নরহত্যার চিন্তা মুছতে পারিস্ না। ঐ জন্যই তো ভয়ংকর এক সাপ তোকে তাড়া করেছিল।"

অবোধ শিশুর মতই বিনীত স্বীকারোক্তি অনিমেষের। "কি করে জানলেন বলুন তো? সত্যিই যদি দক্ষিণ দিকে না নামতাম আজই খতম হয়ে যেতাম, সাপটা সহসা উল্টো দিকে চলে গেল।" এই প্রথম হাসি অনিমেষের মুখে। ও যেন ভীষণ কৃতজ্ঞ গঙ্গাজলের ঘটিটা ভরে আনতে পেরে।

সাধুবাবার মুখে সেই স্মিত হাসি। "এ জানাটা তুইও কালে পারবি, এমন কিছু অলৌকিক নয়। যা কাদা মাখা পা দুটো ধুয়ে আয়।"

তন্ত্র জগতের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমার মনোমাঝে জাগল শিহরণ ও বিস্ময়। শ্মশানে তো টেলিভিশন নেই যে সাপের আক্রমণ দেখা যাবে। আরও বড় কথা মনের ভিতরটা তো টেলিভিশন দিয়ে দেখা যায়না। মনে হ'ল এই তারাবাবা এক অসাধারণ মহাপুরুষ। প্রথম থেকেই যার এতখানি ক্ষমতার পরিচয় মেলে তিনি নিশ্চয়ই মৃত্তিকার সঙ্গে অনিমেষের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারবেন।

সাধুবাবার নির্দেশে মায়ের মন্দিরে বাতি জ্বালা হ'ল, সেই সঙ্গে এক প্যাকেট ধূপ। ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চৌদিকে। স্বল্প আলোয় পৃথিবীর গোপনে আমরা তিনটি প্রাণী। চারপাশের দৃশ্য কিছুটা স্পষ্ট হয় উঠলেও গাছ গাছালির নিবিড় ছায়ায় স্থানটা মনে হ'ল আরো ভয়ংকর। এই ফাঁকে কয়েকটা বাদুড় এবং পেঁচা স্থান পরিবর্তন করল। ধীরে ধীরে সাধুবাবার সঙ্গে আমরাও পুজোয় আত্মমগ্ন হলাম।

বাতিগুলো জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়ে আবার অন্ধকারকে স্থান করে দিল। মাকে প্রণাম জানিয়ে সাধুবাবা উঠলেন। আমরাও প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। এক এক করে সমাপ্ত হ'ল ত্রিমুণ্ডি এবং পঞ্চমুণ্ডির পুজো। এর পরেই ব্যস্ততা দেখা গেল সাধুবাবার মধ্যে। "তাড়াতাড়ি চল চিতার কাছে। এখনই এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে বসতে হবে চিতায়।"

শুনেই গাঁ কাটা দিয়ে উঠল। তবুও এসেছি যখন নির্দেশ না মেনে উপায় কি। অনুসরণ করলাম। দেখলাম অনিমেষের মাঝে কোন বিকার ভাব নেই, মানসিক দিক থেকে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অনুগত ভক্তের মত তার আচরণ।

সাধুবাবা হরিণের ছালটা চিতার উপর বিছিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন। আমাদের নির্দেশ দিলেন ডাইনে বাঁয়ে চিতার উপর আসন বিছিয়ে বসতে। নির্দেশ ছিল চোখ বন্ধ করে মন্ত্র জপ করার। আমি কিন্তু একবার চোখ বন্ধ করি, আবার খুলি। উনি বলেছিলেন, "প্রেতাত্মা গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু মিনতি জানাতে পারে, একটুও ভয় পাবি না। আমি আছি, ওদের অনিষ্ট

করার মত সাহস থাকবে না।" এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার বর্ম ঐ কটি কথা। মনকে প্রবোধ দি—মাভৈঃ।

রাত বারোটা থেকে কাঁটা ঘুরে দেড়টায় পৌঁছল। কোথাও কিছু নেই। চারপাশে অখণ্ড নীরবতা এবং অন্ধকার। শুধু মাঝে মাঝে তালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাবার আরাব। "ভৈরব—ভৈরব—ভৈরব—তারা—তারা—তারা--মাগো।" — এই শব্দগুলো শোনা যাচ্ছিল। শুধু প্রতীক্ষা, অনিমেষ আসনের উপর নিশ্চল নির্বিকার। চোখ একইভাবে বন্ধ। ক্লান্ত দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে দিলাম গঙ্গার দিকে। স্বর্গ কখনো দেখি নি, দেখবও না। তবুও মনে হ'ল নিভৃত রাতে স্বর্গ বুঝি ঐ গঙ্গার বুকে নেমে এসেছে। স্টিমারগুলো যেন রঙীন আলোর ডানামেলে উড়ন্ত প্রজাপতি। আর ওপারে গান্ধীঘাটের কাছে মেঘলোকের রথে যেন নেমে আসছেন কত দেবদেবী এবং অপ্সরা। ঐ সব দেখতে দেখতে আত্মমগ্ন হয়ে গেলাম।

হঠাৎ অনিমেষের চিৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তখনো গোঁঙাচ্ছে অনিমেষ। "রক্ত—রক্ত—রক্ত — এ দৃশ্য আমি দেখতে চাই না।"

ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপছে থর থর করে। বুঝলাম এটা ভূত নয়, প্রেত নয়, ওর সাবকনসাস্ মাইণ্ডের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। আপন মানসিক চিন্তার প্রতিফলনে ও এভাবে কেঁপে উঠছে।

সাধুবাবা কিন্তু নির্বিকার। একই ভাবে আসনে স্থির, যেন একটি পাথর প্রতিমা। নড়ে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই আবার ধ্যানস্থ হ'ল অনিমেষ।

ধীরে ধীরে পূব আকাশ ফরসা হয়ে এল। ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘর ছুঁয়ে গেছে। এইবার উঠলেন সাধুবাবা। "তোমার মৃত্তিকা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তিনটে গুলিতে ওর বুকখানা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ও কিন্তু এখনও তোমায় ভালোবাসে। মানুষের ভালোর জন্য তুমি যাতে আত্মনিয়োগ কর সে অনুরোধ জানিয়ে গেল।" গভীর স্নেহে সাধুবাবা হাত রাখলেন অনিমেষের মাথায়।

যুক্তিবাদী মন সাধুবাবার কথাগুলিকে কোনমতেই ঠিক বলে গ্রহণ করতে পারল না। মনে মনে অবাক হলাম, তান্ত্রিকেরা বুঝি এই ভাবেই ভণ্ডামি করে। লোক বশ করার জন্য আজগুবি কথা বলে, অনুভূতির জায়গায় শুড়্শুড়ি

দিয়ে প্রশস্ত করে গুরুগিরির পথ।

অনিমেষ কিন্তু সব কথা বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করে নিয়েছে। চোখ দুটি জলে ভরে উঠল অনিমেষের। ওর ভক্তি যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। "আচ্ছা বাবা, মৃত্তিকার মুক্তির জন্য কি কিছু করা যায় না?"

"সবই হবে। তুই অত ভাবছিস্ কেন? চল্ এখন আশ্রমে ফিরে যাই। আর আলো জ্বালার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।"

চার পাশের গাছপালার উপর আলো ফেলে কি যেন দেখতে লাগল অনিমেষ। দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায় । তারপর হঠাৎ বলল, "আচ্ছা সাধুবাবা, আমি যদি রোজ এখানে আসি রোজ তার দেখা পাব?"

"হাঁ পাবি, কিন্তু প্রেতের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে ছুটছিস্ কেন? ওটা ফুল করে তুই মাকে দে, শান্তি পাবি, তার আত্মাও শান্তি পাবে। দেখছিস্ না আমাদের জৈবিক রূপগুলো পুড়ে ছাই হয়ে কেমন এখানে ওখানে পড়ে আছে। তুই আবেগে ছুটছিস্। নিত্যের পিছনে ছুটলে এ ব্যাধি সেরে যাবে।"

ওদের আলোচনার জগতে আমি এখন গৌণ। দর্শন গ্রাহ্যবস্তুর অভাবে আমার যুক্তিবাদী মনটা অসংযত কিন্তু আমি তো অনিমেষকে এমনভাবে শিক্ষা এবং সান্ত্বনা দিতে পারিনি। এটাই যে সব চেয়ে বড় আশ্চর্য। অতীতে একবার এক সাধুকে প্রশ্ন করেছিলাম "আপনারা দুনিয়ার মানুষের কোন্ উপকারে আসছেন।"

উত্তরে সাধু বলেছিলেন, "উপকার করার অধিকার তোমার বা আমার কারুর নেই, কিন্তু সেবা করার অধিকার আছে, সেটা ঈশ্বর জ্ঞানে। এতে মনের ভিতর যে উচ্চ আদর্শবোধ, ন্যায় এবং সততার জন্ম হয়, তার ফল সুদূর প্রসারী। ভোগবাদী জীবনের ধারাটা বদলে যায়, মানুষ শান্তি পায়। আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে একটু অন্য আলোকে দেখ না, পথ খুঁজে পাবে। অন্ধকারে মাথা খুঁড়তে হবে না। সমাজ এবং জীবন কোনটাকেই এরা অস্বীকার করেন নি।"

এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ সাধুবাবার এক ঠেলায় সম্বিৎ ফিরে

পেলাম। "আমি দেখছি তুই আমাদের ব্যাপারগুলো মিথ্যা বলে মনে করছিস্। তুই সব কিছু মেলাতে চাস্। বাতাসে শব্দ ভেসে যায়, একথা মানিস তো? সেই রকম ভাববাদীদের ভিতরে না ঢুকলে রহস্যটা মিলাবি কেমন করে? বিশ্বাস এবং ভক্তি না জন্মালে কিছুই পাবি না।"

ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হয়ে রাত্রির কোলের উপর হেসে উঠল নবজাতক পৃথিবী। যাবার আগে আবার শ্মশানভূমিকে প্রণাম জানাল অনিমেষ। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল গঙ্গার দিকে। অপূর্ব সুন্দর একটা পাখি ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কান্নার মত শিস্ দিতে দিতে উড়ে যাচ্ছে অপর তীরে।

তারাবাবার পিছন পিছন চলতে চলতে আবার তাকাল চিতাগুলোর দিকে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম বড় বড় জলের ফোঁটায় ওর চোখের কোণে জন্ম নিয়েছে ভালোবাসার সুমধুর গঙ্গা।

হৃদয়ের স্বচ্ছ প্রবাহ নিয়ে কেমন সহজভাবে অনিমেষ মিশে যাচ্ছে ভালোবাসার মহাসমুদ্রে। জীবনের ক্ষেত্রে এটা যে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যুক্তি দিয়ে, মূল্য দিয়ে এ জিনিস মেলে না। ওর এই ভালোবাসাকে প্রণাম জানাতে ধীরে ধীরে আমারও মাথাটা নত হয়ে আসে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল নীলিমার। বিছানা থেকে ঝুলপড়া জানালার ফাঁক দিয়ে তাকাল পূব আকাশটার দিকে। না এখনো শুকতারা ওঠেনি। উঠলে তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিতে পারত, সেরে নিতে পারত বাড়ির টুকিটাকি কাজ। ক'দিন থেকেই আকাশটা ভীষণ মেঘলা। মাঝে মাঝে দমকা বৃষ্টি। আজো হয়ত তাই, সেকারণে এ রাতের আকাশ জুড়ে একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জমাট অন্ধকারকে কোণঠাসা করে রাস্তার দুপাশের বিচিত্র বর্ণের আলোগুলো সমানে জ্বলছে। অনিমার মুখে শুনেছিল প্যাণ্ডেলের মাঝে আলোর কায়দাটাই নাকি আলাদা। দেখলে মনে হবে মা দুর্গা যেন সত্যিকারের স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। এখনই ছুটে গিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। সুযোগ থাকলে শেষ রাতের নির্জন পথ ধরে পাঁচ জায়গায় নাই হোক অন্ততঃ এ পাড়ার প্রতিমাটা একবার দেখে আসতে পারত। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে করে মেয়ে হয়ে রাত্তিরে বার হওয়া মানেই বিপদ ডেকে আনা। এমন সাহস দেখালে বাবা মাও ছেড়ে কথা বলবে না। অতএব সকাল পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

গত কয়েকদিন ধরেই সে গৃহকোণে বন্দিনী। মাত্র একটি বারের জন্যও রাস্তার দিকে পা বাড়াতে সাহস করেনি। পুজোর বাজারে তার মত বয়সের মেয়ে একটা পুরানো ছেঁড়া কাপড় পরে কি করে বেরোবে সবার সামনে। বিশেষ করে ঐ তিনতলা বাড়িটার ছোকরাটার সঙ্গে যদি মুখোমুখি হয়ে যায়। তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে বাড়ি ফেরা ছাড়া অন্যপথ থাকবে না।

আকাশটার দিকে মাঝে মাঝে তাকায় নীলিমা। মনে মনে ভাবে নিশ্চয়ই আর বাকি নেই ভোরের আলো ফুটতে। বাইরেটা দেখার প্রবল ইচ্ছায় মন যেন আর স্থির থাকতে চায় না। অবশ্য এই বন্দি দশার জন্য সে নিজেই দায়ী। নতুন শাড়ি দু'খানা যেদিন বাড়িতে আনা হ'ল, সেদিন কী আনন্দ। বহুদিনের জমাট সমস্যা, অভাব নিমেষে উধাও।

সঙ্গে সঙ্গে দিদি ঘোষণা করল, "এই দুখানা শাড়ি প্রথম দিন নীলিমা পরবে, মহাষ্টমীর দিন নেবে মা, আর তার ভাগে থাকবে নবমীর দিন, বিজয়ার দিন প্রয়োজনে সবার।"

অমনি প্রতিবাদ জানাল নীলিমা, "কোন মতেই ও ভাগ আমি মানব না। আমি যা বলব তা করতে হবে।"

"কী করতে হবে শুনি?" নীলিমার দিকে চোখ রেখে হাসতে হাসতে বলল অনিমা।

অস্বস্তি বোধ করছিল নীলিমা। বিবেকের প্রতিযোগিতায় সে হারবে কেন? না, এ হতেই পারে না। সেও এ সংসারের সুখ দুঃখের অংশীদার। এই জিদের বশেই সে পঞ্চমীর দিন কারুর সঙ্গে কথা বলে নি, ষষ্ঠীর দিন দুপুরে খায় নি। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে তারই।

একই বিছানায় শুয়ে আছে দুটি বোন। আলতো করে দিদির গায়ের উপর হাতটা রাখল। অঘোরে ঘুমাচ্ছে। দু'বেলা দু'রকম শাড়ি পরে মনের আনন্দে চারদিক ঘুরেছে। ঠাকুর দেখে ফিরেছে রাত বারোটায়। বৃষ্টিতে সকালের শাড়িটায় ময়লা জলের ছিটে লাগিয়ে এনেছিল কিন্তু এ নিয়ে ও চিন্তিত হয়নি। একরাশ খুশি ঝিক্ মিক্ করছিল ওর সুন্দর মুখখানায়। সারাটা দিন প্রসাদ খেয়ে কাটিয়েছে, বাড়িতে খায় নি।

কাদা লাগা শাড়িটা দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি নীলিমা। ক্ষোভে দুঃখে মাথার ভিতর আগুন জ্বলে উঠছিল। আলনা থেকে শাড়িটা নামিয়ে এনে মেলে ধরেছিল বাবার কাছে। "অত কষ্ট করে এনেছ এবার অবস্থাখানা দ্যাখো। আজকের দিনটা ওর ভাগে পড়েছে বলে ওকি যা ইচ্ছে তাই করে নিয়ে আসবে নাকি।" বলতে বলতেই চোখে জল এসে গিয়েছিল।

"ঠিক আছে মা, একটু ধুয়ে নিলেই তো ব্যাপারটা মিটে যায়। আনন্দের দিনে এ নিয়ে কি কথা বাড়াতে আছে?"

"না বাবা, তুমি বোঝ না, ও এত নোংরা করে আনল কেন।"

গর্জে উঠল অনিমা, "আমি কি ইচ্ছা করে অমন করেছি। এমন ভাগের শাড়ি না পরাই ভাল ছিল।"

"সামান্য শাড়ি নিয়ে এ তোরা করছিস কি। আমার কি সে সামর্থ আছে রে, সবার জন্য সব কিছু কিনতে পারব।"

বাবার চোখে জল দেখে খানিকটা দমে গেল নীলিমা। নরম গলায় বলল, "মা সপ্তমীর দিন পরে গিয়েছিল, কই দাগ করে তো আনে নি। একটা ভাঁজ পর্যন্ত পড়ে নি।"

অনিমার চোখে তখন বাঁধভাঙা ভাদরের বান। "বৃষ্টি না এলে ভাঁজ ঠিকই থাকত। বেরোনোই ভুল হয়ে গেছে।"

মেয়ের মাথায় হাত রেখে শশধর সান্ত্বনার সুরে বললেন, "কি করবি মা বল, তোদের তো সব কিছু মানিয়ে নিতে হবে।"

ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটল। রাতের খাওয়া শেষ করে প্রতিদিনের মত আজও দু'বোনে শুয়ে পড়েছিল একই বিছানায়। দিদির কথা ভাবতে গিয়ে এবার নিজের উপর রাগ হচ্ছিল নীলিমার। আজকের এই বিশ্রী ব্যবহারটা না করলেই ভালো হ'ত। সত্যি কথা বলতে কি এ যুগে এমন মিষ্টি মেয়ে দুর্লভ। দাওয়ায় বসে দুজনে যখন পাপড় তৈরি করে তখন মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকায়। বুঝতে পারে কোথায় যেন একটা চাপা বেদনায় ও গুটিয়ে যাচ্ছে। তবুও হাসতে হাসতে বলে, "দ্যাখ বোন, এই পাপড় তৈরির পয়সা

থেকে কিছু কিছু জমিয়ে আমি তোর জন্যে পোষাক কিনে দেব।"

"আগে তুই নিজের জন্য কর, তারপর আমার কথা ভাববি।"

"নারে তুই জানিস্ না, তুই পরলে আমারও পরা হবে।"

কথা বলার সময় ওর সুন্দর মুখখানায় স্নেহ মমতার এমন একটা মধুর আভাস দেখা যায় যা দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। যারা ওকে দেখতে আসে তাদেরই পছন্দ হয়ে যায়। কিন্তু দেনা পাওনার ব্যাপারটা মেটানোর মত ক্ষমতা কোথায়?

মনমরা শশধরকে চাঙ্গা করে তোলে অনিমাই। "আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ভেব না। তোমার তো ছেলে নেই আমি তোমার ছেলে হয়ে থাকব। বরং সবাই মিলে নীলিমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করি এস।"

শুনতে ভাল লাগলেও এ কথা মার মনঃপূত হয় না। নতুন উদ্যোগ শুরু হয় মার দিক থেকেই। মা বলে — মেয়েদের সংসার না হলে মানায় না। কিন্তু বিনি পয়সায় মেয়ে নিয়ে যাবার মত মানুষ সংসারে কটাই বা। ভালোবাসা করে পার হতে গেলেও ঝুঁকি এবং ঝামেলার বহরটা কম নয়। বাইরে বেরুনোর মত পোষাক পরিচ্ছদ এবং সুন্দরী হয়ে ওঠার জন্য প্রসাধনের জিনিসপাতি কেনার ক্ষমতা কোথায়? তা ছাড়া আজকের দিনে গরিব এবং বেকার মেয়েদের সঙ্গে কেউ ভাব জমাতে চায় না। ভাব জমালেও টেঁকে না, জানতে পারলেই কেটে পড়ে।

সব কিছু জেনেই পাথর হয়ে গেছে অনিমা। এ নিয়ে কথা উঠলেই রাগে ফেটে পড়ে। "পেটে যারা খেতে পায় না তাদের এ সব বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।"

অন্ধকারে খুব ভাল করে দেখা যাচ্ছে না দিদির মুখখানা। মাঝে মাঝে মনে হয় ও যেন ঠিক সন্ধ্যা প্রদীপের মত। ওর সম্পর্কে আর দ্বিতীয় কোনে উপমা খুঁজে পায়না। দুরন্ত মমতায় ও নিজের হাতটা আলতো করে ওর গায়ের উপর রাখে। জেগে উঠলে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলবে, "তুই আমায় ক্ষমা কর।"

সংসারের চিন্তাগুলো দূরে সরিয়ে রেখে এবার নিজের বৃত্তে ফিরে আসে নীলিমা। ভাবে শাড়িতে সামান্য দাগ লাগলেও এখনও দিব্যি নতুন। আজ নতুন শাড়ি পরে ঐ বাড়ির ছেলেটাকে বুঝিয়ে দেবে সেও আর পাঁচটা মেয়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। খবরের কাগজ ফেরিওয়ালার মেয়ে বলে ছোট হতে যাবে কেন? স্বপ্নের ঐ রাজপুত্তুরকে বাস্তবতার বেদিতে বসিয়ে নীলিমা মনে মনে ভাবে—ও নিশ্চয়ই অত সব বিচার করে না, ওর মনটা দারুণভাবে ভাল। পড়ন্ত রোদ্দুর থেকে যখনই সে পাপড় তুলতে যায় তখনই ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ওর দু'চোখের ইশারাটা বুঝতে পারে। ও ভালোবাসতে চায়। আর তখনই আপন মনকে প্রশ্ন করে—"আর তুমি, তুমি কি চাও না। তুমিও তো খুঁজে বেড়াচ্ছ এমন একজনকে যে তোমাকে ভালোবেসে আপন করে নেবে।" হাঁ, এ ব্যাপারে সে প্রস্তুত। বাতাসে সাগর যেমন দোলে, ডাক পেলে সেও ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়বে। মধুর একটা স্বপ্নের অনুভূতিতে মন যেন থৈ থৈ সাগর, ভাবতে গিয়ে চোখের পাতা দুটো বুজে আসে।

আজ যখন প্রতিমা দেখতে বেরুবে তখন ও যদি আসে, যদি খুবই আন্তরিক হয়, সঙ্গে নিয়ে যদি বেড়াতে চায়, তাহলে খুবই ভাল হয়। চিন্তা করতে করতে বিজয়িনীর মত হাসি ছড়িয়ে পড়ে সারাটা মুখে। দিদির মত সেও দেখতে সুন্দর। যে কোন যুবককে হার মানানোর ক্ষমতা তার আছে।

ঘরের বারান্দা হতে প্রতিদিন লক্ষ্য করেছে ওর প্রতিটি গতিবিধি। নীলিমা বুঝতে পারে এটা ওর নীরব আমন্ত্রণ। শুধু এইটুকুতেই ভীষণ আশাবাদী হয়ে ওঠে। ওর শিরায় শিরায়, রক্তের কণায় কণায় অদ্ভুত শিহরণ জাগে পুজো দেখাকে কেন্দ্র করে। মধুর আবেগে মনটা নীল সায়রের পদ্মবনের মত দোল খায়। আজ সে সাজবে, পরিপাটি করে সাজবে। মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবে সবার মাঝে।

কিন্তু কোথায় যেন একটা সন্দেহ থেকে যায়। এক দিনও তো মুখোমুখি হয়ে কথা বলার সুযোগ হয় নি, ও যদি না আসে। ভয় পায় নীলিমা। রক্তের মাঝে হিমল স্রোত জমাট বাঁধতে থাকে। পরক্ষণেই মনকে সান্ত্বনা দেয়— না,

না, এমনটা হবে কেন? একটা নিশ্চয়তার প্রদীপ জ্বেলে মনের উতল পাতল অবস্থাকে সামাল দেয় নীলিমা।

চিন্তায় ছেদ পড়ে অনিমা জেগে ওঠায়। "এই নীলি ওঠ—উঠে পড়।" ধাক্কা মেরে নীলিমাকে জাগিয়ে দিতে চায়। "বেলা দশটার মধ্যে না বার হলে দেখবি কি?" আলতো হাই তুলে উঠে বসে নীলিমা, দিদির ডাকে যেন এইমাত্র জেগে উঠেছে এমনই একটা ভাব দেখায়। সেই সঙ্গে ফিরে আসতে হয় বাস্তবতার জগতে।

পূব আকাশ ফরসা হয়ে সূর্য উঠি উঠি প্রায়। তাড়াতাড়ি বাইরে আসে। তেতলা বাড়ির পাশ দিয়ে থালার মত সূর্যটা দেখা যায়। আজকের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ আলাদা, আনন্দ উপচে উঠছে মনের দুকূল ছাপিয়ে। গুনগুনিয়ে গান গাইতে ইচ্ছা করে। সকলকে খুশি রাখার জন্য নীলিমা আজ অনেক বেশি কাজ করে ফেলে।

এরজন্য বকুনিও খেতে হয় বাবা, মা, দিদির কাছ থেকে, "ঘরেই যদি বেলা এগারটা বাজাবি, ঠাকুর দেখতে যাবি কখন।"

এমন তিরস্কার খুবই ভাল লাগে নীলিমার। স্নান সেরে এসে কাপড়টা হাতে তুলে নেয়। একশ' দশ টাকা দামের ছাপা শাড়িটা আজ যেন অকল্পনীয় সুন্দর। রঙটা সাদা, দুদিকে ফুলের নকশা করা চওড়া পাড়, পরিপাটি আঁচল, মাঝে মাঝে ফুলের মত নকশা। পরলে আঠার থেকে আটচল্লিশ বছরের যে কোন মেয়েকে মানিয়ে যাবে। মনে মনে বাবার বুদ্ধির প্রশংসা করে, আনন্দে কত গান বুকের ভিতর সুরের পরশ পায়।

শাড়িটা পরতে গিয়ে কিন্তু গোল বাঁধে। এই শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ নেই। অনিমা নিজের তিনটে ব্লাউজই তার সামনে এগিয়ে দেয়। দুঃখের মাঝে হাসি পায় নীলিমার। সে তার দিদির থেকে একটু মোটা। ওর সব কটা বত্রিশ, লাগবে চৌত্রিশ। কিন্তু দুজনের ব্লাউজ গুলোর অবস্থা বড়ই করুণ।

অবস্থাটা বুঝতে পেরে সামাল দিতে এগিয়ে আসে অনিমা। ওর মধ্যে যেটা ভাল কেচে এনে আঁচের উপর মেলে ধরে তাড়াতাড়ি শুকোবার জন্যে। রাগে দুঃখে নীলিমা বাইরে এসে দাঁড়ায়।

তিনতলার সেই যুবকটির সঙ্গে আবার মুখোমুখি। খালি গা, বাইরে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করে। দূরত্বটা বাঁচিয়ে দেয় অস্বস্তিকর অবস্থার থেকে। যুবকটি এক গাল হাসি নিয়ে ওর পানে তাকায়। ইশারায় বাড়ির কাউকে যেন ডাকে। ক্ষণ পরেই এক যুবতী এসে ওর পাশে দাঁড়ায়। চারটে চোখের দৃষ্টি ওর উপর বর্শার ফলকের মত পড়ে।

জ্বালা ধরে যায় নীলিমার মনে। পাশের ঐ মেয়েটিকে অকারণে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এরই মাঝে লজ্জা ঢাকতে আঁচল টেনে গায়ের উপর ছড়িয়ে দেয়। নিজের শাড়ি পরাটা একবার পরখ করে নেয়। তারপর গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে ওদের লক্ষ্য করে একটু হাসে। বুঝিয়ে দেয় প্রতিযোগিতায় জেতার মত রূপ তার আছে।

দিদির ডাকে ঘরে আসে নীলিমা। বাটি গরম করে ঘষে ঘষে এই ফাঁকে ইস্ত্রির কাজটা সেরে নিয়েছে। পুরানো হলেও এখন মন্দ দেখাচ্ছে না। গায়ে লাগিয়ে নেয় নীলিমা। রঙিন ব্লাউজটা নতুন শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ না করলেও খুব মন্দ এ কথাও কেউ বলতে পারবে না।

কপালের টিপ্, হাতের নখপালিস—সব কিছু শেষ বারের মত পরখ করে নেয়। মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠে। বাবা মা দিদির অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে আসে বস্তির নোংরা পরিবেশ থেকে। বড় রাস্তায় পা দিয়ে মধুর উল্লাস অনুভব করে। আজ যেন মুক্তির আলোয় স্নান করছে। হালকা মনটা যেন পরির মত নাচছে।

চারপাশে অগণিত মানুষ, যুবক যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ, শুধু মানুষের ঢেউ। সারা পথ জুড়ে অপূর্ব আলোকসজ্জা। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটায় আবছা আঁধার নেমে এসেছে মাটির খুব কাছাকাছি। সজ্জিত আলোকমালায় পরিবেশটা যেন স্বপ্নময়, মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অন্য এক পৃথিবীতে। দুপাশের এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে প্যাণ্ডেলের দিকে। সানাইয়ের বিলম্বিত সুর দোল খায় বাতাসে। খুবই ভাল লাগে নীলিমার।

তিনতলা বাড়ির একটু দূরেই প্যাণ্ডেল। পাড়ার ঠাকুরটাই প্রথম দেখবে বলে স্থির করে। হঠাৎ মনের গোপন আকাশটা ঝিলিক দিয়ে উঠে।

আজ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? সব দূরত্বই মুছে যাবে একদিনে। বাড়িটার কাছাকাছি হতেই পা দুটো স্থিরবদ্ধ হয়। সন্তর্পণে চারপাশটা দেখে নেয়। কই, কাউকে দেখছে না তো। সে তো নেমে এসে মধুর সম্ভাষণে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। অকারণে কিছুটা দেরি করে। সারা দিন ঘুরে অসংখ্য প্রতিমা দেখার ইচ্ছাটা এখন মুলতুবি থাকে। অজান্তে বাড়িটার দিকে বারে বারে তাকায়।

বিস্তৃত নীরবতা এখন যেন বিদ্রুপের মত মনে হয়। কিছুটা হতাশ হয়েই প্যাণ্ডেলের দিকে আসে। জীবনের প্রথম অভিসারে কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে দেখতে পায় প্যাণ্ডেলের মধ্যে। জামার বোতাম খোলা, সোনার চেনটা উদাস উদাস যৌবনের মাঝে মনোরম লতার মত ঝিকমিক করছে। চেয়ারে বসে হাসিমুখে গল্প জমিয়েছে সেই মেয়েটির সঙ্গে।

বুকের ভিতরটা ঘন ঘন ওঠা নামা করে। কিভাবে আলাপ জমাবে ভাষা খুঁজে পায় না। অবস্থা থেকে ত্রাণ করতে ঐ যুবকই এগিয়ে আসে। "কখন এলে?" চির পরিচিতের মত হাসিমুখে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়।

"এইমাত্র", সলজ্জ হাসিতে জবাব দেয় নীলিমা।

"তুমি যখন কাজ করার জন্য বাইরে আসতে তখন আমি তোমাকে দেখতাম। ভীষণ কাজের তুমি।"

"সংসারের জন্য কাজ না করলে চলবে কেন?"

"একটু বাইরে যাবে? একটা কথা আছে।"

আশার বিদ্যুৎ ঝিলিকে জীবনের এমাথা ওমাথা আলোকিত হয়ে উঠে। সংসারের প্রতিদিনের সমস্যার ঘন পর্দাটা সরে যায়। দু'চোখের স্নিগ্ধ হাসিতে সম্মতি জানায়। পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথের একটা নিরালা জায়গায় দাঁড়ায় দুজনে। অযাচিত ভাবে সেই মেয়েটিও ছুটে এসে পাশে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নীলিমাকে। পোষাকের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসিটা গোপন করতে পারে না।

অসভ্য বর্বর মেয়ে কোথাকার! ওর ঐ হাসির একটা যোগ্য জবাব খোঁজার চেষ্টা করে নীলিমা। বাঘিনীর মত লাফিয়ে পড়ে ওকে ছিন্ন ভিন্ন করে

দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ভবিষ্যত ভেবে সংযত হতে বাধ্য হয়।

"একটা কথা বলব তোমাকে?" যুবকটি মুখের দিকে তাকায়।

"আমি কি বলতে মানা করেছি। বলুন না কী বলতে চান।" মুখে হাসিটা ধরে রাখতে চেষ্টা করে নীলিমা।

"কথাটা তোমার বাবাকেও বলেছি। উনি বলেছেন "মেয়ে বড় হয়েছে, সিদ্ধান্ত সেই নেবে। আমি কিছু বলতে পারব না।"

মুহূর্তে পরিবেশটা যেন বদলে যায়। দূর বন হতে এক কোকিলের ডাক যেন কানে আসে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে নীলিমা। সলজ্জ হাসিতে প্রশ্ন করে, "বাবার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ হ'ল?"

"কেন, উনি তো রোজ আমাদের কাগজ দিয়ে যান।"

"বেশ তো কী বলতে চান বলেই ফেলুন না।"

উত্তর শোনার অধীর আগ্রহে কান দুটো খাড়া রাখে। পাশের মেয়েটিকে ঠিক এসময়ে অসভ্য কুৎসিত বলে মনে হয়। সামান্য আলাপচারিতার মাঝে ও যেন হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি ভীষণ স্মার্ট। এরকম মেয়েই আমাদের দরকার। আমাদের বাড়িতে তুমি কি কাজ করবে? ইচ্ছে হলে পুজোর পর থেকেই লাগতে পার।"

কোন উত্তর দেয় না নীলিমা। বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"না-না, পাপড় তৈরির থেকে অনেক কম কাজ। বাসন ধোয়া, ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা—এই কাজগুলোর জন্য পার মান্থ দু' শো টাকা দিতে রাজি।"

পাশের মেয়েটি বলল, "ইওর চয়েস্ ইজ্ আনডাউটেডলি কমেণ্ডেবেল। এ্যাজ এ মেড সারভেন্ট সি উইল বি এ নাইস্ ওয়ান।"

নীরবতা লক্ষ্য করে উৎসাহিত হয় যুবকটি। "দেখে নিও, পুজোর সময় তোমায় এমন বেশ পরতে হবে না। নতুন শাড়ি ব্লাউজ সব কিছু পাবে।"

ধন্যবাদ কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না নীলিমা। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। মুখখানা রক্তিম অভিমানে লাল হয়ে উঠল। বাড়ির দিকে ছুট

দিল নীলিমা। মনে হ'ল দেবী দুর্গার বলি পূজার বদ্ধভূমিতে তাকে আনা হয়েছে বলিদান দেবার জন্য।

মাথার উপরে জমাট মেঘের বুক থেকে অন্য এক সানাইয়ের সুর ছড়িয়ে পড়ছে শারদ আকাশে, ঠিক যেন কান্নার মত। বৃষ্টি নেমেছে অঝোর ধারায়।

ভুবনের গল্প
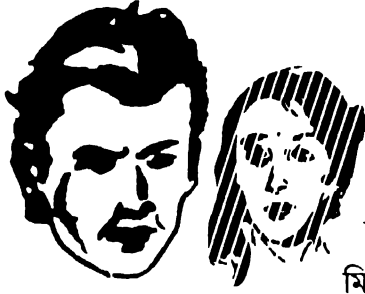
ভুবনের সংসারে কাজের বোঝা কিছুটা হালকা করে দিতে মাঝে মাঝে আসে মিনতি, মানে ও পাড়ার মিনতি বৌদি। আজও এল পড়ন্ত বেলায়। এক চিলতে লম্বা রোদ তখনো আঁকড়ে ছিল ভুবনের ভিটে। কথার ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে এল ছায়া। উঠি উঠি করেও উঠল না মিনতি বৌদি। পান সাজতে বসল। ছোট এই নির্জনতাকে ঘিরে ওর রহস্যময় দুটি চোখ উচ্ছ্বসিত আমন্ত্রণে তৎপর হয়ে উঠল। এ আমন্ত্রণে সাড়া দিলে নারী তার গোপন ঐশ্বর্য দু'হাত ভরে অঞ্জলি দিতে পারে।

মিনতি বৌদির দিকে একবার তাকাল ভুবন। সুঠাম দেহের ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ তুলে নাচছে এক লোনা সমুদ্র। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ডুবে সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায় গভীর অতল অন্ধকারে। বাতাসে কেঁপে ওঠা পাতার মতন শিরাগুলো শির্ শির্ করে নাচতে লাগল, বুকের ভিতর শুনতে পেল ঝড়ের গর্জন। অনিবার্য আত্মসমর্পণের প্রচন্ড তাগিদ অনুভব করল ভুবন। ঠিক তখনই ভেসে উঠল মনোরমার মুখখানা। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল সমস্ত উত্তাপ। প্রতিক্রিয়াহীন নীরবতায় পায়ে পায়ে নেমে এল উঠানে। কি যেন ভাবল আকাশ পানে একবার তাকিয়ে, তারপর সাজানো প্রদীপটা জ্বেলে নিয়ে তুলসীতলায় এল। এখনো ঘন চুলের রঙ ছড়িয়ে নেমে আসেনি অন্ধকার, সবে মাত্র নীল আকশের বুক ছুঁয়ে উঁকি দিয়েছে সাঁঝতারা। তাতেই সাত তাড়াতাড়ি পাট ঝাঁট চুকিয়ে নেবার ব্যস্ততা।

এ গাঁয়ের সবাই বলত সব পাড়ার শাঁখে জল পড়লে চৌধুরী পাড়ার

পিদিম জ্বলে। মাত্র ক'দিনেই সবার সে ধারণা বদলে দিয়েছে ভুবন। সংসারের সব দায়িত্বই এখন তার একার। ছেলে দুটো এবং মেয়েকে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাওয়ানো থেকে শুরু করে গোয়াল ঘর পরিষ্কার, গরুকে জাবনা দেওয়া — সব এখন একক দায়িত্বে। সব কিছু সামাল দিতে দিতে কেমন যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে ভুবন। অথচ মাত্র দেড় মাস আগে সে ছিল বুনো ঘোড়ার মত টগ্‌বগে। বাইরে মজুর খেটে আনা পয়সাগুলো মনোরমার হাতে তুলে দিলেই ছুটি। ভুবনকে আর ধরে কে। ভুবন তখন দিনকা উজির, রাতকা বাদ্‌শা। সন্ধ্যা হলেই বাড়ি থেকে উধাও। বোসেদের আম বাগানে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগ দিত আড্ডায়। চাটের থালা সামনে রেখে গেলাসের পর গেলাস তাড়ি শেষ করে দিত ঘন্টা খানেকের মধ্যে। এরপর সারা সময়টা জুড়ে একের পর এক যত রাজ্যের ভালোবাসার গান। সাত সাতটা স্বর্গ এক সঙ্গে নামিয়ে আনলে যা হয় তাই হ'ত তখন। কোন কোন দিন নেশাটা ঠিক মত জমে উঠলে শুরু হ'ত তাস খেলা। কখনো বা কোমর দুলিয়ে টুইষ্ট নাচের সঙ্গে গান — "পিরিতের এমন জ্বালা, ও সই পিরিত কোরো না।"

মনে হ'ত না আছে সংসার, না আছে দায়িত্ব, কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারত না। বলার থাকলেও বলবে কেমন করে। সে পথ বন্ধ করে দিয়েছিল ভুবন। মনোরমার পিঠের কালসিটে দাগগুলো কি মিলিয়ে যেতে দিয়েছে কোনদিন। মনোরমা জানত, কিছু বললেই এ মরদ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুনো বাঘের মতন।

বুনো এ জন্তুটাকে কোনদিন বাগ মানাতে পারেনি মনোরমা। রাতে নেশার রঙটা একটু চেকনাই হলেই বাদুড় ধরার নাম করে উঠে পালাত ভুবন। পড়শীদের ঘুমের ফাঁকে চুপি চুপি ঢুকত মিনতি বৌদির ঘরে।

রাতে ভুবনের সঙ্গে অবৈধ্য মিলনের পরেও বাইরে সবার কাছে মিনতি বৌদি চূড়ান্ত ন্যাকামি করে বেড়াত। পাড়ায় পাড়ায় জানান দিত — "পরদেশে মরদটার জন্যে পরাণটা কি কম ধানাই পানাই করে গো।"

শুনে মনে মনে হাসত ভুবন। নেশার ঘোরে গান ধরত — "মরি মরি ও সখি রে, এই তাড়িখোর ভুবন শেয়াল্ কেমনে আসিল বিছানা পরে,

যদি জানিত সকলে, তোরে পূজিত কি বলে, আমরে মারিত তোর তরে।"
এই মিনতি বৌদির এখনো ঠসক কত। দেখলে কত জোয়ান মরদের মাথা ঘুরে যাবে, ভুবন তো চুনোপুঁটি মাত্র।

আগে সন্ধ্যা হলে নেশায় চড়ন লাগাত ভুবন। কিন্তু আজ গিলতে শুরু করেছিল সেই বিকেল থেকে। ভরা ডাবরি প্রায় শেষ। এত টেনেও কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে নেশা জমছে না ঠিক মত। অথচ ইচ্ছা ছিল নেশার চূড়ান্ত সীমাটাকে আজ শেষবারের মত ছুঁয়ে দেখবে ভুবন।

তুলসীতলা থেকে চোখ পড়ল বাদুড় ধরা জালটার দিকে। সমান্তরাল ভাবে টাঙানো আছে তাল গাছ থেকে লিচু গাছ পর্যন্ত। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাদুড় উড়ছে ডানা মেলে, যে কোন মুহূর্তে ফাঁদে জড়িয়ে যেতে পারে। সে বাদুড়ের জবা ফুলের মত লাল টকটকে মাংসে লোভনীয় চাট তৈরি হয় আজ যেই বাদুড়কে এমনি ভাবে উড়তে দেখে আসন্ন বিপদের কথা ভেবে অজানা একটা মমতা অনুভব করল প্রাণে। ঢিল ছুঁড়ে তাড়াতে তাড়াতে বলল —"মরবি শেষে, পালা — পালিয়ে যা।"

এই কয়েক দিন ধরে সন্ধ্যা নেমে এলেই কেমন আনমনা হয়ে ওঠে ভুবন। পিদিমটা হাতে নিলে মনটা হু হু করে ওঠে মনোরমার জন্যে। অতীতের ছবিগুলো ভাসতে থাকে একের পর এক। কেমন ধীর পায়ে মনোরমা এসে দাঁড়াত ঐ তুলসীতলায়, গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম সেরে যখন সে উঠত তখনকার সেই রূপটুকু বর্ণনা করার ক্ষমতা নেই আজও। শুধু মনে হয় সেই ছেলেবেলাকার কথা। বামুন পাড়ায় দুর্গা ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল সেবার। এক জন মেয়ে এল পিদিম হাতে, পায়ে আলতা, পরনে লাল পাড় শাড়ি, সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর। প্রতিমাকে প্রণাম করে যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন তাকে মা বলতে ইচ্ছা করছিল ভুবনের।

প্রদীপ হাতে মনোরমার রূপের সামনে দাঁড়াতে ভয় পেত ভুবন। মনোরমা কোন কথা বলত না। অসহায় দুটি চোখ মেলে তাকাত নীরবে। তারপর ও যেন হারিয়ে যেত অনেক দূরে।

ওর নীরবতা ভয়ঙ্কর একখানা চাবুকের মত সপাং করে এসে আঘাত

করত মনটাকে। হার না মেনে মনে মনে হিংস্র এবং জেদি হয়ে উঠত ভুবন। "এ সব প্যান প্যানানিতে এ শর্মা ভুলবার নয়।" আস্ফালন দেখিয়ে আর ঘরে থাকত না, সোজা চলে যেত বোসেদের বাগানে। সংসারটা খড়কুটোর মত এক পাশে পড়ে থাকত।

রোজ চৌপরে কাজ থেকে এসে খাওয়ার পর সারা বিকালটা বসে বসে শানবাড়িতে ছুরি শানাত ভুবন। পড়ন্ত বেলায় বাঁশ বেয়ে উঠে যেত তাল গাছের মাথায়। মোচায় ছুরির প্যাঁচ লাগাতে লাগাতে গান ধরত তারিয়ে তারিয়ে —"আমি ভোমর হয়ে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াব।" এখন ঠিক এই মুহূর্তে তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে গাইতে ইচ্ছা করছে —"এমন মানব জমিন রইল পতিত্ আবাদ করলে ফলত সোনা।" ঠিক প্রাণখুলে গাইতে না পারলেও সুরটা গোপন মনের উপর ঢেউ তুলতে লাগল নতুন ইঙ্গিত নিয়ে।

কেউ মারা গেলে মেয়েরা যখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত, তখন সেই আক্ষেপের কথাগুলো নতুন করে সাজিয়ে প্যারোডি গাইত আর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত। অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসত ভুবনকে, আজ মনে হ'ল সে যদি ঐ রকম করে একটু কাঁদতে পারত মনোরমার জন্যে।

তুলসীতলায় প্রণাম সেরে উঠে এল ভুবন। একবার তাকাল সমস্ত ঘরখানির দিকে। মনোরমা যেন সব জায়গায় বিছেয়ে রেখেছে নিজেকে। কঠিন মৃত্যু কিছুই মুছে ফেলতে পারেনি। ভারায় ছেঁড়া শাড়িটা পর্যন্ত পরিপাটি কারে সাজানো। লোকজন এলে বসতে দেবার আসনটাও বাদ যায়নি। মনে হয় মাত্র কিছুক্ষণের জন্য কী একটা দরকারে একটু বাইরে গেছে মনোরমা।

দিনের পর দিন জ্বরে ভুগে মনোরমা ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ব্যাপারটা জানিয়েছিল ভুবনকে। কিন্তু জানালে কি হবে, অবুঝকে বোঝাতে পারে কে। ভুবনেরও সেই অবস্থা। কথাগুলো এক কান দিয়ে ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে। শুনবে যে সে তখন ঘরে নেই। একটা নেশার উপর আর একটা, রঙে রঙে ভুবনের ভুবন তখন রাঙা। রাতের অন্ধকারে চলছে অন্য খেলা। মিনতি বৌদির বিছানায় মাঝ রাত পর্যন্ত কাটিয়ে ফিরে আসছে বাড়ি।

এসে দেখত খাবার ডিশ্‌টার সামনে তখনো জেগে বসে আছে মনোরমা। খেতে বসলে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত ভুবনকে। কি বুঝত কে জানে। হয়ত বা গোপন আয়নায় ফুটে উঠত রাত্রির কারুকার্য। ধীরে ধীরে ওর রাতজাগা মুখখানা হয়ে উঠত ভয়ঙ্কর করুণ। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলত, "এমন করে রাত জাগলে খাটা খাটনির দেহটাকে সামাল দেবে কেমন করে।" যতক্ষণ খাওয়া না শেষ হ'ত, ঘুমে ঢুলে পড়লেও ঠিক বসে থাকত সামনে।

তবুও মন ভরেনি ভুবনের। সামান্য কিছু খুঁত দেখলেই মেজাজ পঞ্চমে, একেবারে শনিঠাকুর। বিশেষ করে জমজমাট নেশা নিয়ে হঠাৎ ঘরে ফিরলে ধাপে ধাপে চড়ত গলা। তখন আর রাখা ঢাকা বলে কিছু নেই। "এখনো পেতনির মত আগলে আছিস্ সব। লজ্জা করেনে তোর, তুই ভাগাড়ে গেলে তবেই আমার শান্তি।"

শুধু শুনে যেত মনোরমা। প্রতিবাদ করেছিল মাত্র একবার। "কোথায় নেমে যাচ্ছ খেয়াল আছে কি? অগ্নি সাক্ষি করে আমাকে এনেছিলে খেয়াল নেই?"

ঠিক সেই মুহূর্তে অমন সাজানো গোছানো নেশাটা ফিকে হয়ে গিয়েছিল এক নিমিষে। চমকে উঠেছিল ভুবন। হোমের শিখা উঠছে দুলে দুলে, পরণে বরের সাজ, দু'হাতের বেষ্টনীর মাঝে মনোরমাকে সামনে নিয়ে একই পিঁড়ির উপর দুজনে দাঁড়িয়ে। মনোরমার নরম হাতটা ওর দু'হাতের উপর। খই নিয়ে আহুতি দিচ্ছে হোমকুণ্ডে। উচ্চারিত হচ্ছে বেদ মন্ত্র। চোখের সামনে দিয়ে সেই স্মরণীয় মুহূর্তগুলো ছুটতে লাগল চলন্ত ট্রেনের মত। ভুবনের শরীরটা কেঁপে উঠল একবার। তার চারপাশে কী গভীর অন্ধকার, কোন মতেই সে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সরু এক ফালি আলোর মত মনোরমা তখনো দাঁড়িয়ে। বুকের ভিতর ফিরে এল সাহস। সেই আলোর পথ ধরে উঠে এল ভুবন। "রাগ করিস্ নি মাইরি, তুই দেখে নিস্ আর কোন দিন পা টলবে না এ শর্মার।"

সে রাতে এতটুকু বুঝতে দেয়নি মনোরমা যে সে চিরকালের জন্যে

চলে যাচ্ছে। ক'দিন থেকেই দাওয়ার উপর চাটাই বিছিয়ে আলাদা বিছানায় শুত ভুবন। রোজকার মত শুতেই ঘুম এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে, একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর জাগায় কার সাধ্যি। কথায় বলে মাতাল ঘুমালে বুকের উপর দিয়ে হাতি গেলেও আর জাগে না। টানা একটা ঘুমের পর যখন জাগল তখন উঁকি দিচ্ছে ভোরের আলো। কাজে যাবার আগে সারা রাতের ঝরে পড়া রস নামাতে হবে গাছ থেকে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে ভুবন দেখল তার পায়ের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মাটির উপর মুখ উপুড় করে শুয়ে আছে মনোরমা। এ দৃশ্য দেখে মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল ভুবনের। "ন্যাকামি করে মাটিতে শুয়ে আছিস্ কেন। এই না তোর শরীর খারাপ?"

কিন্তু কোন উত্তর নেই। উঠেও বসল না মনোরমা। ক্ষেপে গিয়ে ঠেলা মারল ভুবন। "এই শুনতে পাচ্ছিস নি বুঝি?" এবারেও কোন সাড়া নেই। চমকে উঠল, মারা গেছে নাকি!

তখনো এমন ভাবে শুয়ে আছে যেন ভুবনের পায়ের ধুলো নেবার অন্তিম ইচ্ছায় বাড়িয়ে দিয়েছে হাতটা। হয়ত বা তাই। যাবার সময় হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে কত কষ্টেই না এসেছিল বাইরে। মাটির উপর ঘসে ঘসে আসার স্পষ্ট দাগ। নিশ্চয়ই বলার ছিল কিছু, হয়ত বা বলেও ছিল। কিন্তু শোনা হ'ল না অভাগীর শেষ মিনতি।

ছোট মেয়েটি তখনো ঘুমিয়ে ছিল মায়ের বিছানায়। বড় ছেলেটা বুঝতে পেরে কান্না শুরু করে দিয়েছিল। মেজটা জানতে পারেনি কী হয়েছে। দাদার কান্না দেখে মায়ের আঁচল ধরে টানছিল। কেঁদে ফেলল ভুবন।

সেদিন থেকে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার আগে ভুবন দরজার সামনে দাওয়ার এই থানটায় নিত্যই একবার দাঁড়ায়। ক্ষণিক আলোয় গোপনে মনটাকে কাঁদবার মত একটু সময় করে দেয়।

মিনতি বৌদি পান সাজতে সাজতে বলল "আজ যেন বড় আনমনা ঠাকুরপো।"

আচমকা একটা হোঁচট খেল ভুবন, সামলে নিল পরক্ষণেই। "তুমি কি তাই দেখছ?"

খানিকটা যেন সাহস ফিরে পেল মিনতি। আলতো একটু হাসল। "আমি ভাবলুম তুমি বুঝি কোথায় হারিয়ে গেছ। সামান্য সন্ধ্যাদীপ দিতে যদি সাত ঘন্টা লাগাও বাকি কাজ সারবে কখন।"

এ হাসির অর্থ বোঝে ভুবন। এ টানে বুকের গভীরে জোয়ার আসে। সে উত্তাপ আজ কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। তবুও উত্তর দিল, "মানুষ কি সব সময় অসুবিধার কথা ভাবে, না-ভেবে কাজ করে।" স্বরটা সামান্য একটু জড়াল মাত্র। পা দুটো সামান্য কিছু টলল একবার। তারপর নিজেই উত্তর দিতে লাগল মন থেকে উঠে আসা প্রশ্নের। "নাও বাবা টলে নাও শুধু শেষ বারের মতন। গোটা ডাবরির তাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে পেটে। রঙ্ তো একটু লাগবেই। সব ছেড়ে ছুড়ে এখন চল দিকি মা লক্ষ্মীকে একটা পেন্নাম করে নিই।"

অবাক হ'ল মিনতি। ভুবনকে সে চেনে, সে মাতাল, প্রতি ডাকে সাড়া দেয় কিন্তু এ ভুবন কেমন যেন দুর্বোধ্য।

মাটির ঘরে কোন তক্তাপোষ নেই। মেঝেতেই শোয়া বসা, দেওয়ালে ঝুলছে মা লক্ষ্মীর পট। মনোরমা প্রতি দিন মা লক্ষ্মীর পায়ে ফুল ছুঁইয়ে তবে খেত, সন্ধ্যায় প্রদীপ দিত। তার দেওয়া মালাটা শুকনো হয়ে গেলেও এখনো ঘিরে আছে গোটা পট খানা, এখনো কত সুন্দর।

মিনতির পাশ কাটিয়ে পটটার সামনে এসে দাঁড়াল ভুবন। দু'হাত অঞ্জলি করে প্রদীপটা তুলে ধরে কী যেন খুঁজতে লাগল। গাল বেয়ে নেমে এল নীরব দুটি নদী। "কৃপা করে অধমটার প্রণাম তুই নে মা। সে থাকলে কত আদর করত তোকে। আমি কি এ সব পারি। তুই তাকে শান্তি দিস্ মা।"

ঘেমে উঠেছিল মিনতি বৌদি। শ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন। উঠে দাঁড়াল এবার। "ঠাকুরপো, আমি এখন আসি। আজ শনিবার তো, বালেশ্বর থেকে তোমার দাদার বাড়ি ফেরার কথা। হাঁ, রেকাবির উপর তোমার জন্য পানটা রইল।"

আজ কোন কথা কানে গেল না ভুবনের। কাঁদলে যে এত আনন্দ হয় এই প্রথম বুঝতে পারল। বুক জোড়া গভীর তৃষ্ণার উপর নেমে আসছে বৃষ্টি, অজস্র ধারায়। আঃ কী মধুর শান্তি! বিস্ময়ে পটটার সামনে গড় হয়ে একটা প্রণাম রাখল ভুবন।

এক সময় পাশাপাশি ছিল দুটি বড় বড় পুকুর। চারপাশে উঁচু উঁচু পাড়, গাছ গাছালিতে ভরা। অনেকটা জমিদারের শখের বাগান বাড়ির পুকুরের মত। দুটি পুকুরের মধ্যবর্তী পাড়টা ক্ষীণকায় হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে বিরাট একটা দীঘির রূপ নিল। অতীত দিনের সাক্ষী হিসাবে রয়ে গেল দুটি ঢিবি। প্রত্যেকটিতে একটি করে নারকোল গাছ সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে তখনো মাথা উঁচিয়ে। চারপাশে থৈ থৈ জল, মাঝখানে ঠিক যেন দুটি সবুজ দ্বীপ। দৃশ্যটা চোখে পড়ার মত।

স্নান এবং প্রাতরাশ সেরে পানকৌড়িটা প্রতিদিনের মত আজও ধ্যানমগ্ন দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল নীল আকাশটার দিকে। দক্ষিণ দিকের ঢিবিটার উপর একবার চোখ ফেরালেই যে কেউ এই সুন্দর ছবিটা দেখতে পেত। অত দূরে বন্দুক তাক করেও সুবিধা হবে না জেনে শিকারিরা ওকে বিব্রত করেনি।

ঠিক দুপুর, দোতলার জানালার পাশে বসে মল্লিকা দেখছিল পানকৌড়িটাকে। কী সুন্দর চিকন কালো রূপ। বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। প্রশ্ন জাগে ও এমন একা থাকে কেন? ওর সঙ্গী কোথায়? সে কি কোথাও

হারিয়ে গেছে, অথবা এখনো কাউকে সঙ্গী হিসাবে পায়নি! তবে কি ও সবার মাঝে অপাংক্তেয়?

মনের সঞ্চিত ভালোবাসা ওকে ঘিরে আবর্তিত হয়। নিজের জীবনের সঙ্গে ওকে মেলাবার চেষ্টা করে। ওই ঢিবিটা যেন পৃথিবীর সুখ দুঃখের মহাবেদি। জীবনকে অনেকখানি দেখেছে বলেই চারপাশে ব্যথার প্রদীপ জ্বালিয়ে ও এত উদাসীন। ভালমন্দ লাভক্ষতি কিছুই যেন ওকে স্পর্শ করতে পারছে না, ও হয়ত আঘাত খেতে খেতে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। নিজেও স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছে মল্লিকা। যুগের চাহিদার মাপকাঠিতে পাত্রী হিসাবে সে নট্ আপ্ টু দি মার্ক। কারণ সে গৌরবর্ণা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বিয়ের বাজারে গৌরবর্ণা না হওয়ার কারণে প্রথমেই এইটটি ফাইভ্ পার্সেন্ট মাইনাস্ হয়ে গেছে। পাশ করবে কেমন করে। জেনে গেছে স্বপ্নের পৃথিবীটা তার জন্যে নয়। সবার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে কাটাতে হবে সারাটা জীবন।

আজ সকালেই একটা দল এসেছিল। নায়ক স্বয়ং একজন এম, বি, বি, এস, ডাক্তার। নির্দেশ মত চলন দেখাতে হল, কথাবার্তায় অংশ নিতে হ'ল, গাইতে হ'ল, রান্না করা সেলাই করা জানে কিনা তার উত্তর দিতে হ'ল, সব শেষে কিছু কুইজের প্রশ্ন। এত কিছুর পর সকলে ভাল কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু যাবার সময় নায়ক মন্তব্য করলেন—"গড়ন, লেখাপড়া, পরিবেশ ব্যবহার সবকিছু ভাল, দেখতেও সুশ্রী, তবে রঙটা আরো উজ্জ্বল চাইছি"।

এ রকম মন্তব্য অনেকেই করেন। আঘাত সহ্য করার অভ্যাসটা সকলেরই গড়ে উঠেছে তাই রক্ষে। কারও মনকে বড় একটা স্পর্শ করেনা। প্রথম প্রথম মল্লিকা দেখত যখনই কোন সম্পর্ক খানিকটা এগিয়ে আর এগোত না তখনই বাবা মার চোখে ঐ পুকুরটাও থেকেও যেন অনেক বেশি জল টলমল করত। এইভাবে হারতে হারতে মনটা আর সহ্য করতে চায় না, পারেও না। মনে মনে ভাবে আর কারও সামনে এভাবের পরীক্ষায় বসবে না। কিন্তু বাবা মার কথা ভেবে তা পারে না, বাধ্য মেয়ের মত পায়ে পায়ে দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে আবার বসতে হয়।

মল্লিকা জানে পছন্দ হওয়ার পর্ব শেষ হলে দ্বিতীয় পর্বে যখন দেনা পাওনা শুরু হয় তখন পাশ করা আরো কঠিন। মাত্র চরিদিন আগে একজন সরকারি চাকুরে এসেছিলেন। উপার্জন ক্ষমতার বিচারে নিম্ন মধ্য বিত্তের উপযুক্ত। গত দু'বছরে তিনি দেড়শ'র মত পাত্রী দেখা শেষ করেছেন কিন্তু এখনও কাউকে পছন্দ করতে পারেননি। তথ্যটা জানিয়েছিল ও পাড়ার অজন্তা। হাসতে হাসতে বলেছিল, "উনি এত মেয়ে দেখেছেন তবু একটাও পছন্দ হয়নি। আমার মনে হয় উনি আয়নায় নিজের মুখটা একবারও দেখেননি। দেখলে আঁতকে উঠতেন।" পাত্রের সাম্‌না সামনি হতেই সেই দেড়শ' মেয়ের অপমান বুকের ভিতর যেন মস্ত কাল বোশেখির রূপ নিল।

পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?' মাথা নীচু করেই উত্তর দিল মল্লিকা, "একশ' একান্ন।"

"না, না, সংখ্যা জানতে চাই না, নামটা জানতে চাইছি।"

"উত্তর তো দিয়েছি, কানে কম শুনলে ভাল করে জেনে নিন আমার নাম একশ' একান্ন।"

'অর্থাৎ?'

"আপনার দেখা দেড়শ' মেয়ের সঙ্গে আমাকে যোগ করে দেখুন একশ' একান্ন হয় কিনা।"

উঠে পড়লেন ভদ্রলোক তার ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে। ততক্ষণে বাবার চোখ কপালে উঠেছে, "এ তুই করলি কি? তোর মার কানেরটা বেচে ঘটককে অগ্রিম তিনশ' টাকা দিয়েছি, তবেই না ঐ ছেলের সন্ধান পেয়েছিলাম।"

"তোমাদের পায়ে পড়ি আর আমাকে নিয়ে তামাসা করো না। আমি কি পুতুল, আলমারি থেকে বের করে দেখাবে। আমার পথ আমি দেখে নেব, আর তোমাদের ভাবতে হবে না।"

কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মনের মাঝে। আবার তাকাল পানকৌড়ির দিকে। লম্বা ডানা দুটি মেলে ভিজেমাটির উত্তাপ সুখ অনুভব করছে। একা, তবু কোন ব্যথা ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার মত এত অপমানের বোঝা ওকে নিশ্চয়ই বইতে হয়নি। নারী বলেই কি নির্যাতন সইতে

হবে? আর বেশি ভাবতে পারেনা মল্লিকা। চারপাশে অন্ধকার যেন দানা বাঁধে। এম.এ. পাশ করার পর চাকরির অনেক চেষ্টা করেও কিছু মিলল না। চারপাশে ইভটিজিং যে ভাবে বাড়ছে অপরের বাড়িতে টিউশানি পড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার অভাব। কিন্তু একটা তো কিছু করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত একটা পথ খুঁজে পায়। স্থির করে মান অভিমান মুছে ফেলে এবার থেকে কাপড়ে জরি বসানোর কাজটাই সে শিখে নেবে।

নারী প্রগতির নামে বক্তৃতা অথবা আন্দোলনে ঘেন্না ধরে গেছে মল্লিকার। যারা কিছু বলেন শুধুমাত্র বাহবা পাওয়াটাই তাদের লক্ষ্য। কাজের সঙ্গে কথার কোন মিল নেই। মল্লিকা ভাবে ঐ একশ' পঞ্চাশটা মেয়ে একসঙ্গে গর্জন করে উঠল না কেন? ছেলেরা জাম্বুবানের বরপুত্র হয়েও স্পর্ধার সঙ্গে মেনকাসুন্দরী খুঁজে বেড়ায়। তাদের এই ব্যভিচারিতার বিরুদ্ধে সকলে কেন এখনো নীরব?

সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাবার আশায় সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, এত অপমান নিয়ে নিজেকে পণ্য করে তোলা, মন কোনমতে সায় দেয়না। পানকৌড়িটার মত স্বাধীনভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। নিজের সবকিছুর সংস্থান নিজেকেই করে নিতে হবে। নতুন একটা যুগ আসছে, দারুণ ঝড় উঠবে। মনের কোণে তারই গন্ধ মেলে। সাবেকি আমলের বর-বর-কনে-কনে খেলার দিন তাদের কাছে আর আসবে না! চাই নারী জাগরণ, তবেই আসবে মুক্তি।

অভিজ্ঞতার আর এক পৃষ্ঠা মেলে ধরে মল্লিকা। প্রতিষ্ঠিত উপার্জনক্ষম অথচ শিক্ষিত এমন যে সব পাত্র তাদের কী আকাশ ছোঁয়া দাম! গতমাসের অভিজ্ঞতার কথা কি সহজে ভোলা যায়? হাওড়ায় এক নামকরা কলেজের কোন এক বিভাগীয় প্রধান পাত্র হিসাবে এলেন দু'জন সহকর্মী অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে। প্রথম দফায় পাশ করার পর দ্বিতীয় দফায় এলেন বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়র দাদা, সঙ্গে স্ত্রী এবং দিদি। বুক কাঁপান ভয়ের ভিতর দিয়ে উত্রে গেল কোন মতে। তৃতীয় দফায় এলেন মা এবং ভাই। এতেও হ'ল না, চতুর্থ পর্বে কোষ্ঠি পাঠাতে হল। রাশিচক্রের বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে ডাক দিলেন সেখানে যাবার জন্য। খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়েকদিন ধরে চলল অগণিত স্বপ্নের মিছিল। নির্ধারিত দিনে যাত্রা শুরুর আগে বাবা মা ঠাকুর

দেবতাকে একশ' আটবার ডাকার পরিবর্তে হাজার আটবার ডেকেও স্বস্তি পেলেন না। দুর্বলতা এমন পেয়ে বসল যে হাঁটতে গেলে পড়ে যাবেন। সেই অবস্তাতেই গেলেন সল্টলেকে ইঞ্জিনিয়ার দাদার বাড়িতে। দেনা পাওনার ব্যাপারে জানালেন হাওড়ায় তাদের নামে সাড়ে আট লাখ টাকা দিয়ে একটা বাড়ি কিনে দিতে হবে, সেই সঙ্গে ভরি দশেক সোনার গহনা এবং সংসার সাজানোর জন্য ফ্রিজ ইত্যাদি অন্যান্য সামগ্রী। দাবি শুনে চায়ের কাপটাও মুখে তুলতে সাহস করেননি কেউ। রাত্রিতে কলকাতা থেকে যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন তাঁদের পানে তাকাতেও ভয় করছিল।

চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে পানকৌড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মল্লিকা। পুকুরের ওপাশে গাছের মাথার উপর সুদূর প্রসারিত নীল। বেলা পড়ে আসছে। আলোর রঙ বদলাচ্ছে। আবার জলে নামল পানকৌড়ি। অবাক হবার মত দৃশ্য। পালিত হাঁসের দলে মিশে গিয়ে দিব্যি ডুব দিচ্ছে, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিকার করা মাছ গিলে খাচ্ছে। এক প্রজাতির নয় তবু কী অপূর্ব সহাবস্থান। প্রকৃতি বিজ্ঞানী এ দৃশ্য দেখলে ছবি তুলে রাখতেন। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সব চিন্তার কথা ভুলে যায়, প্রশান্তি নেমে আসে মনে। দুঃখ ভুলে পানকৌড়ির মত সেও জীবনটাকে মানিয়ে নেবে। না, আর সে বিয়ের ব্যাপারে নিজেকে এমন ভাবে ভারাক্রান্ত করবে না। সমস্যার আবর্জনা থেকে সে নতুন রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। যদি সুদিন আসে কোন এক অনাথ শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের মত করে মানুষ করে তুলবে।

ভাবনা যখন এই খাতে বইতে শুরু করে ছিল তখনই গোধূলির আবির মাখা আকাশে ডানা মেলল পানকৌড়ি। বিস্ময়ে তারই দিকে তাকিয়ে রইল মল্লিকা। সোনালি আলোর মাখামাখিতে শ্যামচিকন পাখার কী অপরূপ রূপ। এখন আর কালো বলে মনেই হচ্ছে না। ঐ পানকৌড়িটার মত নিজস্ব ভুবনে সেও যে বাঁচতে চায়। হ্যাঁ, সে বাঁচবেই, কারণ বাঁচার অধিকার নিজের হাতেই থাকে।

দূরে অতি দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল পাখিটা, ঠিক যেন বিন্দুর মত। তখনই মনে হল ও যেন অসংখ্য বিন্দুর একটা বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করল। ঠিক

তখনই ওকে আক্রমণ করল একটা দুরন্ত শিকারি বাজ। ওর গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল মল্লিকা।

ইতিমধ্যে মা বাবার মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মল্লিকা জানে তাকে কেন্দ্র করেই এ সংসারে গত কয়েক বছরে ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটে চলেছে। কিন্তু করার কিছু নেই, চুপ করে থাকতে হয়। রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠলেও উভয়ের চোখের জলে আবার তা নিভে যায়। কিন্তু আজকের বচসা যেন একটু অন্য ধরণের। বাবা এবং মার গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়ছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে লাগল ভেসে আসা কথাগুলো।

"অনেক তো চেষ্টা করলাম, কিছু হ'ল কি? হবে না, কিছু হবে না, তোমার মেয়েকে কোন রাজপুত্তুর মালা দেবে না। এই বলে রাখলাম।"

"মেয়েটা তো মরতে বাকি আছে। ও কি দোষ করেছে বলতে পার?"

"ওর মত ভাঙা রাশ কটা মেয়ের আছে। কত সম্বন্ধ আনলাম সব ভেঙে গেল। দেখাতে দেখাতেই ফতুর। বাড়ি আর পুকুরটা ছাড়া আর কিছু আছে কি?"

"কত লোকের মেয়ের বিয়ে হয়নি। অনেকের বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেল। তাদের বাবারা তো তোমার মত এমন পাগলামি করেনা।"

"কি আমি পাগল। তা তো বলবেই। এতদিন ধরে তুমি তবে একটা ছেলে এনে দেখাতে পারলে না।"

"পারিনি ঠিক কথাই, কিন্তু তোমার মত দাঙ্গাও করিনি। চোখের মাথা খেয়েছ নাকি, মেয়েটার কি ছিরি হয়েছে দেখেছ।"

শান্ত হওয়ার পরিবর্তে গলার স্বর চরমে উঠে। 'মরুক বাঁচুক অত দেখার দরকার নেই। আজ যারা আসবে তাদের সামনে ওকে আসতেই হবে।"

মল্লিকা সম্পূর্ণ নীরব। দৃষ্টি আকাশটার দিকে স্থিরবদ্ধ। দেখল সোনার বরণ আকাশটা জ্বলছে। মনে হল শিকারি বাজ পানকৌড়ির ক্ষতবিক্ষত দেহটা নিয়ে নেমে পড়ল কোন এক নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়।

কতক্ষণ এইভাবে কাটল জানেনা। সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। সেই অন্ধকারের মাঝে উদ্দেশ্যহীনভাবে কী যেন খুঁজছিল। হঠাৎ ব্যস্ততার

সঙ্গে উপরে উঠে এলেন মা। সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললেন। দ্রুত উঠে আসার জন্য হাঁপাচ্ছিলেন।

"একবার নীচে চল মা, তোকে দেখার জন্য কারা যেন এসেছে।"

মল্লিকা নির্বিকার। শুধু মার মুখের দিকে একবার তাকাল।

চোখের জল আঁচলের খুঁটে মুছে নিয়ে আরাধনা দেবী বললেন, "তোর বাবার কথায় রাগ করিস্ না মা। ওর মত ভালমানুষ সংসারে কটা আছে। দেখছিস্ না, তোর জন্য ভেবে ভেবে অমন তেজি মানুষটা একেবারে কাঁটা হয়ে গেল।" সম্মতির অপেক্ষায় মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

ধীর পায়ে মার সঙ্গে নীচে নেমে এল মল্লিকা।

অবস্থা সামাল দিতে মা রান্নাঘরে ঢুকলেন। কিছু না হোক চা বিস্কুট তো দিতে হবে। প্রতিবারের মত নিজেকে সাজিয়ে তুলতে মল্লিকা নিজের ঘরে চলে গেল।

বছর দুই আগের একখানা বাঁধান ফটো শোভা পাচ্ছিল দেওয়ালে। হাসি হাসি মুখ, নিটোল স্বাস্থ্য, দুটি চোখে নিজের পৃথিবীকে সাজাবার অসংখ্য স্বপ্ন। পানকৌড়িটার মত পরাজয়ের কোন লক্ষণ নেই। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল বার বার। না, আগের ফটোর সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোন মিল নেই। যত্নে আঁকা একটা সুন্দর ছবির উপর একরাশ কালি ঢেলে দিলে যে অবস্থা হয় তার অবস্থাও অনেকটা তাই। মাথার চুল কমে গেছে, চোয়াল উঁচু হয়ে উঠেছে, ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছে। ফটোটা যেন তাকে বিদ্রুপ করছে। ভীষণ ভয় পেল মল্লিকা। সে কি তবে এক প্রেতাত্মা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মত কোন উপাদান তার সংগ্রহে নেই। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল বেশ কয়েকবার। পাউডার পাফ্ হাতে নিয়ে মুখে লাগাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মনোমত হ'ল না। চোখে কাজলের রেখা টানতে গিয়ে পেন্সিলটা এঁকে বেঁকে গেল। ব্যর্থতায় চোখে জল এসে গেল। ক্ষোভে দেওয়াল থেকে অতি প্রিয় ফটোটা ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর। ভাঙল আয়নাটাও।

এবার নিশ্চিন্ত। স্থির হয়ে দাঁড়াল আবছা অন্ধকারে। মুখে ফুটে উঠল

অদ্ভুত হাসি, এ হাসি মরিয়ার হাসি, কান্নার চেয়েও করুণ। যে জীবনে স্বপ্ন নেই, সে জীবন বাঁচার জন্য নয়। প্রতিদিনের মৃত্যু যন্ত্রণা আর সে সইবে না। পথ খুঁজে পেয়েছে এতদিন পরে। ভয় কিসের।

ওদের সকলকে আড়াল থেকে একবার দেখল মল্লিকা। কথাবার্তায় বুঝতে পারল পাত্রটিকে। সত্যিই এক অপূর্ব কৃষ্ণ কানাই। নোঙর মার্কা আলকাতরার টিনে ডুবিয়ে আনলে যেমনটি হয় ঠিক তেমনটি গায়ের রঙ্। মাথার হিপি চুলে শোভা পাচ্ছে সুন্দরবনের ঝোপ-জঙ্গল। বসন্তের দাগে সারা মুখটায় যেন কয়লার ঘেঁস বিছানো রাস্তার মত। হাতের আঙুলের আংটিগুলো দিয়ে গ্রহশান্তি এবং সময় বিশেষে ক্যারাটে মারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আছে। চোখের জল মুছতে গিয়ে হেসে ফেলল মল্লিকা।

কানে এল বাবার সেই পরিচিত স্নেহ মেশান ডাক। "কই মা, এস। এনারা অনেকক্ষণ বসে আছেন।"

ঘরে ঢুকে সকলকে নমস্কার জানিয়ে প্রতিবারের মত এবারেও সেই নড়বড়ে চেয়ারটায় বসল। ওরা পরস্পর নীচু গলায় কি বলাবলি করল। শেষ পর্যন্ত পাত্র প্রশ্ন করল, "দেখছেন তো আমার রূপ। রূপ না থাকলেও গাড়ি বাড়ি সব কিছু আছে। স্পষ্ট করে বলুন তো আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে কি না।"

মল্লিকা কিছু বলার আগে নিজেই উত্তর দিল। "আমি জানি কেউ তা পারবে না, আপনিও না। কারণ আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং।"

"কিছুক্ষণ পরেই আমি তা পারব।" স্বাভাবিকতা বজায় রেখে হাসল মল্লিকা। বাবা মায়ের চোখেও দেখা গেল মেঘমুক্ত চাঁদের হাসি।

উঠে দাঁড়াল মল্লিকা। ত্রস্ত গতিতে টেবিলের উপর থেকে জ্বলন্ত বাতিটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল আঁচলটা। মুহূর্তে জ্বলে উঠল সারা অঙ্গ। কোন চীৎকার নেই, সম্পূর্ণ নির্বিকার, বাতিটা তখনো হাতে, তেমনি জ্বলছে। পরক্ষণে সেটা ছুঁড়ে মারল লোকটার দিকে — "তামাসা করতে এসেছেন, মরুন আমার মত। পৃথিবীকে আরো কিছু যন্ত্রণা উপহার দেবার অধিকার আপনার নেই।"

আত্মরক্ষার সেই ভয়ঙ্কর ব্যস্ততার মাঝে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল মল্লিকা। তার দৃষ্টি তখন অনেক দূরে সেই নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে পানকৌড়িটা নিশ্চিন্তে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে আছে, বাতাসের কান্না শিশির হয়ে ঝরে পড়ছে সবুজ ঘাসের উপর।

ফসিল

মনে মনে হিসাব করল শুভদীপ পরীক্ষা শুরু হতে বাকি মাত্র একুশটা দিন। দেখতে দেখতে দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে। এই সামান্য কয়েক দিনের মধ্যে প্রিপারেসন নিয়ে ফাইন্যালে এপিয়ার অসম্ভব। কিন্তু শত অসুবিধাকে পিছনে ফেলে সমানে এগিয়ে চলেছে ছন্দিতা। ও হার মানার মেয়ে নয়। যে দৃঢ়তা ওর মধ্যে দেখা যায় তা ওর সমবয়স্কা অন্য অনেক মেয়ের মধ্যে নেই।

ছন্দিতা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে গোপনে আনন্দ অনুভব করে শুভদীপ। প্রয়োজনে কতবার সে বই হাতে গেছে ঐ লাল রঙা বাড়িটায়। প্রথম প্রথম কলিং বেল বাজিয়ে যাকে সামনে পেত তারই হাতে নিয়ে যাওয়া বইখানা ধরিয়ে দিয়ে বলত, "বইখানা ছন্দিতাকে দিয়ে দেবেন।" বাড়ির ভিতর ঢুকতে সঙ্কোচবোধ করত। কিন্তু যেদিন ছন্দিতার হাতে সরাসরি বন্দী হল সেদিন থেকে এক কাপ চা না খেয়ে, দুটো কথা না বলে তাড়াতাড়ি চলে আসার পথটা বন্ধ হয়ে গেল। পড়ার ঘরে বসে চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্প না করলে অভিমানে ছন্দিতা পড়ার জন্য নিয়ে যাওয়া বইখানা ফেরত দিয়ে বসবে। এভাবে মুখোমুখি বসে কিছু কথা বলার অন্য একটা স্বাদ খুঁজে পায় শুভদীপ। হয়ত বা ভালবাসার নতুন আলোয় অবুঝ মনের আত্মসমর্পণ।

ছন্দিতার বাবা নবেন্দু রায় গেজেটেড অফিসার। ইচ্ছা করলে প্রতিমাসে

হাজার হাজার টাকা ঘরে তুলতে পারতেন। কিন্তু আপন সততাকে কোন মতেই বিসর্জন দিতে চাননি। ফলে মাস মাহিনার উপর নির্ভর করে চলে এগার জন মানুষের সংসার। সবার সব দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জমার অঙ্কটা শূন্য হ'য়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের সততায় আস্থা নেই বলেই অকারণ তোষামদ ভালবাসেন না। এ কারণে অন্যদের প্রমোশন হলেও উনি কিন্তু রয়ে গেছেন একই জায়গায়। উনি বলেন, "এ যুগে সততার পুরস্কার ডিমোসন, কখন বা নেতাদের ইঙ্গিতে পাওনা হবে সাসপেনশন অর্ডার।"

ছন্দিতা বাড়ির অবস্থাটা বুঝে বলেই সহ পাঠীদের কাছ থেকে পড়ার জন্য বই চেয়ে নিত। বাড়ির উপর কোন রকমের চাপ সৃষ্টি করত না। অনেকেই বই দিত। শুভদীপও দিয়েছে। ভেবেছে ভাল ছাত্রী হিসাবে নতুন নতুন বই দেখার প্রবণতা। ওর রেজাল্ট ছিল ঈর্ষনীয়। ফ্যাইনাল পরীক্ষার কিছুদিন আগে শুভদীপকে একা পেয়ে ছন্দিতা বলল, "আমার একটা উপকার করবেন?"

"বলুন না কি করতে পারি।" ওর মুখের দিকে তাকাল শুভদীপ।

"দেখুন বইয়ের অভাবে মনে হয় আমার আর পরীক্ষায় বসা হবে না। সংসারে যা খরচ তাতে বাবাকে নতুন করে বিব্রত করতে ভয় হয়। আপনার কাছ থেকে কিছু বই পেলে উপকৃত হই।"

সেদিনের সেই আলাপ চারিতার পর ছন্দিতার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল শুভদীপ। বলেছিল, "বইয়ের অভাব হবে না। আজ থেকে ও দায়িত্ব আমি নিলাম।"

মুহূর্তে সব মেঘ সরে গিয়ে ওর মুখখানা আলোয় ঝলমল করে উঠল। "সত্যি!"

"সত্যি কি মিথ্যে দেখে নেবেন।"

কথার মর্যাদা রেখে চলেছে শুভদীপ। ছন্দিতার সান্নিধ্যে আসার ফলে নিজের মনের পরিবর্তন দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায়। ওর বিন্দুমাত্র ক্ষতি দেখলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠে প্রতিবাদ করে, কোন মতে সহ্য করতে পারেনা। আপন অগোচরে ভালবাসার রঙীন আশা বুকের ভিতর দামামা বাজায়। ছন্দিতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় যৌবনের স্বপ্নালি ভুবন। সময়ে সময়ে চিন্তা

করতে করতে মনে হয় এ একটা ব্যাধি। মানুষ যৌবনে এ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই চিন্তাগুলো বেশিক্ষণ আমল পায়না। বরং এই অবস্থাগুলোকে কেন্দ্র করে সে অবাধ আনন্দে ভেসে যেতে পারে। ভাললাগার তাগিদেই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় লাল বাড়িটার দিকে। মাঝে মাঝে ছন্দিতার সামনা সামনি না হলে মনটা কেমন তেতো হয়ে যায়, কোন কিছুই আর ভাল লাগে না।

ঝিল বরাবর রাস্তা ধরে খানিক হাঁটলেই ছন্দিতাদের বাড়ি। আপন মনেই পথ হাঁটছিল শুভদীপ। হঠাৎ বিশাল অর্জুন গাছটার কাছাকাছি হতেই দমকা বাতাসের মত উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে পা দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশটায়। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল দুজন যুবক যুবতী গল্প করছে। কান পেতে শুনতে লাগল ওদের কথা। ওরা এক বেকার যুবকের প্রেমের গল্প ফেঁদে মজা লুটছে। নায়ক নায়িকা পরস্পরকে ভালবাসে এবং ওদের ভালবাসাও নির্ভেজাল। কিন্তু বাদ সেধেছে বেকারত্ব। এই করুণ অবস্থার কথা ভেবে ওরা হাসছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শুভদীপ। অকারণ চিন্তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। ভাবল ওদের এই হাসি ওদের চিন্তার প্রতিরূপ। ব্যর্থতার বোঝাটা হালকা করতে এই ভাবেই হাসিতে ফেটে পড়ছে।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হল শুভদীপ। বেশ ব্যস্ততার সঙ্গে এগোতে লাগল ছন্দিতাদের লাল বাড়িটার দিকে। দারুণভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে ছন্দিতা। নিজের পড়ার ঘরে সম্পূর্ণরূপে বন্দি করে নিয়েছে নিজেকে, বাইরে বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ। নিজের সম্পর্কেও সচেতন হ'ল শুভদীপ। তাকেও ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

পড়ার ঘরের কাছটিতে এসে দেখল দরজা খোলা। ঢুকতে গিয়েই ভিতরের দৃশ্য দেখে অবাক হল। সারা ঘরময় বইপত্র ছড়ান। কি ব্যাপার! নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। ভিতরে যাওয়াটা ঠিক হবে না মনে করে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। কালবোশেখির আকাশ যেমন কিছুক্ষণ নীরব থেকে দুরন্ত ঝড় তোলে ঠিক তেমনি ক্ষণিক নীরবতাকে চুরমার করে ছড়িয়ে পড়ল ছন্দিতার মায়ের কণ্ঠস্বর। "সংসারে অভাবের জন্য আমি কি

দায়ী?" স্বরটা ভিতর থেকে এলেও বোঝা যাচ্ছিল ছন্দিতার মা কাঁদছেন।

উত্তরে গর্জে উঠলেন নবেন্দু বাবু, "নিশ্চয়ই দায়ী, তোমরা সকলে দায়ী, তোমাদের হাজারটা দাবি আমি মেটাতে পারব না। তিল তিল করে তোমরা আমাকে শেষ করে দিচ্ছ। শেষে কোনদিন ডাকাতি করতে বলবে।"

"লজ্জা করে না বলতে, অন্যে আমাদের দায়িত্ব নিতে যাবে কেন?"

"লেখাপড়া শেখানোর জন্য আর এত খরচের প্রয়োজন নেই।"

"একজন গেজেটেড অফিসারের মুখে এই কথা! ছিঃ!"

"ধিক্কার দিতে পার, চালাতে পারনা।"

"সে তো বলবেই। আর কোন্ গয়নাটা বিক্রি করতে বাকি আছে শুনি।"

তীব্র উত্তেজনার মাঝেও স্ত্রীর এই কথায় চমকে উঠলেন নবেন্দু রায়, নিমেষে নীরব হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ আগে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মাদের মত আচরণ করে বসেছিলেন। ছন্দিতার ঘরে ঢুকে বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, "চুলোয় যাক সব, আমি আর কারও পড়ার খরচ যোগাতে পারব না।" এখন নিজের আচরণের জন্য নিজেই মনে মনে লজ্জিত হলেন।

ছন্দিতা উত্তেজনার মুহূর্তগুলো এড়াতে অন্যত্র সরে গিয়েছিল। বইগুলো গোছাতে গোছাতে কেঁদে ফেললেন ইন্দ্রানী, বার বার বলতে লাগলেন, "অপরের দেওয়া বইগুলো নিয়ে এ ভাবে রাগ দেখানোর কোন মানে হয়।"

তীব্র অনুশোচনা এবং লজ্জায় ক্ষতবিক্ষত নবেন্দু বাবু প্রায় টলতে টলতে সামনের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে ছড়ানো বইগুলোর দিকে বোবার মত তাকিয়ে রইলেন। বেলা শেষের পৃথিবীর ধূসর বিষণ্ণতা এখানেও যেন সমানভাবে দানা বেঁধে উঠছিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ঢুকে পড়ল শুভদীপ।

আকস্মিক আগমনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। অবস্থা সামাল দিতে ছন্দিতার মা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে হাসিমুখে কথা বললেন।

"কখন এসেছ বাবা?"

"এইমাত্র, ছন্দিতা কোথায়?" এ বাড়ির ঘটনার কিছুই জানেনা এমনই একটা ভাব বজায় রেখে উভয়ের অস্বস্তি দূর করার চেষ্টা করল শুভদীপ।

"খানিক আগেও তাকে দেখেছি, এইমাত্র কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।"

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্দ্রানীর এই আশ্চর্য দক্ষতায় অবাক হয়ে গেলেন নবেন্দু রায়। স্ত্রীর উপর গভীর আস্থায় কিছুটা গর্ব অনুভব করলেন।

"ঠিক আছে, এই বইটা ছন্দিতাকে দিয়ে দেবেন।"

বইটা নিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠল ইন্দ্রানী দেবীর। একবার শুভদীপ আর তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসলেন, "এত তাড়া কিসের বাবা। চা তৈরি করি, খেতে খেতেই হয়ত ছন্দিতা এসে পড়বে।"

কিছুটা স্বস্তি দিতে ইচ্ছা করেই ব্যস্ততা দেখাল শুভদীপ, "আজ যে ভীষণ তাড়া, একটা এন্‌গেজমেন্ট আছে। আগামীকাল আবার আসব।"

"বেশ, এস কিন্তু।"

যে কোন মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য দরদ মেশান কথা। শুভদীপ হাসিমুখে উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই আসব।"

বেরিয়ে আসার জন্য দরজার সামনা সামনি হতেই ডাকলেন নবেন্দু রায়, "এই শোন, তুমি এ বাড়ির মঙ্গল অমঙ্গলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছ। জয়ী হতে পারবে কি?"

কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল শুভদীপ। কিন্তু ও প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পায় নি।

বাইরে বেরিয়ে চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিল ছন্দিতার ছবি। এতবড় দারিদ্রের মাঝে প্রেম জিনিসটা বড় বেশি বেমানান। সব কিছু

যখন অভাবের যাঁতাকলে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন প্রেমের রোমান্টিকতা কর্পূরের মত উবে যায়। বাঁচার জন্য লড়াই করছে ছন্দিতা। কিন্তু এই পরীক্ষার মুহূর্তে ঐ পরিবারটিকে অর্থনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখাটাই হবে তার প্রধান কাজ। কিন্তু সে তো বেকার, তাদের পরিবার আদৌ স্বচ্ছল নয়। এ পর্যন্ত যতটুকু করেছে সে শুধু ভালবাসার তাগিদে। প্রেমের জগৎটিকে প্রত্যাশিত সার্থকতায় পূর্ণ করে তুলতে সব বাধা দূর করার জন্য চালিয়েছে দুঃসাহসিক অভিযান। সে হারবে না, হারতে রাজি নয়। মনে মনে ঠিক করে হাতের মূল্যবান ঘড়িটা বাধা দেবে কয়েক মাসের জন্য। ধীরে ধীরে ধার পরিশোধ করে আবার ফিরিয়ে নেবে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। রাস্তার দুপাশের দোকানে আলো। সেই আলোতে পথ আলোকিত। শুভদীপ এগিয়ে চলল মহাজন কে. সি. দত্তের বাড়ির দিকে। অনেকদিন পরে আজ ঘড়িটা যেন এক মূল্যবান সম্পদ বলে মনে হল। অহেতুক একটা ভয় মনের মাঝে দানা বেঁধে উঠল। কেউ যদি এটা ছিনিয়ে নেয় তাহলে সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। হাত থেকে খুলে পকেটে রাখার আগে কান পেতে টিক টিক শব্দটা শুনল। ছিঁড়ে আনা হৃদপিণ্ডের মত শব্দটা কি রকম অসহ্য মনে হল। জিনিস বাঁধা রাখতে গেলে কে. সি. দত্ত কাউকে কোনদিন না করেন না। চড়া সুদের কারবার করে পনের বছরে দু'খানা বিলডিং হাঁকিয়েছেন। আরো হয়ত উঠবে। আর তারা বাঁচার জিদ নিয়ে এভাবেই চিরকাল পথ খুঁজে বেড়াবে।

ঝিলের ঠিক পশ্চিম কোণে কে. সি. দত্তের বাড়ি। শুভদীপ হাজির হল গেটের সামনে। গেটের মাথায় বৈদ্যুতিক আলোটা অনেক আগে থেকেই জ্বলছে। ঝাঁকড়ামাথা ঝাউগাছ গুলোকে দেখলে মনে হয় যেন বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কোলাপসিবল গেট ভিতর থেকে প্রায়ই বন্ধ থাকে। গেটের সামনা সামনি হতেই দেখা গেল ছন্দিতার সঙ্গে। এতদিনের আপনি সম্বোধনের আবরণ খসে গিয়ে শুভদীপ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে?"

"হ্যাঁ, না এসে উপায় ছিল না। ভাবলাম এ সময়ে অর্থ নামক জিনিসটা

সংসারটাকে কিছুটা অক্সিজেন দিতে পারবে।" মুখখানা বড় করুণ হয়ে উঠল ছন্দিতার, "তোমার তো আমাদের মত অভাব নেই, তুমি এখানে এসেছ কেন?"

"এসেছি বিশেষ এক প্রয়োজনে, তার আগে বল কি বিক্রি করলে এখানে?" ত্র্যস্তভাবে নিরাভরণ হাত দুটো কাপড়ের মাঝে লুকানোর চেষ্টা করতেই কী ঘটেছে বুঝে গেল শুভদীপ। অপেক্ষমান রিকশ্ওয়ালাকে বলল, এটা এই দিদিমণির তো? আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি যাবেনা।"

ছন্দিতা অবাক হয়ে গেল শুভদীপকে এখানে দেখে। সে তো কাউকে কোন কথা না জানিয়ে গোপনে এখানে এসেছিল নিজের চুড়ি দুটো বিক্রি করে অভাবের হাত থেকে সংসার কে সাময়িক বাঁচাবার আশায়। যতদূর জানে শুভদীপরা ধনী না হলেও আর্থিক অবস্থা তাদের মত এমন সমস্যাসঙ্কুল নয়। তবে কি শুভদীপ জেনে গেছে তাদের সংসারের সকল সমস্যার কথা। সে যে এখানে আসবে সেটাই বা জানল কেমন করে? তবে কি ভালবাসার টানে প্রতিটি গতিবিধিই অনুসরণ করে শুভদীপ? নানা চিন্তার মাঝে বিব্রত হতে লাগল ছন্দিতা।

ফিরে এল শুভদীপ বিজয়ীর মত, মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। "এই সন্ধ্যায় আমি তোমাকে একা ছাড়ব না, আমিও তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাব।"

আপত্তি করল না ছন্দিতা। একই সঙ্গে দু'জনে রিক্শায় উঠল। সারাটা পথ নীরব। বাড়ির গেট থেকে রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে দিল। বাড়িতে ঢোকার আগে ছন্দিতার হাতটা ধরে ফেলল শুভদীপ, "আমি নিজে হাতে তোমার চুড়িদুটো তোমাকে পরিয়ে দিতে চাই। কিন্তু না করা চলবে না।"

চুড়ি দুটো পরে অন্য এক জীবনের স্বাদে এবং আনন্দে ভরে উঠল ছন্দিতা। শুভদীপ যেন তার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে একাত্মভাবে। এও এক পরীক্ষা। মনে হল সব পরীক্ষায় তারা দু'জনে অবাধে উত্তীর্ণ হতে পারবে। বিকাল বেলায় সংসারের বুকে সেই ঘূর্ণীঝড়ের কোন দৃশ্যই এখন আর নেই।

জীবনের ইতিহাসে আরও কয়েকটা বছর যুক্ত হয়েছে কিন্তু সেই সন্ধ্যার স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি শুভদীপ। সাফল্যের সঙ্গে এম.এ. তে

দু'জনেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সাফল্য দু'জনকে আরও নিবিড় করেছে। চাকরি নিয়েছে ছন্দিতা। রেলের স্কুলে শিক্ষিকার কাজ। সংসারের অনড় চাকাটা দ্রুত গতিতে সুখস্বাচ্ছন্দের পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে।

শুভদীপ এবার ছন্দিতাকে নিজের করে পেতে চায়। কিন্তু ছন্দিতার সেই এক কথা, "বাবা মা এবং অন্যদের দারিদ্রের মধ্যে ফেলে কেমন করে নিজের সুখটাকে বড় করে দেখি বল। লোকে যে স্বার্থপর বলে ভাববে। আর কয়েক বছর অপেক্ষ কর, নিশ্চয়ই আমরা সংসার পাতব।

"কিন্তু আমাদের জীবন আর কতকাল এমনি ভাবে চলবে বলতে পার? নতুন করে কিছু ভাব।"

সব প্রশ্নের উত্তরেই নীরব থেকে যেত ছন্দিতা। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকত ওর মুখের দিকে। নতুন করে কোন কথা বলতে পারত না।

শেষ পর্যন্ত বদলির অর্ডার হল শুভদীপের। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বন দপ্তরের রেঞ্জার হিসাবে কাজে প্রথম যোগদান। বদলির অর্ডার জলপাইগুড়িতে। নতুন জায়গায় যাবার আগে দেখা করতে এসেছিল শুভদীপ। কিন্তু প্রাণখুলে কোন কথা বলতে পারছিল না। চা পর্বের শেষে বিদায় মুহূর্তগুলি নীরবতায় থমথম করছিল।

ছন্দিতার বাবা এবং মাকে প্রণাম জানিয়ে শুভদীপ বিদায় জানাতে ছন্দিতার সামনে এসে দাঁড়াল। ছন্দিতা জলভরা চোখে তাকিয়ে রইল শুভদীপের মুখের দিকে। কোন কথা নেই, ঠোঁট দুটো নীরবে কেঁপে উঠল কয়েকবার।

শুভদীপের মনে হচ্ছিল তারা দাম্পত্য জীবনে মিলিত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও মিলিত হতে পারছে না। সমস্যার আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে তাদের ভালবাসা, স্বপ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা সব চাপা পড়ে গিয়ে ফসিলে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ফুল যখন ঝড়ে যায়
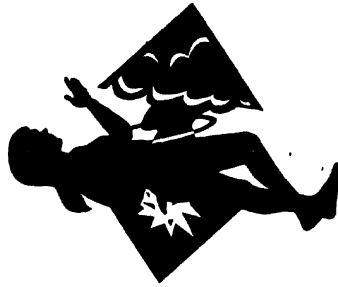
বাইরে প্রবল ঝড়। প্রায় টলতে টলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল অংশুমান। মেন লাইটগুলো অফ করল। জিরো পাওয়ার ল্যাম্পের ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট আলোর নির্জনতায় ঘুমের মাঝে হারিয়ে যেতে যেতে শিউরে উঠল আচমকা। অবচেতন মনের চিন্তাগুলো যেন প্রতিরূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল অংশুমান। মনে হল কাকে যেন দেখতে পাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল, ‘‘কে, কে তুমি?’

এই নির্জনতায় সন্দেহের কুটিল ছায়া ধীরে ধীরে আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠল। ঘরের ভিতরটা ভালভাবে তাকাল অংশুমান। না — কেউ কোথাও নেই। জানালার শার্সিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল কালবোশেখির নর্তন তাণ্ডবে। সুদীর্ঘ ইউক্যালিপটাস দুলছিল, দুলতে দুলতে আছড়ে পড়ছিল শার্সির উপর। অংশুমান বুঝল তার বুকের ভিতরটা ভয়ঙ্কর কাঁপছে, সাজানো চিন্তাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল একসময়। নিজের পা নড়ার সামান্য একটু শব্দে চিৎকার করে উঠল - ‘‘সত্যব্রত। তুমি।’’

‘‘দেখে ভীষণ আশ্চর্য হচ্ছ অংশুমান, তাই না? জেনে রেখো আমি প্রতিশোধ নিতে আসিনি।’’

"তবে তুমি কী জন্যে এখানে এসেছ?"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে। বলো অংশুমান, সুলতাকে তুমি কি জীবনে চাওনি।" গম্ভীর স্বরের প্রতিধ্বনিতে কাঁপতে লাগল ঘরের বাতাস। "উত্তর দাও, চুপ করে আছ কেন?"

"চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তো তাকে পেয়েছিলে অংশুমান।"

"এত চেষ্টা করেও কেন তুমি জয়ী হতে পারলে না? জেনে রেখো, মানুষের মন বড় জটিল এবং বিচিত্র। তুমি কোনদিনই সুলতার মনের নাগাল পাওনি। আর আমার কথা বলছ, আমি সুলতাকে জয় করেছিলাম আমার ভালোবাসায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যকে তুমি মেনে নিতে পারনি। তুমি হয়ে উঠেছিলে ঈর্ষান্বিত। হিংসায় তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে। আমাদের বিয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে তুমি জোর করে সুলতাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু সে তার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তোমার সমস্ত চক্রান্ত নষ্ট করে দিয়েছিল। ব্যর্থতায় এবং হতাশায় তোমার চোখ দুটো জ্বলছিল শিকারি নেকড়ের মত। আমার কথাগুলো অস্বীকার করার ক্ষমতা তোমার আছে কি?"

"অস্বীকার করব কেন, কোন অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয়না। সুলতাকে আমিও ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। তোমাকে সে ভালোবাসুক এ আমি সহ্য করতে পারছিলামনা। সুলতাকে ঘিরে আমাদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হল।" অংশুমান বুকের উপর হাত রাখল। বোবা যন্ত্রণায় কাঁপতে লাগল বুকের দেওয়াল। "শোন সত্যব্রত, আদর্শ বিবেক ইত্যাদি অনেক পরের কথা, আমার মত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগলে কে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়না বলতে পার? আমি যে হারতে চাই নি, এই ব্যাপারটাই তোমার অবোধ্য ছিল।"

"কিন্তু সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনও তোমার স্বভাব বদলে যায়নি অংশুমান। খেয়াল কর, দিনের পর দিন তুমি সুলতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলে। তোমার দুর্ভাগ্য আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমার সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। কারণ, তোমাকে বুঝতে বা চিনতে আমাদের দেরি হয়নি, এখনও তোমার শিরায় শিরায় শয়তানি উন্মাদনা। এবার আমার পালা, আমি প্রতিশোধ নেব।"

"সে ক্ষমতা আজ আর তোমার নেই সত্যব্রত। তুমি তো মৃত।" নিজের স্বর শুনে নিজেই আতঙ্কে কেঁপে উঠল অংশুমান। বাইরে শোঁ শোঁ শব্দ। চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ। আবার অন্ধকার। শার্সির দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল অংশুমান। "সত্যব্রত! তুমি যাও। অকারণে আর বিরক্ত করতে এস না। এ কি! নিষেধ সত্ত্বেও তুমি এগিয়ে আসছ কেন? জানো আমি কে, আমার লোকজন তোমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে।" অংশুমানের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠল। জানালার শার্সির দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল।

হাসতে লাগল সত্যব্রত, জোরে, আরও জোরে। হাসতে হাসতে একবারে সামনে এসে দাঁড়াল। "তুমি অংশুমান চট্টোপাধ্যায় একটা বড় কোম্পানির প্রোপাইটর, অসীম তোমার ক্ষমতা, অবাধ তোমার প্রতিপত্তি। কে মারবে তোমাকে? তবুও এত ভয়! বাঃ! ঠিক যেন একটা স্ট্যাচু, বসতেও ভুলে গেছ নিজের চেয়ারটায়। বুঝতে পারছ মৃত্যু কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, অথচ আমার বুকে ছোরা বসাবার সময় এ ভয় তোমার ছিল কোথায়? উত্তর দাও ....।"

"কি বলছ সত্যব্রত, আমি তোমাকে হত্যা করেছি। কোন প্রমাণ আছে বলতে পার?" আপন মনে হেসে উঠল অংশুমান।

"বুদ্ধির জোরে তোমার অপরাধ থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেতে পারনা অংশুমান। সব চেয়ে বড় প্রমাণ আমি। মনে রেখো আমি মরি নি, তোমার মানসিক সত্ত্বার গভীরে আমি আজও জীবন্ত, অক্ষত অম্লান। আমাকে হত্যার জন্য তোমার পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। নকশালী তৎপরতার নামে যখন হত্যার অবাধ রাজত্ব তখন কে হিসাব নেবে সামান্য একজন শিক্ষককে কে হত্যা করল। অবুঝ যুবকদের কাছে আমাকে চিহ্নিত করেছিল একজন প্রতিক্রিয়াশীল রূপে। স্কুল থেকে ফেরার সময় হঠাৎ ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। বেপরোয়া ছুরি চালাতে লাগল। বাঁচার জন্য আমি চিৎকার করে উঠলাম। লোকজন সাহায্য না করে ভয়ে ছুটে পালাল। দেখলাম আমাকে মারার জন্য গলিটার মোড়ে তুমি পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার চোখদুটো আনন্দে

নাচছিল। জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত আমি তোমার নাম ধরে ডেকেছিলাম। চিনতে পেরেছি জেনে তুমি তাড়াতাড়ি গুলি করে আমাকে হত্যা করে পালালে।"

"না সত্যব্রত, মিথ্যা অভিযোগ এনে আমাকে কলঙ্কিত করোনা। তুমি আমার শত্রু।"

"আমি কি তবে কোন বানানো কাহিনি বলছি অংশুমান। স্বীকার করি পরিস্থিতির উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা তোমার অপরিসীম। আমার মৃত্যুর দুঃসংবাদটা তুমিই দিয়েছিলে সুলতাকে। উদ্দেশ্য ছিল নতুন করে বন্ধু হবার চেষ্টা করা, নিজের অপকীর্তি আড়াল করা, সেই সঙ্গে সুযোগমত সুলতাকে কবজা করা। মূর্চ্ছিতা সুলতার জ্ঞান ফিরলে সহানুভূতি জানাতে তুমি দক্ষ অভিনেতার মত কেঁদেছিলে। আমার এই কথাগুলো শুনতে শুনতে ভয়ে তুমি ঘেমে উঠছ কেন?"

"অন্যায়ের জন্য আমি অনুতপ্ত সত্যব্রত। দিনের পর দিন জ্বলতে জ্বলতে আমি শেষ হয়ে গেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, মানুষ কোন ভুল করার আগে ভুলটাকে ভুল বলেই মনে করেনা। আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিক উত্তেজনা মানুষকে এমন স্তরে নিয়ে যায় যখন ভুলটাই ঠিক বলে মনে হয়।"

"আমি তোমায় চিনি অংশুমান। তুমি খুব চালাক, কিন্তু বন্ধু, কপটতা মূলধন করে কে কতদিন আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বলতে পারো? সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।"

"কি বীভৎস হাসি হাসছ তুমি। তুমি জঘন্য প্রতিশোধ নিচ্ছ। শোন সত্যব্রত, সুলতাকে আমি ভালোবাসতাম।" অংশুমানের মনে হ'ল যেন একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছে। "ভালোবাসতাম বলেই আমি তোমাকে হত্যা করেছিলাম, ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

"বেশ তো, ঐ ঘটনার পরেও তুমি কি ভালোবাসা পাবার চেষ্টা করেছিলে? কূটবুদ্ধির সাহায্যে তুমি তাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নামাতে ব্যস্ত ছিলে। তারপর এক রাতে জরুরি কাজের অছিলায় বসিয়ে রেখে রুদ্ধ এই ঘরের মাঝেই তার উপর চালিয়েছিলে পাশবিক অত্যাচার। কী ভয়ংকর সে

রাত, অংশুমান, আমার মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। সুলতা তোমার পায়ে ধরেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।" কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল সত্যব্রত। সেই সঙ্গে প্রবল প্রতিহিংসায় হাতের মুঠিটা যেন শক্ত হয়ে উঠল। হত্যার পর ফেলে দেওয়া সেদিনের সেই পিস্তলটা এবার তুলে ধরল অংশুমানের দিকে।

বাইরে প্রবল বৃষ্টি। মেঘের বুকফাটা আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘরখানা। অসম্ভব ভীতিতে কেঁপে উঠল অংশুমান।

আমায় মেরো না সত্যব্রত। আই এ্যাম টায়ার্ড, প্লিজ এগ্‌জাম্পট্‌ মি।

প্রচণ্ড উল্লাসে নাচতে লাগল সত্যব্রত।

"তোম্যর এ উল্লাস আমি সহ্য করতে পারছিনা, তুমি যাও।"

"অংশুমান.........! আমি তো মৃত, তবু এত ভয় কেন?"

"তুমি যাবেনা সত্যব্রত। যাবেনা এখান থেকে?" ইলেকট্রিক শক্‌ খাওয়ার মত কাঁপতে কাঁপতে অংশুমান বসে পড়ল নিজের চেয়ারটায়।

"শোন অংশুমান, ঐ ঘটনার পর সুলতা অফিস আসা বন্ধ করেছিল। সীমাহীন লজ্জায় জীবনের উপর তার তীব্র ঘৃণা এসে গিয়েছিল। অনেক রাতে সে আমার ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে। প্রবোধ দেবার ভাষা আমার ছিলনা, তবুও আনন্দ হ'ত — মৃত্যুর পরেও সুলতা আমার। শিকার পূর্ণরূপে আয়ত্ত্বে আনার জন্যেই তুমি শাসিয়েছিলে সুলতাকে। বলেছিলে রাষ্ট্র করে দেবে তার ব্যভিচারের কথা। দিনের পর দিন ভয় দেখিয়ে তুমি তাকে ব্ল্যাকমেল করেছিলে। তোমার বর্বরতা সম্ভোগের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছিল। এতেও তুমি ক্ষান্ত হওনি। তাকে দিয়ে তুমি তোমার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছ। শেষে যখন জানতে পেরেছ তোমার দেওয়া পাপের বীজ দানা বেঁধে উঠেছে ওর গর্ভে তখনই ছোবড়ার মত ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। বল অংশুমান, এর নাম কি ভালবাসা? সব অপমান সহ্য করে সুলতা নতুন করে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল। তুমি তাকে সোজা নার্সিং হোমের পথ দেখালেও এ্যাবরসনে সে রাজি হয়নি। তোমার দেওয়া নোটের তাড়াগুলো তোমারই মুখের উপর

ছুঁড়ে মেরেছিল। মনে করে দ্যাখ এর থেকে বেশি ঘৃণা আর কেউ করেছে কিনা।"

কিছুক্ষণ থামল সত্যব্রত, তারপর আবার বলতে শুরু করল, "দিনের পর দিন তুমি ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলে অংশুমান। কিন্তু কি জানি কেন সুলতা তোমাকে ছোবল মারতে আসেনি। মনে হয় সুলতা মা হয়ে তোমাকে ক্ষমা করেছিল। বাসা বদল করে সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়েছিল। মহানগরীর বুকে আত্মগোপনের যথেষ্ঠ সুযোগ ছিল বলেই সুলতা তোমাকে বাঁচাতে পেরেছে। এর প্রয়োজন ছিল, কারণ মহুয়ার তুমি বাবা।"

"মিথ্যে কথা, আমি স্বীকার করি না সুলতার মেয়ের আমি বাবা। আসল কথা সুলতা অন্য জনের সন্তান নিয়ে আমার ঐশ্বর্যের দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিল, আমার সামাজিক মর্যাদা তছনছ করে দিতে চেয়েছিল। আমি কিন্তু কখন তা হতে দিইনি।"

বিস্ময় বিস্ফরিত চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল অংশুমান। "সত্যব্রত, তুমি রাগে ফুলতে ফুলতে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছ কেন? আমার ভয় করছে।"

'উত্তর দাও অংশুমান, মহুয়ার বাবা কে?' বজ্র্যগম্ভীর স্বর, ক্ষমাহীন ভাবে তাকাল সত্যব্রত। 'সুলতাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলে কোন সাহসে। তুমি জানতে সুলতা সত্য গোপনের কোন চেষ্টা করেনি। মহুয়াকে জানিয়েছে অংশুমান চট্টোপাধ্যায় তার বাবা। কত আজগুবি গল্প তোমাকে কেন্দ্র করে। মহুয়া বিশ্বাস করেছে তোমার নিরুদ্দেশের কথা। কিন্তু তোমার জঘন্য কীর্ত্তির কথা আজও সে কাউকে বলেনি। সন্তানের সঙ্গে অভিনয় করে আসছে দীর্ঘ পাঁচ বছর। আগামী শুক্রবার স্কুলে ভর্তি হবে মহুয়া। একটি অনুরোধ নিয়েই সুলতা তোমার কাছে এসেছিল মহুয়াকে তোমার বলে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তুমি তাকে অপমান করেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ। একজন বারবধূর সঙ্গে তাকে তুলনা করেছ। আত্মরক্ষার চেষ্টায় মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। তাই না, অংশুমান? তবুও সারাক্ষণ মনে মনে কি ভাবছ অত কথা। কেন বাড়ি ফিরে যাবারও ইচ্ছা হয়নি আজ রাতে। কেন এত অসহায়। পরাজয়

ঢাকবার প্রাণপণ লড়াই না করে সত্যকে কেন স্বীকার করতে পারছ না। আমি অনুরোধ করছি একটা জীবনের কথা ভেবে সত্যকে তুমি স্বীকার করে নাও। এতে তোমার গৌরব বাড়বে।”

গর্জে উঠল অংশুমান। “স্কাউন্ড্রেল কোথাকার, তুমি যা খুশি প্রচার কর, কেউ বিশ্বাস করবেনা। আমার কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা কারুর নেই।”

“সাবাস্, সব কিছু ভেবে নিয়েছ এরই মধ্যে। দারুণভাবে হেরে যাচ্ছ অংশুমান। মনে পড়ে তোমাতে আমাতে একদিন গিয়েছিলাম গ্লোব সিনেমায় 'ইম্পিরিয়াল ভেনাস্' দেখতে। পলিন বিগ্রীজ এর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তুমি বলেছিলে ভালবাসা দেহজ কামনার অনেক উর্ধ্বে। আমিও তোমার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম। আমাকে হত্যা করলেও তোমাকে ক্ষমা করতাম যদি জানতাম ভালবাসা দিয়ে তুমি সুলতাকে আপন করে নিয়েছ। কিন্তু তুমি অভিনয় করেছ, তাই সুলতা তোমায় ক্ষমা করতে পারল না।”

আপন মনে হাসল অংশুমান। “সত্যব্রত, তুমি তো মহুয়ার বাবা হতে পার, এ পৃথিবীর সঙ্গে তোমার আর কিসের সম্পর্ক?”

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল সত্যব্রত, দেহের শিরাগুলো ফুলে উঠল। “জানতাম, এই সোজা রাস্তাটাই তুমি সুলতাকে দেখাবে। দেখালেও সুলতা মানবে না তোমার কথা। ভালবাসা দিয়ে যাকে পুজো করে তার উপর সে কি ড্রেনের নোংরা জল ছিটিয়ে দিতে পারে?”

আরও জোরে হেসে উঠল অংশুমান, চোখে চোখ রাখল সত্যব্রতের। “মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কারের মধ্যে আজও তুমি বাস করছ সত্যব্রত। যাদের প্রেম নিয়ে গর্ব কর তাদের আসল পরিচয় তুমি জাননা, খুব সহজে ওদের কেনা যায়।”

“এই তোমার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।” তীব্র ঘৃণা এবং বিরক্তি ফুটে উঠল সত্যব্রতের মুখে। “আধুনিক যুগের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই অংশুমান। জানি তোমার অফিসের সুন্দরী পি.এ. গুলোর কথা। প্রতি মাসে ওদের একটাকে বদলে অপর একটাকে বেড কম্পানিয়ন করতে পার কিন্তু বলতে পার কেউ কি তোমায় ভালবেসেছে? ভালবাসা মানুষকে দেবতা

করে, তুমি তার সন্ধান পাওনি, সুলতাকে টেনে নীচে নামালেও তার ভালবাসার স্বাদ তুমি পাওনি। সেটুকুই আমার গর্ব।" সত্যব্রতের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

খানিক থেমে আবার বলতে লাগল, "তোমার জন্যে মমতা হয় অংশুমান। মানুষের জীবন এবং ভালবাসা সম্পর্কে জানবার সুযোগ তোমার হয়েছিল। মনে করে দ্যাখ রঞ্জিতা ঘোষালের কথা। দেহদানের পুরস্কার হিসাবে নগদ কয়েক শো টাকা ওর হাতে তুলে দিয়েছিলে। ওর চোখে দুঃখ ছিলনা। লুকিয়ে হেসেছিল। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এ শুধু এক কৌশল। একদিন সামান্য একটু দেরিতেই তুমি ধৈর্যহারা। ছুটে ছিলে ওর বাড়ি। বস্তির সরু গলিতে গাড়িটা ঢুকতে পারেনি। হেঁটেই তুমি গিয়েছিলে। নর্দমার পচা জলের গন্ধ তোমার নাকে লাগেনি, অমন সুন্দর প্যান্টটায় পাঁকের দাগ লাগার জন্য শুধু মাঝে মাঝে দুঃখ হচ্ছিল। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে কি দেখলে বল তো? বিছানার উপর শুয়ে আছে তার স্বামী। এ্যাকসিডেন্টের ফলে বাদ গেছে উরুর কাছ থেকে দুটো পা এবং ডান হাতটা গোটা। মেঝেতে খেতে দিয়েছে ছেলেমেয়ে দুটিকে। নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে স্বামীকে। তোমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রঞ্জিতা। ফুটে উঠেছিল বিরক্তির রেখা ওর ম্লান দুটি ঠোঁটে। বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিল — 'এ আমার মন্দির, এখানে আপনাকে ভীষণ বেমানান দেখাচ্ছে'। রঞ্জিতা তোমাকে গ্রহণ করেনি, বর্জন করেছিল। রেগে গিয়ে তুমি বলেছিলে ন্যাকামি।"

"শোন সত্যব্রত, মানুষের চরিত্রের সংজ্ঞাটাও বদলে গেছে এ যুগে। সুতরাং আমি একা দায়ী হতে পারিনা। বহুজনেই তো সুলতা রঞ্জিতার দলকে নিয়ে বাজিমাত করছে। অশক্তের মত নীতিকথা বলার কি কোন অর্থ হয়?"

"হাঁ, বুদ্ধি আছে তোমার, নিজের পাপের সমর্থনে এর থেকে ভালো যুক্তি কেউ দেখাতে পারেনা। মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে হার মানে অনেক ক্ষেত্রেই, এর জন্য দায়ী মানুষের অভাব, সামাজিক অসাম্য। কিন্তু তাতে করে মনের আসল পরিচয় মেলেনা। ভালবাসা তুমি পাওনি অংশুমান, পাবার সাধনাও করনি। আমাকে তুমি খুন করেছিলে অন্ধ লালসায়।"

জানালার রঙীন শার্সিগুলোকে লেপটে রয়েছে পীচের মত অন্ধকার। সাড়া নেই, শব্দ নেই, তবুও স্থির থাকতে পারেনা অংশুমান। মানসিক দ্বন্দ্বের প্রবল খোঁচায় আপন অজান্তে চিৎকার করে ওঠে, "সত্যব্রত, তুমি যাও। তোমার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিচার করোনা।"

শব্দটা নিজেরই কাছে ফিরে আসে। অবাক হয়ে তাকায় অংশুমান। খানিকবাদে শাণিত বিদ্রুপ বাণে সত্যব্রতকে জর্জরিত করতে চেষ্টা করে। "সামান্য একজন স্কুল শিক্ষক, তার আবার নীতি। নীতির বোঝা কাঁধে নিয়ে অমন নুয়ে পড়েছ কেন? কী পেলে তুমি ভীরু, কাপুরুষ। দ্যাখো আমি আজ কোথায়? তোমাদের ন্যাকামি দেখলে শুধু দুঃখ হয়না, ঘেন্না হয়। তুমি একজন ঘৃণিতের মত এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও।"

"দেখতে পাচ্ছো না হাতে আমার কি, আমি তোমাকে গুলি করব। পৃথিবীকে নতুন করে নোংরা করার সুযোগ তোমায় আমি দেবনা।"

"তার মানে? আমাকে হত্যা করাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য? আমাকে ভাল হবার সুযোগ দেবেনা?"

"তুমি তো এখনো নেকড়ের মত ঘুরছ তোমার আভিজাত্য এবং প্রতিপত্তি নিয়ে। কিন্তু সব কিছু থেকেও তুমি কাঙাল। মিথ্যে গৌরবকে দিনরাত্রি আগলে আছ যক্ষের মত। শান্তি পেয়েছ কোনদিন?"

"আমি মনে করি আমার ক্ষমতা ছিল বলেই সবকিছু পেয়েছি। সেইজন্য তুমি ঈর্ষান্বিত।" উত্তেজিত কণ্ঠে বলল অংশুমান।

"এতে পবিত্রতাও নেই।" সমান উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সত্যব্রত।

"তুমি আমার এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যাবে কিনা বল। অসহ্য তোমার উপস্থিতি।" রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল অংশুমান।

"আমি তোমার মধ্যে জীবন্ত, তাড়াতে পারছ না কেন? বেদনার উত্তাপ বড় কঠিন অংশুমান। আর কোনদিন কোন দাবি নিয়ে আসবেনা সুলতা। তবুও তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারছ কি?"

"এ এক ধরনের খেলা, শক্তিমান পুরুষেরা দু'হাতে লুটে নেয়। তুচ্ছ

ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তুমি যাও, আমি ক্লান্ত, আমায় ঘুমাতে দাও।"

"আভিজাত্যের অহংকারে পৃথিবীর নিয়মকে অস্বীকার করতে পার না অংশুমান। চেয়ে দেখ পিস্তল হাতে কোন অংশুমানই তোমার সামনে নেই। নির্জনতায় তুমি আমাকে জীবন্ত করে তুলেছ। কি অদ্ভুত! আগুন আজ শুধু সুলতার ঘরেই নয়, তোমার নিজের ঘরেও জ্বলছে। সারা রাতে একবারও কি তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেছ। তোমার অনাদর এবং স্বেচ্ছাচারিতার কেমন প্রতিশোধ নিচ্ছে মধুমতী। সারা রাতে একবারও ফোন করে জেনেছে কি তুমি ফিরছ কিনা? কী, রাগে অমন করে কাঁপছ কেন? তোমার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর মি. পাল মধুমতীকে নিয়ে নৈশ বিহার শেষ করে এইমাত্র ফিরল। কেমন লাগছে তোমার? সব কিছু তুমি জেনেও না জানার ভান করছ। তুমি খুব ভাল করেই জান তোমার সন্তান রাহুলের জন্ম তোমার রক্তে নয়, কোথায় গেল তোমার অহংকার?"

রাগে দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ায় অংশুমান। ভয়ংকর ভাবে জ্বলে ওঠে চোখ দুটো। "না - না - না - না - এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। সত্যব্রত, তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পার? আমি প্রতিশোধ নেব।"

হেসে উঠল সত্যব্রত। "আমি চাই ঠিক এইভাবে তিল তিল করে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।"

"না, না, এ যন্ত্রণা আমি সইব না; রাহুল, মধুমতী এবং অন্যেরা যারা আমাকে নিঃস্ব করেছে তাদের সকলকে আমি মুছে ফেলব।" পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে নিজেরই ছায়াটাকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারল অংশুমান। ঝন্ ঝন্ শব্দে রঙীন বেলজিয়াম শার্সিটা ভেঙ্গে পড়ল।

প্রায় পাগলের মত ঘরখানার চারপাশে তাকাল। বিরাট আয়রণ সেফের ছায়া তখনও সেই ভাঙা শার্সির সীমাকে স্পর্শ করে আছে। টেবিলের ওপাশে দোয়াতদানের উপর আকাশি রঙের বড় পেনটা এখনও যেন তাক করে আছে সত্যব্রতের পিস্তল হয়ে।

শব্দ শুনে ছুটে এল বাহাদুর, 'বাবু - বাবু ... কি হয়েছে আপনার!'

সমস্ত শরীর ভিজে গেছে ঘামে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এসে দরজা খুললেন অংশুমান, 'কি ব্যাপার বাহাদুর! অমন করে ছুটে এসেছ কেন?'

অংশুমানের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হল বাহাদুর, 'এ কি বাবু, সারা রাত আপনি জেগে কাটিয়েছেন! আপনার জ্বর হয়েছে নাকি?'

'দূর পাগল, কে বলল তোকে। কিচ্ছু হয়নি আমার।' ম্লান মুখে হাসতে চেষ্টা করল অংশুমান।

মনিবের মুখের উপর কথা বলা স্বভাব নয় বাহাদুরের। আসার আগে একটা চিঠি রাখল টেবিলের উপর। 'সেই জেনানা আবার ভোরে এসেছিল বাবুজী, এই চিঠিটা দিয়ে গেছে।'

'আচ্ছা তুমি এসো।' কথাগুলো অনেক কষ্টে বলে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল অংশুমান। তারপর চিঠিটা খুলল। সুলতা লিখেছে —

অংশুমানবাবু,

চিঠিটা পড়ার সময়ে আমি আর এই পৃথিবীতে থাকব না। আমার শেষ অনুরোধ মহুয়াকে তুমি পালিতা কন্যা করে নিও। তোমার আভিজাত্য বজায় থাকবে, উদারতা দেখিয়ে আরও সম্মান পাবে। কেউ জানবে না তোমার আমার কথা। সত্যব্রতকে এর মাঝে টেনে আনতে চাইনা। মহুয়া নিষ্পাপ। আশাকরি ওর কথা ভেবে অনুরোধটুকু রাখবে।

ইতি — সুলতা

কাঁপা হাত থেকে চিঠিটা খড়ে পড়ল টেবিলের উপর। ভাঙা কাঁচের ভিতর দিয়ে সকালের এক টুকরো আলো এসে পড়েছে।

সেই দিকে তাকিয়ে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অংশুমান।

জীবন যে রকম

চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। জল থৈ থৈ মাঠটার কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা, ছলাৎ ছলাৎ ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে বাঁধের কোলে। কানে আসছে কেউটের গর্জনের মত একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। বাঁশ বনের পাশ দিয়ে বাবলা সারির বাঁকটা পার হলেই পরাণের দোচালা। সব কিছুই জানা, অন্ধকারে ভুল হবার ভয় নেই। কিন্তু পথ চলতি কোন লোকের নজরে পড়লে ধরা পড়ে যাবার ভয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলে অধীর, পথ ধরে নয়, যাবে সে খালের জলে গা ডুবিয়ে। কারুর বাবার সাধ্যি নেই টের পায়, শুধু এই ঝোপের আড়ে বসে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা। লোকের বাড়ির টিম টিমে আলোগুলো নিভে গেলেই সে নেমে পড়বে কাজে, কতক্ষণ আর। পাঁচ কড়ে চৌকিটার দিকে তাকায় একবার। তীরের মত পাঁচটা ফলা অন্ধকারে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে, প্রতিহিংসার অদ্ভুত উল্লাসে চোখ দুটো নেচে ওঠে।

শেওড়া গাছের গোড়া থেকে—ফট্ ফট্ করে একটা শব্দ ভেসে আসে। এ শব্দ চেনে অধীর, বোড়া সাপ চরতে বেরিয়েছে। এমনিতে ধীর কিন্তু দংশালে আস্ত রাখবে না। কুকুরের মত ছোবল বসিয়ে দেবে, মাত্র দিন সাতেক আগে

বিশু খুড়োকে দংশাল। এক খাবলা মাংসই তুলে নিয়েছিল যেন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই সব শেষ। গাটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু পালিয়ে গেলে তো চলবেনা, থাকতে তাকে হবেই। আর পরাণটার মায়া করেই বা কি লাভ। এত অপমান নিয়ে বাঁচার থেকে সাপের মুখে যাওয়া ঢের ভালো। কিন্তু তার আগে একবার পরাণের মুখোমুখি হতেই হবে। শালা, হাড়হদ্দ শয়তানের বাচ্চা একটা। পলিসি করে দুলারিকে ফুঁশলে নিয়ে পালাবার শাস্তিটা বুঝবে এবার। ছাড়নেওলা ছেলে অধীর নয়, আজ রাতেই শেষ বোঝাপড়া।

হাতটা নিস্‌পিস্‌ করে ওঠে। একবার পরখ করার জন্যে চৌকিটা হাতে তুলে নেয়, না সব ঠিক আছে। হাতের টিপ কখনও ভুল হবার নয়। মাছ গেঁথে গেঁথে অনেক পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিন্তু এবার ঘায়েল করতে হবে ছোট খাটো শোল-শাল নয়, মস্ত একটা বোয়াল। পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটানে বের করে আনবে নাড়িভুঁড়ি। তারপর না হয় গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাবে দেশ ছেড়ে।

বাঁধের উপর লণ্ঠনের আলো দেখে ঝোপের আড়ে বসে পড়ে অধীর। ধীরে ধীরে আলোটা মিলিয়ে যায়। ভুল হয়েছিল অনুমানে, বাঁধ ধরে নয়; ডোঙা বেয়ে কে যেন ঐ দিকে যাচ্ছে। যাক, সন্দেহটা ঘুচল। হিমেল জলো বাতাসে শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠার জন্যে বিড়ির ডিপেটা খুলল। একটা বিড়ি নিয়ে হাত আড়াল করে দেশলাই জ্বেলে ধরাল, জ্বলন্ত কাঠিটাকে পা দিয়ে টিপে নিভিয়ে দিল। কয়েকটা টান দেবার পরই কিন্তু মাথার ভিতরটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। মুখটা তেতো তেতো। বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাঠের জলে। জীবনে সব কিছুই যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে, এমনি করেই সে আজ রাতে সর্ব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে দূরে।

মাঠটার দিকে তাকিয়ে রাগে ফেটে পড়ল অধীর। এ সব্বো গেরাসী সোনার সংসারটাকে একেবারে ছারখার করে দিয়েছে। বুক জোড়া সবুজ ধান নিয়ে ডুব দিয়েছে জলের তলায়। পর পর দুটো বছর, লক্ষ্মী পুজোর জন্যে সামান্য এক আঁটি ধান আনতে পারেনি কেউ, বীজ ধান তো দূরের কথা। তার

উপর আবার এ বছর হাজা। আগের দু'বছরকে হার মানিয়ে বন্যার জল এসে ঠেকেছে উঠোনে। শুধু জল আর জল। ভাদরের সবুজ ধান এখন এক লগি জলের তলায়। পূবদিকের জাঙাল ভেঙে জল এখনও ঢুকছে। বছরের পর বছর এই রকম অবস্থা চললে কে আর কদ্দিন লড়াই চালাবে। ধাক্কা সামলাতে পারেনি কেউ, ধুঁকছে সবাই। কিন্তু অন্য পথও নেই যে এক ডাল ছেড়ে দিয়ে অন্য ডাল ধরবে। ঘটি, বাটি, হাল গোরু এমন কি ঘরের চালের টিন পর্যন্ত বেচে দিয়ে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে পথে। উঠতি বয়সের ছোকরারা এখন পাকা রাস্তার ধারে রাতের বেলা টাকা গয়না ছিনতাই করে। অথচ আগে কেউ এমনটা ছিলনা। আটল ঘুনি বসিয়ে দুটো মাছ ধরার কল্পনাও করতে পারেনা অধীর। সবটাই সমুদ্দুর, হাঁটু জল কোথাও নেই। ধিক্কার জন্মিয়েছে মাঠটা। পূর্ব পুরুষেরা কি আর সাধ করে ওর নাম রেখেছিল কান্দুয়া। এ শালার কাঁদুনে মাঠ। কাঁদতে কাঁদতেই জীবন শেষ।

হাজা মাঠকে তাজা করার অনেক স্বপ্ন দেখছে অধীর। চাষীদের অবস্থা বুঝে বাবুরা যদি পূবদিকের বাঁধটা একটু শক্ত করে দেন তাহলেই তো সমস্যা মিটে যায়। হৈ চৈ অনেক হয়, কিন্তু হাল ধরতে কেউ এগিয়ে আসেনা। ফলে প্রতি বছরই ডি, ভি, সির জল এসে ডুবিয়েছে গোটা মাঠ। পঞ্চায়েতের বাদল চাটুজে পর্যন্ত এ ব্যাপারে নীরব। উপরতলায় নাকি তার হাত নেই, দৌড় বড় জোর বি, ডি, ওর অফিস পর্যন্ত। অবশ্য সরকার থেকে রিলিফ এলে পঞ্চায়েতি বাবুরা বেশ সরব হয়ে উঠে, মান মর্যাদাও বেড়ে যায়। বিনি পয়সার গম পাওয়ার লোভে হ্যাংলার মত মানুষ পিছু পিছু ঘোরে। চামচার দল বেশি পেলে কানাঘুষো হয় অনেক, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনা। তবুও গত দু'বারের বন্যার সময় মানুষ কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছিল, কিন্তু এ বছর তাও নেই।

রূপোর চুড়িগুলো বেচে কিছু টাকা এনে ছিল দুলারি। কোন মতে চলছিল এক বেলা। সেই পুঁজিটাও যখন শেষ হল তখন আর পাঁচ জনের মত সাহায্যের আশায় পঞ্চায়েতে গিয়েছিল দরবার করতে। সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিল লাইনে। সূয্যি মাথা ডিঙিয়ে গেল, সবাই ধুঁকছে। হঠাৎ খবর হল

সরকারের মাল নেই, দেবে কোত্থেকে। বিশ্বাস করতে পারছিলনা কেউ, অবাক সবাই, কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে কিছু ফল হবে না বুঝতে পেরে ফিরল শূন্য হতে। সকাল থেকে উপোস। ঘরেও এমন কিছুই নেই যা দিয়ে উপোস রক্ষে করবে। ঘরে ফিরে এসে দেখল উঠোনের এক পাশে গুগলি ছাড়াচ্ছে দুলারি।

'কী ব্যাপার! শুধু হাতে ফিরলে কি করে?' দুলারির হাতটা গাল থেকে আর নামল না, দু চোখে তীক্ষ্ণ নীরব বিদ্রুপ!

সারাদিন ঘুরে ঘুরে মেজাজটা একেবারে তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল। তার উপর আবার এরকম কথা। আগুনে ঘি পড়ার মত জ্বলে উঠল অধীর, "অমন হারামের অন্ন আমি যদি মুখে তুলি তো গো রক্ত খাই। এই দিব্যি করলাম। তুই দেখে নিস্।"

"তবু যদি তিন মরাই ধান থাকত, তা হলে আরও কত না বড়াই করতে।" বেশ ঝাঁঝ মিশিয়ে কথাগুলো বলল দুলারি।

'শোন দুলারি, যদি আমরা ভিক্ষে করে বাঁচি তাতে কি ইজ্জত আছে? তোর মতিগতি কি বদলে গেল নাকি!' বিস্মিত হল অধীর।

'গোটা দেশটা ভিখিরি, তাদের ইজ্জত নেই, ইজ্জত তোমারই শুধু আছে।'

'দ্যাখ, তক্কো আমি করতে চাইনা, কিন্তু ভিক্ষেও আমি করতে পারবনা জেনে রাখিস্। মরতে হয় সেও ভাল।'

'তবে হাওয়া খেয়ে রাত কাটাও না, ঘরে ফিরলে কেন?'

হাঁ, রাগারাগি করে গুগলি সিদ্ধও মুখে তুলেনি অধীর। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর দুলারি কান্নাকাটি শুরু করেছিল। না তবুও সে কিছু মুখে তুলেনি।

দিনের পর দিন অভাবের তাড়নায় অশান্তি বাড়ছিল, অতি তুচ্ছ কথাতেই ভয়ংকর হয়ে উঠত দুলারি। ওর দিকে তাকাতেও ভয় করত, ভিতরে ঢুকে গেছে চোখ দুটো, আগের সেই নিটোল মুখখানা যেন আর স্বপ্নেও আনা

যায়না। কিন্তু নিজেরও বুকের ভিতরে জ্বলছে দাউ দাউ আগুন। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সেই আগুন ছুঁড়ে দিয়েছে দুলারির উপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে দুলারি।

মানুষের তৈরি এই বানবন্যিকে অদৃষ্ট বলে মেনে নিতে পারেনা অধীর। দু'বছর ধরে সরকার বিনি পয়সার যে গম দিয়েছে তার অর্দ্ধেক খরচ করলেই গোটা বাঁধ তৈরি হ'ত। অথচ সহজ কথাটা কর্ত্তাবাবুদের বোঝাতে পারছেনা কেউ। হয়ত এতে তেমন রস নেই বলে। ভয় ছিল এ বছরও মাঠ হাজবে। তবুও আশা ছাড়েনি অধীর। পয়সার অভাবে তার সাথে কোমরে কাপড় বেঁধে খেটেছে দুলারিও। আষাঢ়ে ঢল নামা বর্ষায় লক্ লক্ করে উঠেছে সবুজ ধানের চারা। শ্রাবণে তার মন ভোলানো রূপ; সবুজ শাড়ি 'পরে বাতাসে দোল খাচ্ছে যেন কোন দুষ্টু মেয়ে। কিন্তু তার পরেই বন্যায় কোথায় তলিয়ে গেল সব। চান খাওয়া ভুলে পাগলীর মত হয়ে গেল দুলারি। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো শামুকের মত ফুলে উঠল।

সংসারে কিছু নেই জেনেও মনটাকে শক্ত করে অধীর দিন কতকের জন্যে চলে গিয়েছিল বাইরে। কাজ জোটাবার আশায়, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। কুলি মজুরদেরও এ্যাসোসিয়েশন হয়েছে, নতুন লোক নিতে চায় না। নিলেও ভিতরে ভিতরে টাকার খেলা চলে। পাবে কোথায়, আট দশ দিন এমনিভাবে ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসেছিল বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই দুলারির সামনে পরাণকে দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিল অধীর। এ কি! ঐ নচ্ছারটার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে দুলারি।

'সত্যি ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি, রিলিপের স্লিপ দেবে কিনা বল।'

'বলছি তো দুটো স্লিপিই পাবে। তোমার কর্ত্তার যা গোঁয়ারতুমি, লঙ্গরখানায় যাবে তো?' লোভী চোখ দুটো দিয়ে দুলারিকে যেন গিলে খাচ্ছিল।

দুলারী দেখেও দেখল না সামনে অধীর এসে দাঁড়িয়েছে। তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠল কথায়, বলল, 'যম জানে মড়াচিরের খবর। যে যার ভাবনা ভাবুক।'

'ঠিক আছে তোমায় চিন্তা করতে হবেনা।' কথাটা বলে হাসল পরাণ।

একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল দুলারি। 'ঠিক তো? তুমিও জেনে রাখ ভোটের সময় কারও কথায় টলব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা।' বিজয়ীর হাসিটা ওর দু'ঠোঁটের আগায় ফুটে উঠল।

ও চলে যাবার পরও দুলারির সঙ্গে কথা বলার সাহস হয়নি সেদিন। নিজের ঘরেই চোরের মত অবস্থা অধীরের, মুখ তুলে কথা বলা তো দূরের কথা।

হঠাৎ অবাক করে দিল দুলারি, এক বাটি জল দেওয়া ভাত এনে ঠক্ করে বসিয়ে দিল সামনে, 'খেয়ে নাও।'

'কোথা থেকে পেলি?' স্বরটা গম্ভীর হয়ে উঠল অধীরের।

'যেখান থেকেই পাই না, তারও কি জবাব দিতে হবে?'

'আমি বুঝিনি তোর ব্যাপার।'

'কি বুঝেছ বলেই ফেলনা।' চেঁচিয়ে উঠল দুলারি।

'ঐ নচ্ছারটা তোকে দিয়েছে কি না বল।'

'হাঁ দিয়েছে আরও দেবে, তাতে তোমার কি? তুমি তো আর খাওয়াতে পারনি, অত নাক নাড়া কিসের।' রাগে কাঁপছিল দুলারি।

খেতে বসেও উঠে পড়েছিল অধীর।

একটা কাঁচা লঙ্কা কামড়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সে রাতে।

হাঁ, সেই রাতেই ভোর হতে না হতেই দুলারি চলে গিয়েছিল জলেশ্বরী তলায়, যেখানে সরকার থেকে লঙরখানা খুলেছে। গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে খবরটা শুনেছিল অধীর। তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এক মগ করে বেনো জলের মত খিচুড়ি পাবার আশায় ডিশ্ হাতে চলেছে গাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, ছোকরা থেকে বৌ-ঝিরা পর্যন্ত। টোকেন না থাকলে নাকি দিচ্ছে না। এ গ্রামে পরাণই ঐ টোকেন দেওয়ার মালিক। অধীরকে কোন কথা না বলে ডিশ্ হাতে একাই চলে গেল দুলারি। পরাণই আজ হর্তা কর্তা বিধাতা।

দুলারির চোখের সামনে ও হেসে হেসে বুক চিতিয়ে কথা বলতে সাহস করে। যুগের চাকাটাই বাঁই বাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে।

এখনও ভাবলে গাটা ঘেন্নায় রি রি করে উঠে। কেমন পশুর মত সর্বনাশ করতে গিয়েছিল বিজয় চৌকিদারের মেয়েটার। পারেনি শুধু তারই জন্যে। তিনটে থাপ্পড় খেয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ছুটেছিল। সেই স্বভাব কি বদলে যাবে রাতারাতি। রাজনীতির হাওয়া বদলে গেছে, ওরা এখন ভগবান। কিছু বলার জো নেই, বললেই তোমার উপর চলবে একের পর এক অত্যাচার।

দারুণ বিতৃষ্ণায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল অধীর। কাজ তাকে জোটাতেই হবে। এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে একেবারে ব্যর্থ হয়নি, জুটিয়ে ছিল বিনোদ মাঝির নৌকোয় লগি ঠেলার কাজ। পেট খোরাকি বাদে সপ্তায় সাত টাকা মজুরি। ওতেই রাজি হয়েছিল। না হয়ে উপায় কি, বিনি পয়সায় বললেও করতে হত। কলকাতা থেকে মালের চালান আসে। পনের কুড়ি দিনে একটা করে খেপ। আর বাড়ি ফিরে আসেনি, যোগ দিয়েছিল কাজে।

দিন ষোল পরে ফিরে এসেছিল অধীর। অনেকদিন পরে স্বস্তি। দু সপ্তার মাইনে চোদ্দটা টাকা গামছায় বাঁধা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে থৈ থৈ মাঠটার বুকে। হাজার চাঁদ খেলা করছে এক সঙ্গে, খেলা করছে মনটার ভিতরেও। আজ আর দুলারি মুখ ঘুরিয়ে থাকবে না নিশ্চয়ই। একটু রাত হয়েছে ক্ষতি কি? নৌকা থেকে ঝাঁট দেওয়া পাঁচমিশেলি ডাল কিছু তো নিয়েছে, এক কেজির মত চালও। ফুটিয়ে দিতে কতক্ষণ, ওরও তো পেটটা ভরবে, লগি ঠেলতে কী ভীষণ কষ্ট, রাতে দিনে বিরাম নেই। উজানে বাতাস পেলে তবু একটু জিরেন। কষ্ট হলেও পেট পুরে ভাত রুটিটা পাওয়া যায়। বস্তা ছেঁদা করে মাল বের করে সবাই। মালিকও নেয়, মজুরও নেয়, এইটাই নাকি নৌকায় চার যুগের নিয়ম। কিন্তু কিছুই নেয় নি অধীর, বিবেকে বাধে। এই ক'দিনে অভিজ্ঞতাও কম হয়নি, রাত জেগে সব কিছু শোনাবে দুলারিকে।

বাড়ির কাছে এসে খুশি হয় অধীর। ভিতরে টিম টিমে লণ্ঠনটা এখনও জ্বলছে। দুলারি ঠিক জেগে আছে, এখনও ঘুমায়নি। আনন্দের আতিশয্যে একটা মতলব এঁটে ফেলে। বাইরে থেকে ডাকবে না, চুপি চুপি গিয়ে একেবারে

দরজায় ধাক্কা মারবে।

দরজার কাছে এসে আগচুল খাড়া হয়ে উঠল অধীরের। ঘরের মধ্যে পরাণ! জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে।

দু'বাহুর মধ্যে দুলারিকে টেনে নিয়ে আদর করছে পরাণ। 'না খেতে পেয়ে এমনভাবে শুকিয়ে মরলে আমার বড্ড খারাপ লাগে দুলারি।'

'ইস্! তাই নাকি?' ওর চিবুকটা ধরে নাড়া দেয় দুলারি।

'না রে সত্যি বলছি, ইচ্ছে হয় তোকে আমার ঘরে নিয়ে চলে যাই। যাবি দুলারি? হয় এখানে, না হয় অন্য কোথাও?'

হেসে ওঠে দুলারি। 'তোমরা তা হলে খুনোখুনি করে মর। তুমি এক পাগল, আর সে এক বদ্ধ পাগল।' রাগ করে পরাণ, 'তোর এখনও মনের টান কাটেনি দেখছি।'

'ও বুঝেছি, রাগ হ'ল তো, টান থাকলে পরের বউকে নিয়ে ফূর্তি করতে পারতে?' চোখটা অদ্ভুতভাবে ঘোরাল দুলারি।

'তবে চল্ না পালিয়ে যাই কোথাও। ভয়ে ভয়ে এমন লুকিয়ে লুকিয়ে...।'

'কিন্তু তার আগেই তোদের দু'জনকে আমি একই সঙ্গে খুন করব।' ক্রুদ্ধ আবেগে গর্জে উঠল অধীর। 'শালা শয়তানের বাচ্চা, এখানেও সিঁধ দিয়েছিস্।'

পর পর কয়েকটা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলল দরজা। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল পরাণের উপর। 'খতম তোকে করবই' টুঁটিটা টিপে ধরার আগেই শুরু হল ধস্তাধস্তি, আধ ল্যাংটো দুলারি আচমকা এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে দেখতে ভয়ে মাঝে মাঝে দু'হাতে চোখ ঢাকছিল। মেঝের উপর লড়াই, মরণপণ লড়াই, হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝট্‌কায় পরাণ উঠোনের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে চম্পট।

ঘাটে ডোঙা বাঁধা ছিল ওর, ঝপাঝপ্ লগি ফেলে এগিয়ে গেল মাঝ মাঠের দিকে। বাঁ হাতের কব্জিটার উপর দারুণভাবে দু'পাটি দাঁত বসিয়ে

দিয়েছিল জানোয়ারটার। তবু প্রতিশোধের আশা ছাড়তে পারেনি অধীর। এই পাঁচ ফলার চৌকি নিয়ে ধাওয়া করেছিল পিছু পিছু। সে তখন অনেক দূরে, সাঁতার কেটে ধরা একেবারে অসম্ভব।

বাড়ি ফিরে দেখল দুলারি তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ভয়ে কাঁপছে সারা দেহ। এলো চুল, খোলা বুক। সেই একই দৃশ্য। নিজেকে ঢাকতেও ভুলে গেছে দুলারি।

দুলারিকে প্রাণে শেষ করে দেয়নি অধীর, তবে ঠেঙিয়েছিল বেধড়ক। মানুষ কখনও মানুষকে অমন করে মারতে পারেনা। অত মার খেয়েও কিন্তু কাঁদেনি দুলারি, বা কোন প্রতিবাদও করেনি। ডোরা কাটা লাল লাল দাগে ফুলে উঠছিল সারা শরীর। মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল, মাঝে মাঝে টলছিল। সেই অবস্থাতেই ঘাড়ে ধরে ঠেলতে ঠেলতে তাকে বাস্তুর বার করে দিয়েছিল।

'যা মাগি, আজ থেকে তুই চলে যা সেই লঙ্‌রখানায় বাবুর ঘরে। আর এ মুখো হবি না কোন দিন।'

কিছুক্ষণ পরেই আকাশ ঢেকে গিয়েছিল মেঘে। মুহূর্তে চারদিক অন্ধকার। হু হু করে নামল বৃষ্টি। একবার মনের ভিতরটা কেঁদে উঠল দুলারিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু কোথাও যায়নি সারারাত। সকাল হতে শূন্য দাওয়ার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চৌকি হাতে পায়চারি করেছে।

লঙরখানার খাবারের লোভ দেখিয়ে যে দুলারিকে ফুঁসলে নিয়েছে তাকে সে ক্ষমা করবেনা কোনদিন। পাঁচ কড়ে চৌকি ছুঁড়ে মৃত্যুবান হানবেই। কারণ খবরটা তো আজ আর গোপন নয়, পাড়াময় ঢি ঢি হয়ে গেছে দুলারি উঠেছে পরাণের ঘরে। অতএব শাস্তি তাকে পেতেই হবে। অন্ধকারেও চোখ দুটো ঝলসে ওঠে অধীরের। বাঁচার প্রয়োজন খুব ছোট হয়ে গেছে তার কাছে। বুকের পাঁজরটাকে ভেঙে দিয়ে গেছে, আর কোন আশা নেই, স্বপ্ন নেই। ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের সব শিকড় উপড়ে দিয়েছে দুলারি। অতএব তার মরণই ভালো। কিন্তু তার আগে শয়তানটাকে আস্ত রাখবেনা। চৌকিটা হাতে নিয়ে তেজি ঘোড়ার মত লাফিয়ে ওঠে অধীর। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াল অন্ধকারটাও যেন দাঁত বের করে হাসে। কিন্তু এখনই গিয়ে কাজ হাসিল করা যাবেনা।

শয়তানটা দেখতে পেলেই ভয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। শেষে নিজের বিপদটাই বাড়বে, কাজের কিছু হবেনা। শুধু সেই কারণেই আরও কিছুক্ষণ তাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

মাঠ থেকে কয়েকটা ব্যাঙ একসময়ে গ্যাঁ গোঁ শব্দে ডেকে উঠে। সেই সুরে সুর মেলায় ডাঙার ঝিঁ-ঝিঁরা। খানিক বাদে দুটো শব্দই থেমে গিয়ে গভীর একটা নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। আকাশের দিকে তাকায় অধীর। সেই বড়মত তারাটা এখনও জ্বলছে। তাকে ঘিরে আছে অনেকগুলো ছোট ছোট তারা। মনের ভিতরও অনেক স্মৃতি জেগে আছে দুলারিকে ঘিরে। মাঝ মাঠে টং বেঁধে আটল ঘুনি বসিয়ে পাহারা দিত সে। ডাকলে হাঁকলে রা দেবার কেউ নেই, এমন কি খুন করে গেলেও না। চারপাশে অন্ধকারের দেওয়াল, জলশুদির ওপর কট্ কট্ শব্দ করে সবুজ রঙের ব্যাঙগুলো ডেকে উঠত, মাঝে মাঝে থেমে যেত। ফাঁকা মাঠে সেই নির্জন পরিবেশে দুলারি আসত ডোঙা চালিয়ে খাবার নিয়ে। তখন তারাটা থাকত মাথার ওপরে আকাশের ঠিক মাঝ বরাবর, খুব তাড়া না থাকলে দুলারি ঘরে ফিরে যেত না। দেহ খারাপের নাম করে টং-এর ভেতর শুয়ে পড়ত। তারপর একটা লতার মত গলাটা জড়িয়ে ধরে সারারাত গল্প। গর্ব হত তার, দুলারি তাকে ভালোবাসে, আর সে ভালোবাসা খাঁটি সোনা, কোন রকমের খাদ নেই। আবার চাঁদনি রাতগুলোতে হাজার চাঁদের আলো চুরি করে টঙের সেই ছোট্ট কুঁড়েখানি আলো করে দিত দুলারি। মাত্র দু' তিন বছর তার ঘরে এসেছিল। কিন্তু এই অল্প সময়েই তার জীবনের বিরাট একটা অংশ দখল করে নিয়েছিল। দুলারিকে ছাড়া ভাবতেই পারতনা কোন কথা। অনেক রাতে হেসে হেসে বলেছে—'দুলারি তুই ঠিক আকাশটার মত, মনে হয় আমি পাখি হয়ে ডানা মেলে তোর বুকে উড়ে বেড়াই।'

অনেক কথা বলতে পারতনা দুলারি। তবু ওর মুখখানায় ভালোবাসার লজ্জাটুকু কেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। বুকের ভিতর মাথা লুকিয়ে দুলারি অবোধ আনন্দে প্রশ্ন করত, 'ইস্ আমি যদি হারিয়ে যাই, তখনও ভাববে আমার কথা?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সারা জীবন।'

এইবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে দুলারি, 'মেয়েরা মরে গেলেই তো পুরুষরা আবার বিয়ে করে গো। মন ভুলাতে ও সব কথা সবাই বলে।'

'ক'জনকে তুই দেখেছিস দুলারি। আমাকে তুই চিনতে পারিস্‌নি তাহলে।'

'না আমি যেন চিনিনা।' মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে দু'হাতের ভিতর আপনা থেকে ধরা দিত দুলারি।

বন্যায় ধান হারিয়েও জলের তলা থেকে খুঁজে পেয়েছিল অমূল্য রতন। সে রতনের নাম দুলারি।

কিন্তু আজ সেই দুলারিকে হারিয়ে ফেলেছে অধীর। বুকের ভিতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেলেও বরং ভাল ছিল। কি হবে আর লগি ঠেলে চোদ্দ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে, ঘর তার ডুবে গেছে জলের তলায়। অনেক বড় লগি ফেলেও তার তল পাওয়া যাবেনা। সামান্য এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে কি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে দুলারি। মাঠের থেকেও অনেক গভীর অন্ধকার ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। এর থেকে বন্যিতে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও ভাল হত। ঐ পরাণকে সে রেহাই দেবেনা, জীবন থাকতে নয়। নিজের বুকের উপরই সজোরে একটা কিল মারে অধীর।

থমথমে রাত। চারপাশের আলোগুলো নিভতে থাকে। নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় অধীর। এবার নামবে জলে। পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়ে চার পাশের বাতাস। 'এইবার...।' চৌকিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ নজরে আসে কালো কালো ভূতের মত অগণিত মানুষ কাছের বাঁধ ধরে চলেছে। রাত কত! এখন থেকেই চলেছে মানুষ লঙরখানায়। আরও ভাল করে দেখে। আর সন্দেহ থাকেনা। কঙ্কালসার মানুষেরা ডিশ হাতে চলেছে দলে দলে। খিদের জ্বালা দারুণ জ্বালা, এরই জ্বালায় দুলারি বিকিয়ে দিয়েছে নিজেকে। মানুষের অসহায় প্রতিবাদ জমাট বাঁধছে এই অন্ধকারে। একদিন এই প্রতিবাদের গর্জন শোনা যাবেই।

পরাণের বাড়ির দিকে তাক করে চৌকিটা সজোরে ছুঁড়ে দেয়, মাঠের

কালো জলে দড়াম্ করে একটা শব্দ ওঠে। হা হা করে হেসে ওঠে অধীর। বিড়ির ডিপেয় রাখা চোদ্দটা টাকা সে কুঁচিকুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর দাঁড়ায় না অথবা একটি বারের জন্য ফিরেও তাকায় না নিজের বাড়িটার দিকে।

ক্লান্ত পায়ে খুব ধীরে ধীরে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে চলে সীমাহীন উদাস অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। রাতের ব্যথা জমাট বেঁধে উঠে শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে।

বিনোদ মাঝির নৌকা ছাড়তে এখনও দেরি।

চারপাশে আবর্জনা। জমতে জমতে এখন দেবদারু গাছটার মাথা প্রায় ছুঁই ছুঁই। জঞ্জালের স্তূপের উপর সারা দিন ধরে এক পাল কাকের একটানা চিৎকার। ওদের ভাগ্যে কোন কোন দিন রাজসিক খানাও জুটে যায়। কেননা জন্তুটন্তু মরলে ছেলেরা করপোরেশনের এই খাসখামারি জিম্মায় জমা দেবেই। ঘিন্ ঘিনে বিশ্রী গন্ধটা এড়াবার জন্যে সব মানুষই হিসেব করে জায়গাটা পার হয় নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। কিন্তু বেহিসাবি হয়ে ওখানেই ডেরা বেঁধেছিল নব। সঙ্গে পেঁকাটির মত বউটা। ভালবেসে অথবা ঠাট্টা করেই হোক নব বউটার নাম রেখেছিল ছবি। রঙ্ শ্যামলা। রোগা হলেও মুখখানা কিন্তু আশ্চর্যজনক সুন্দর। চোখ দুটো যেন শাওন আকাশ।

ইচ্ছে করে ওরা এখানে আসেনি। আসতে বাধ্য হয়েছিল। বড় বড় রাস্তাগুলোয় শহুরে ভিখিরিদের যা দাপট—বাপ্‌রে, এক্কেবারে গিলতে আসে। সব্বাই খুনি এক একটা। না হলে প্রথমেই তো আস্তানা নিয়েছিল তেমাথানে

ট্রামরাস্তার কাছে। ওতেই যেন ওদের বুকের উপর চিতা জ্বলে উঠল। খোঁড়া সুখিয়া বুক ঘসে ঘসে এগিয়ে এসে ভিখ্ মাঙার ডিসটা যা ছুঁড়েছিল, রূপোর চাকতির মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে গেল দু'জনের ফাঁক দিয়ে।

চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা। 'শালে ভিখ্ ম্যাঙ্তা হ্যায়, নিকালো হিঁয়াসে।'

হাঁ, টিপ বটে, আর একটু হলেই নলিটা দু'ফাঁক। হাতকাটা নবর মুখের পেশিগুলো ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, অশ্লীল কয়েকটা গালাগাল অস্ফুট উচ্চারণের মাঝে থেমে গেল।

বউটা একেবারে থ। একি! ভিখ্ মাঙতে এসেও লড়াই! স্বামীর কাছাটা ধরে টান মারল—'পালিয়ে এস, মাঙ্তে এসে অমন জান টানাটানি আর খিস্তি শোনার দরকার নেই।'

ব্যাপার দেখে সুখিয়া রাক্ষুসে দাঁতগুলো বের করে হি হি করে হাসছিল, 'শালা জগন্নাথ।'

সেই থেকে পা বাড়ায়নি ওদিকে। ডিস্ পাতলে এখানেও পয়সা মেলে, তবে কম। তাতে কি। শালা সুখিয়াটা বউটার দিকে নজর দিয়ে আর তাকে টিট্‌কারি করবে না। উপায় কম হলেও এখানে শান্তি এবং সোয়াস্তি আছে। আধ ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছে ছবি। হাত দেড়েক উঁচু দেওয়াল। চালে কাগজের ছাউনি। ছেঁড়া একখানা চটের টুকরো দরজার কাজ করে।

চারপাশের সমস্ত কুশ্রীতাকে আলাদা করে সামান্য এই তিন ফুট জায়গার নির্জনতায় প্রাণটা জুড়িয়ে যায় নবর। এ কারণেই ছবির তারিফ করে— 'তোর বুদ্ধি আছে মাইরি। ঐ শালা শহুরেটার এমন একখানা ঘর আছে কি? শালাকে গ্যারেজের ছেঁচতলাতেই জীবন কাটাতে হবে।'

সুখিয়ার উপর রাগটা আনন্দে পরিণত হয়—'বড় দেমাক'। বউ এর দিকে তাকিয়ে কিছুটা গর্বের হাসি হাসে।

দুটো ইটের উনুনে রান্না চড়িয়ে আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বউটাও হাসে।

'তবু যদি এটা সত্যিকারের ঘর হ'ত তা' হলে আরো কত না গরব করতে।'

রাগ করে নব। 'এটা ঘর নয় তো কি? তুই কি মনে করিস আমরা মানুষ? মানুষ হলে ঐ রকম বড় বড় দালান থাকত।' দূরের বাড়িগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দেখায় নব। দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বউটা ওদিকে ফিরেও তাকায় না। হয়ত তার চোখের সামনে ভেসে উঠে গাঁয়ের এক প্রান্তে ছোট একখানা কুঠির। উঠোনের উপর ছাদিম বকুলের ছায়া, কাঁটা জবায় চারপাশটা ঘেরা। নিরালা মাঠে হিট টি—টি এখনও আকাশের নীলে কাকে যেন খুঁজছে। সে অতীত স্বপ্নের মত, ভোলা যায়না।

বউ এর দিকে তাকিয়ে অবাক হয় নব। 'কি ভাবছিস রে?'

ম্লান হাসে বউটা। 'কি আবার ভাবব।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নব। 'ঠিক বলেছিস, ভাববার কি আছে।'

অশান্ত কাকের চিৎকারের মাঝে দেবদারুর চারপাশ ঘিরে সন্ধ্যা নামে। তেমাথার মোড় থেকে বুক ঘসে ঘসে এগিয়ে আসে সুখিয়া। ফিরছে গ্যারেজের আস্তানায়। আড় চোখে বার কয়েক ওদের ঘরটার দিকে তাকায়। আপন মনে দুর্বোধ্য হাসি হাসে।

ওকে দেখলেই পুরানো রাগটা চাগান দিয়ে ওঠে। 'শালা টেঁকিকল একটা, এ দিক দিয়ে ছাড়া রাস্তা নেই। চোখের ইশারায় মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে নিষেধ করে ছবি। 'থাম তো তুমি।'

কথাটা কানে যায়না সুখিয়ার, তাই রক্ষে। নচেৎ এখনই একটা খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলত, ছাড়নেওয়ালা সে নয়।

ছবির দিকে তাকিয়ে ঐ জুল জুলে চাউনিটা একদম সহ্য করতে পারত না নব। সেই কারণে সহ্য করতে পারত না এই পথ দিয়ে চলাটাও।

সেই নব আজ সাধের ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছিল। বাইরে সকালের রোদ্দুরটায় এনে শুইয়ে দিয়েছিল। নোংরা আকাশটায় সবে ওঠা সূর্যটার দিকে তাকিয়ে ওর ঘোলাটে চোখ দুটো কাঁপছিল। বিকালের দিকে একবার মাত্র পাশ ফিরল। এক সময় গোটা শরীরটা টান টান

হয়ে সমস্ত স্পন্দন থেমে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে বউটা চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছিল। অবস্থা বুঝে না চাওয়া সত্ত্বেও অনেকে পয়সা দিয়েছিল। কুড়োয় নি, কুড়োতে হাত ওঠেনি। ভাবছিল নানান কথা। ভাবতে ভাবতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। প্রশ্ন আজ শুধু নিজের বাঁচা নয়, আর একটা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার। বাইরের আলোয় চোখ মেলার দিন তার এগিয়ে আসছে। অনেক সাধ, অনেক আশা নিয়ে ঐ মৃত শরীরটা তার কাছে জমা রেখে গেছে তার সন্তান। উতল পাতল ভাবনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল মাঝে মাঝে।

হঠাৎ হাসির শব্দে ফিরে তাকাল ছবি। ভিক্ষের পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে সুখিয়া। ওর দিকে তাকিয়ে তেমনি হি হি করে হাসছে। ইশারায় ডাকছে কাছে।

সারা অঙ্গ জ্বলে উঠল ছবির। খুনিটা এখানে এল কেন? এখনও লোভ ছাড়তে পারেনি। কোন রকম বাদ প্রতিবাদ না করে ঘেন্নায় মুখটা ফিরিয়ে নিল শুধু।

বুক ঘসে ঘসে হাসতে হাসতে আরো কাছে এগিয়ে এল সুখিয়া। 'যাবি কোথা? দুদিন বাদে পায়ে ধরে সাধবি।'

দু'হাঁটুর মাঝে মুখ লুকাল ছবি। বলা যেতে পারে শোক ভুলে গিয়ে অন্ধভাবে আত্মরক্ষার এই প্রথম এবং সযত্ন প্রয়াস।

অবস্থাটা লক্ষ্য করে এক পাও নাড়ল না সুখিয়া। একটা বিড়ি ধরিয়ে বরং আরও একটু জাঁকিয়ে বসল।

সন্ধ্যা হতে বড় ভয় করছিল ছবির। এখানে-ওখানে চারপাশের বাড়িগুলোয় আলো। আর এখানে আবর্জনার পাহাড়ের গায়ে এই গাছটাকে ঘিরে কী ভীষণ অন্ধকার। কাকগুলো পর্যন্ত শব্দ করতে ভুলে গেছে। পথের উপরই কুঁকড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে সুখিয়া। গ্যারেজে ফিরে যায় নি। কি অভিসন্ধি আছে কে জানে। মড়িটার পাশে ঘিয়ে ভাজা কুকুরটা অনবরত ছুঁক ছুঁক করছে। একটা বাড়ি নিয়ে তাড়া করল। কিছুটা ভয় পেলেও পালাল না,

একটু দূরে সরে গেল মাত্র। ডাকবে নাকি সুখিয়াকে? একটু সাহস পাবে, না থাক। অন্ধকারের নিসঙ্গতায় এই প্রথম সুখিয়ার প্রয়োজন অনুভব করল ছবি।

ভোর রাতে গাড়ির শব্দে ও জেগে উঠল। কয়েকজন লোক গাড়ি থেকে নেমে মড়াটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। হয়তো কেউ খবর দিয়েছিল সৎকার সমিতিকে। আর কোন চিহ্ন নেই। শূন্যতার ব্যথা চাপতে না পেরে গুন্‌গুনিয়ে কেঁদে উঠল ছবি।

শিশিরে স্নান সেরে আলোময় পৃথিবী ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কান্না শুনে জেগে উঠল সুখিয়া। বুক ঘসে ঘসে এগিয়ে একেবারে কাছটায় এসে বসল। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল উপরের আকাশটার দিকে। হাত বাড়ালেই ছবিকে স্পর্শ করতে পারে সুখিয়া। কিন্তু তা করল না। সেই বাজপাখির মত দৃষ্টি, হি হি করা হাসিতে স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ—সব কিছুই যেন বিসদৃশভাবে অনুপস্থিত।

এই নিরুত্তাপ উদাস পরিবেশে ছবি যেন আরও বেশি করে আকৃষ্ট হ'ল সুখিয়ার উপর। কি ব্যাপার! গোঁসা হল নাকি? কোন কথা বলছে না কেন! এইবার ঠিক কথা বলবে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ছবি। মনটার ভিতর ঘুরপাক খেতে লাগল অসহায় নিঃসঙ্গতা।

সকালে লোক চলছিল। ভিখ্ মাঙার ভাঙা ডিস্‌টা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছবি। আবর্জনার স্তূপের উপর কাকেদের সরব জলসাঘর। প্রাত্যহিকতায় পুরাতন হলেও ছবি শুধু চেয়ে রইল ওদেরই পানে।

কুনুই এ ভর করে বুক ঘসে ঘসে একেবারে ঘরটার সামনে হাজির হল সুখিয়া। হাত বিছিয়ে ইশারায় কাছে ডাকল। 'এই শোন্'।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ছবি কাছে এসে দাঁড়াতেই একবার হাসল সুখিয়া। ময়লা জামাটার নীচে কোমরে সাপের মত জড়ান গেঁজেটা খুলল দু'হাত দিয়ে। ওর সারাটা দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। ওভাবে তাকানোয় কোন রকমের আপত্তি করল না ছবি। কিন্তু সুখিয়ার চাপা হাসিটা সহ্য হল না একেবারেই।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ছবি। 'ভোলাতে এসেছ আমাকে।'

'এই চুপ।' নিজের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে চেঁচাতে মানা করল সুখিয়া। 'চেঁচাসনি, মস্তানরা জানতে পারলে দু'জনকে ছাতু করে দেবে। এতে কত আছে জানিস, দুই কম শ'।'

'তাতে আমার কি?'

অবাক হল সুখিয়া। 'নিবিনি তুই! অত অভিমান ভাল নয় রে, দিচ্ছি যখন রেখে দে। ক'মাস পরে বিয়োলে বাচ্ছাটাকে নিয়ে ঘর বাঁধবি।

অপূর্ব হাসিতে মুখর সুন্দর হয়ে উঠল সুখিয়া।

'তুমি?'

'হাঁ' দরকারটা তোরই তো বেশি। নে ধর।' হাতটা বাড়িয়ে দিল সুখিয়া।

'তোমার থাকবে কি?'

বিস্ময় যেন সকাল হয়ে ফুটে উঠল সুখিয়ার চোখে। পথ চলতি মানুষদের দিকে চিরাভ্যস্ত ভিক্ষার ভঙ্গিতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে লাগল আগেরই মতো। 'আমার কি ঘর আছে যে ভবিষ্যতের জন্যে রাখব। বাঁ হাত দিয়ে কপাল দেখিয়ে বুড়ো আঙুলটা উঁচিয়ে ধরল। মুহূর্তে যেন কেমন হয়ে গেল সুখিয়া। 'সবই তকদির।'

আর অপেক্ষা করল না সুখিয়া। মাথা নীচু করে বুক ঘসে ঘসে এগোতে লাগল তেমাথানে রাস্তার দিকে।

দেবদারু গাছটার নীচে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছবি। প্রসারিত চোখে তাকিয়ে রইল ওর পথটার দিকে। কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে দেবদারু গাছের চারপাশ ঘেরা দিন। ঘরের স্বপ্ন নিয়ে চলে গেছে তার স্বামী, আজ সেই একই আশা নিয়ে পথ হাঁটছে সুখিয়া। এক জনের হাত ছিল না, আর একজনের নেই পা। অথচ দু'জনকে যোগ করলে একটা পুরো মানুষ। কী লাভ সুখিয়াকে বঞ্চিত করে। পাক না কিছুটা সান্ত্বনা। প্রাণের ভিতরটা ভীষণভাবে কেঁদে উঠল ওর। থাক না সুখিয়া তার সঙ্গে ঐ খুপরিটায়। কে নেবে তাদের পরিচয়,

কে জানবে তাদের কথা। জোরে চেঁচিয়ে ওকে ফেরাতে ইচ্ছা করল ছবি।

কিন্তু পারল না। কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছে। অনেকটা দূরে চলে গেছে সুখিয়া। মনে হল বুকের পাঁজরাঘসা ঐ পথটা ধরে সেও পিছু পিছু চলেছে।

চোখের ফোলা পাতাগুলো আবার ভারি হয়ে উঠছিল। সেই ভেজা চোখেই দু'পাশের বাড়িগুলোকে ক্রমাগত দেখতে লাগল ছবি। বাড়িগুলো ক্রমশ বড় হতে হতে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে। আর ও, নব, সুখিয়া ক্রমশ ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে আবর্জনার স্তূপে।

সুখিয়ার গেঁজিটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল ছবি, পেটের ভেতর এখন যেটা মোচড় দিয়ে উঠছে আগামী দিনে সেও হয়ত এই গাছের নীচে এমনি করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখবে।

রাধা

ঠিক দুপুর। কিন্তু কোথাও রোদ্দুর নেই। এখনো টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কয়েকদিন ধরে একটানা বর্ষায় মানুষ পচে মরছে ঘরের ভিতর। মেঘের এ রকম অবাধ আধিপত্য না মানা ছাড়া উপায় নেই। পথঘাট দুর্দান্ত রকমের পিছল। এই রকম পথে পা টিপে চলতে গিয়েও সাতবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। পড়লে আর চেনাই যাবে না। মনে হবে সে মানুষ নয়, অন্য কিছু। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অতি সন্তর্পণে আসছিল রতন গোঁসাই। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের বিড়িটাকে গাঁজার কলকের মত করে ধরে আচ্ছা রকম টান দিয়ে নিচ্ছিল। চোখ বোজানোর সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তির হাসিটুকু ফুটে উঠছিল মুখের প্রতিটি বিন্দুতে।

নেশা একটাই রতন গোঁশাই-এর, শুধু বিড়িটানা। এ ছাড়া তুমি যা দাও সবেতেই না বলবে। কিন্তু বিড়ি দিতে গেলেই বলবে—'গাঙ্ কখন মড়া আলে, প্রভুর কৃপায় জুটছে যখন আমি নেব না কেন।'

কিন্তু আজ নিমতলায় তাকে তিনটে বিড়ির জন্যে তিনখানা গান গাইতে হয়েছে। অত পরিশ্রমে মাত্র তিনগাছা বিড়ি। তাতেও কত কথা। এ ভাবে গান গেয়ে বেড়ান নাকি বুজরুকি। দেশের সরকার চাইছেন কাজ, খঞ্জনি বাজিয়ে ফোকটসে চাল আদায়ের দিন শেষ, এবার কোদাল ধরতে হবে, নচেৎ শ্রীরাধার পায়ে পড়ে রাতদিন কাঁদলেও পেট ভরবে না।

যে যা বলে বলুক, ও নিয়ে চিন্তা করে না সে। চিন্তা শুধু এক জায়গায়, আজকালকার ছেলেগুলো তাকে প্রায়ই বলে তোমার রাধাকে ছাড় গোঁসাই,

সমাজতন্ত্র নিয়ে গান বাঁধ। হাঁ, এর জবাব সে দিয়েছিল, 'বাঁধতে হবে কেন গো, বাঁধা তো আছেই। আমার গৌরাঙ্গ ঠাকুর আছে না—বামুন, মুচি মেথর, ধনী গরিব সব কেমন এক করে দিল।'

উত্তর শুনে বুড়ো বিধু আদকের আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু তার সমর্থনের জঘন্য বদলা নিল সমীর হাজরা, "সাবেকি মামদো না হলে অমন দাঁত বের করা কথা সমর্থন করে। বলি নেড়া গৌরের চেলা যদি তবে কণ্ঠি পরে জমানো টাকার থলিগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে সবার জন্যে প্রেমে গড়াগড়ি যা না। সবাই তখন দু'হাত তুলে নাচবে। আমরা এসব মানি না, মানুষকে বাঁচাতে আমরা চাই শ্রেণিসংগ্রাম।"

শ্রেণিসংগ্রাম ঠিক কি বস্তু অত বোঝে না রতন গোঁসাই, কিন্তু অবাক হয় গৌরাঙ্গ ঠাকুরকেও তুচ্ছ হয়ে যেতে দেখে। হা কপাল—প্রেমে মানুষকে ভালবাসতে না শিখলে জীবনটা দানা বাঁধবে কি দিয়ে। যার অত তেজ সেই সূর্যদেব পারে না বছরের সব দিনগুলোকে সমান করে দিতে। অবশ্য প্রস্তাবটির পক্ষে মনে মনে সায় দেয় রতন। ওরা বলছে দেখুক না চেষ্টা করে। পারলে তো ভালই, না পারলেও ক্ষতি কি, পারবে—ওরাই পারবে, তার আগে মানুষের উপর ভালবাসায় ওদের মনটা ঠিক গৌরাঙ্গ ঠাকুরের মত হতে হবে। এই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই সে গান গাইবে, গান সে কোন মতে সে ছাড়তে পারে না—পারবেও না।

এক সময় পা পিছলে পড়বার উপক্রম হয়। কোন মতে টাল সামলে নিয়ে আবার সাবধানে চলতে শুরু করে। অন্যমনস্ক ভাবটুকু কেটে যায়। ডেরায় তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হন্‌হনিয়ে চলতে চেষ্টা করেও বেশি এগোতে পারে না। কারণ কাদা পা দুটোকে কর্ণের রথের চাকার মত নীচের দিকে টেনে নেয়।

ঘাটে হাত পা ধুয়ে ডেরায় এসে স্বস্তি পায় রতন। গা থেকে আধ ভিজে জামা, পরণের কাপড়টা ছেড়ে ফেলে নড়বড়ে তক্তাপোষটার উপর বেশ আরাম করে বসে। হোক পরের বাড়ি, তবু এই ঘরখানা তার নিজস্ব। অনেকদিন থাকার ফলে এর উপর জন্মে গেছে অদ্ভুত মমতা, সেই সঙ্গে

হৃদয়ের নিবিড় আকর্ষণ। অবশ্য এসবের মূলে রঘু সরকারের ঐ বিধবা মেয়েটি। মাঝে মাঝে এলোচুলে যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, ওর নির্মল হাসিটার সঙ্গে দেহের ফুটে ওঠা যৌবন যেন উপচে পড়ে। হাসতে হাসতে মাঝে মাঝে ও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, হাসি থেমে যায়, সেই সঙ্গে সাধারণ প্রশ্নগুলোও। মেয়েটি চোখ নামিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচে।

বাঁচে না কেবল রতন। প্রাণের ভিতর জেগে ওঠে অস্থির সমুদ্র। সংযত যৌবনের সব কিছু ছাপিয়ে কি এক গোপন সংকেতের সুর আপনা হতেই গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। এ জিনিস উপেক্ষা করা যায় না বা বলেও বোঝানো যায় না। এর নাম ভালবাসা, হয়ত বা অন্যকিছু, এর জন্যে কোন রকম আত্মগ্লানি নেই। কিন্তু হৃদয়ের এই অস্থিরতার খবরটি শান্তাকে জানিয়ে দেবার ক্ষমতাও যে তার নেই। সুরের ভিতর দিয়েও সে বলতে পারে না—বধু তোমারি লাগিয়া সরম ত্যজেছি, কুলশীল জাতি মান। সে গোঁসাই ঠিকই, কিন্তু তার আদিম পরিচয় সে পুরুষ। তবুও সঙ্কোচ কাটিয়ে দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারে না। নেই পারুক, শান্তার উপস্থিতি যে অদৃশ্য সুবাসটুকু রেখে যায় তাতেই মনের সব জানালাগুলো খুলে গিয়ে আপনা আপনি গান জেগে ওঠে। তখন সে মনে করে খঞ্জনি হাতে নিয়ে ঝোলা কাঁধে করে অসংখ্য মানুষের ভিড় এবং সব যুক্তিতর্ককে পিছনে ফেলে চলতে চলতে বৈকুণ্ঠলোকের রাধাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে।

শান্তাকে সে পাবে না জানে, তবুও সে আটক হয়ে গেছে এই মধু বৃন্দাবনের মায়ায়। কিন্তু কদিন থেকেই শান্তার বাবা একটু অন্যরকম। আকারে ইঙ্গিতে যেন এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবার কথা বলতে চায়। অবশ্য কারণটা এখনো জানতে পারেনি রতন। ভক্তি টক্তি এসব ঝুটো বাতিকের মধ্যে কোনদিন নিজেকে জড়াতে চায়নি রঘু সরকার। গান শোনার আগ্রহে সে ঠাঁই দেয়নি রতন গোঁসাইকে, ঠাঁই দিয়েছিল নিত্য খঞ্জনি বাজিয়ে আনা চালের আকর্ষণে। যেমন করেই হোক বেশি চাল এনে দিতে না পারলেই মুখখানা গোমড়া হয়ে যাবে রঘু সরকারের। মূল কারণটা বোঝে রতন এবং বোঝে বলেই সব কিছু সয়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র ভিক্ষের চালে একটা পরিবারের সাতটি প্রাণির সংসার

কেমন করে চলতে পারে?

এই অসম্ভব বোঝাটা রতনের কাঁধে চাপিয়ে এখন আবার চোলাই মদ ধরেছে রঘু সরকার। মাত্রা পুরো হলে শ্রমিক বিপ্লবের হুমকি দেয়, ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে মেহনতি মানুষদের এক হবার জন্য আহ্বান জানায়। কেউ কথা শুনুক বা না শুনুক—একটানা বকে যায় দুপুর পর্যন্ত। কখন বা গালাগাল দেয় জুটমিলের মালিককে। একটানা ছ'মাস বেকার থাকার জন্য মনের সুখে মালিকের বউয়ের হাত থেকে সাতবার নোয়া খসায়। এ সময় কেউ বোঝাতে গেলে তাকেও গাল পাড়ে। নেশা কেটে গেলেই আবার অসহায় দৃষ্টি। ছিন্নভিন্ন পৃথিবীর থেঁতলে যাওয়া স্বপ্নের সমাধির উপর বসে থাকে অকাল বৃদ্ধ রঘু সরকার। রাগ করে না রতন, কেমন যেন মায়া হয়। এ সময় প্রবল বিদ্রোহে পৃথিবীর চাকাটা ঘুরিয়ে দেবার ইচ্ছাটা তারও মনের ভিতর জেগে ওঠে।

মাত্র একটি রাতের জন্য এ বাড়িতে থাকতে গিয়ে পর পর কেটে গেল সাত মাস, শেষে বছর ঘুরে আবার নতুন বছর এসেছে। তবু আজো চলে যায়নি রতন। শান্তার সজল চোখের গভীরে বৃন্দাবনের ময়ূর নাচে। এসব ভুলে অন্যত্র গিয়ে থাকেই বা কেমন করে।

সদর বাড়ি খোলা দেখেই শান্তা হাজির, 'চলে এসেছ গোঁসাই। তুমি বেশ বসে আছ, আর আমি সারাক্ষণ ভাবনায় মরি।'

'তাই নাকি?' খুশিতে ভরে ওঠে রতন।

সিগ্ধ সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে পড়ল শান্তার সারা মুখে। খানিকক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক। তারপর কথা বলল শান্তা। 'আজ কেন ডাকলে না গোঁসাই। গোঁসা করেছ নাকি?'

'কার উপর গোঁসা করব বলো।' শান্তার মুখের পানে তাকিয়ে কথাগুলো বলার সময় স্বরটা কেঁপে উঠল রতনের।

কথার উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল শান্তা। চারপাশটা চোরের মত একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে রতনের

খুব কাছে এসে দাঁড়াল। "এখান থেকে পালিয়ে যাও গোঁসাই। তোমাকে তাড়ানোর জন্য বাবা আমাদের পাড়ার ছেলেদের ঠিক করে রেখেছে। তোমার নামে বদনাম দিচ্ছে।"

'কেন, আমি তো কোন দোষ করিনি।' শান্তার ভীতিবিহ্বল মুখখানার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় রতন।

'না—না, তোমার অপমান আমি সইতে পারব না গোঁসাই, তুমি যাও!' সজল চোখ দুটিতে করুণ আকুতি মূর্ত হয়ে ওঠে।

'এমনিতেই চলে যেতাম আমি, কাউকে কিছু বলতে হ'ত না। কিন্তু কোন অন্যায় না করেই অকারণ বদনাম নিয়ে যেতে আমি রাজি নই।' অস্বাভাবিক জিদ যেন পেয়ে বসে রতনকে।

গোঁসাইয়ের এই ভাব দেখে হেসে ফেলে শান্তা, চোখে জল। 'আমার বিয়ে দেখার জন্যে তুমি থাকবে গোঁসাই?'

'তার মানে!' কে যেন চাবুক বসিয়ে দেয় রতনের উপর।

'হাঁ, খবর তুমি রাখ না গোঁসাই। তাই অমন চমকে উঠলে। কিন্তু কথাটা সত্যি। বাবা আবার আমার বিয়ের ঠিক করেছে। স্বামীর আমলের সব কিছু আমার দেওরদের দিয়ে এসেছি পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে। ব্যাপারটা ঘটে গেছে চার দিন আগে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সই করতে বাধ্য হয়েছি।'

'সব কিছু যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আর আমায় জানিয়ে লাভ কি।' গম্ভীর হয়ে যায় রতন।

'বিশ্বাস কর গোঁসাই, আমি নিরুপায়। পাড়ার লোকে নাকি বাবাকে বলেছে আমার বিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি নাকি জ্বলন্ত আগুনি।'

নিজেকে শান্ত রেখে উত্তর দেয় রতন। 'ভাল কথা তো, মত দিয়ে দাও।'

এবার অভিমানে ভেঙে পড়ে শান্তা। 'তুমিও বলছ ভাল। সেই বিহারি লঙ্কাব্যাপারীকে নিয়ে আমায় বাঁচতে হবে।' কান্না আর আগল মানে না। 'জানতাম সবাই আমাকে ঠেলে দেবে।'

'কিন্তু আমি কি করতে পারি বল।' রতনের কথাগুলো হতাশায় ভারী হয়ে ওঠে।

'ঐ মানুষটা কিনে নেবে আমায়? 'আহত অভিমান তখনো শান্তার স্বরে। 'কি করে জানব ঐ মানুষটা এমনভাবে ফাঁদ পাতবে। আগে এখানে এসে প্রায়ই তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। অভাবের সময় বাবাকে টাকা হাওলাত দিত। এখন আবার তুলে দিচ্ছে চোলাই মদ। মিলন সংঘের ছেলেদের চাঁদা দিয়ে হাত করেছে, সব ব্যবস্থা নিখুঁত।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে রঘু সরকার। চোখ দুটো জ্বলছে ঠিক বাঘের মত। হাতে মস্ত একটা মুগুর। মাঝে মাঝে টলে পড়ছে নেশার ঘোরে। উভয়ের দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসল আপন মনেই। 'প্রেমে একেবারে ঢলাঢলি যে হে। তিলক ফোঁটা কেটে লোকের বাড়িতে বেশ সিঁধ কাটতে পার।'

সাপের ছোবলের মত ঐ অসহ্য হাসিটা রতনের সমস্ত সহিষ্ণুতাকে যেন নীল করে দিচ্ছিল। তবুও নীরব রইল। এতেই দ্বিগুণ হয়ে উঠল রঘু সরকারের আস্ফালন। 'এক্ষুনি এই ভিটে থেকে নেমে যা, না নেমে গেলে ঘাড়ে ধরে বের করে দেব, মুগুরপেটা করব।'

বলা মাত্রই ছুঁড়ে দেওয়া মুগুরটা দেওয়ালে লেগে দাওয়ার উপর গড়িয়ে পড়ল। রতনের উপর আক্রমণটা ব্যর্থ হওয়ায় সব রাগটা গিয়ে পড়ল মেয়ের উপর। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ঘরের ভিতর থেকে একেবারে ফেলে দিল বাইরের উঠোনে। 'এখানে আসতে নিষেধ করেছি নয়।'

আঘাত ভুলে গিয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল শান্তা।

স্বামীকে শান্ত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কেঁদে উঠল শান্তার মা। কিন্তু সেই কান্না ছাপিয়ে নিজের গলার স্বর আরো উঁচুতে তুলেছে রঘু সরকার। রতন গোঁসাইকে জড়িয়ে নিজের মেয়ের নামে অকথ্য খিস্তির বান ডাকাতে লাগল।

এমন বাদলা দিনেও এ হেন মজাদার কাহিনির রসাস্বাদন করতে এক এক করে অনেক লোকই জমে ওঠে। বেশ তৎপরতার সঙ্গে হাজির হয়

মিলন সংঘের ছেলেরা। ওদের হাসি এবং মুখরোচক বিদ্রুপ শক্তিশেলের মত বিঁধতে লাগল রতনকে।

চোখের সামনে উঠোনের কাদায় পড়ে আছে শান্তা। কী ভীষণ অসহায়। রতন একবার তাকাল ওর মুখের দিকে। কোন কথা নেই, ভাষা নেই, নির্বিকার উদাসীনতায় হারিয়ে গেছে একটু আগের সেই মেয়েটি। ভিক্ষের চালগুলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরময়।

রঘু সরকার শূন্য ঝুলিটাকে ছুঁড়ে দিল কাদাভরা উঠোনে। সেই সাথে খঞ্জনিটাও। দেওয়ালে টাঙান গুপিযন্ত্রটা নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে মড়মড়িয়ে দিল। 'আমার এখান থেকে যাবি কিনা বল। দু'মুঠো ভিক্ষের চালে আমার ইজ্জত কিনতে চাস্ ঢ্যাম্না বোষ্টম।'

শেষ পর্যন্ত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আবার পথে নামল রতন। শেষবারের মত ঘরটির পানে তাকাল। শান্তা সেখানে নেই। ভিতরের কান্নাকে কোন মতে রুখে দ্রুতপায়ে এগোতে লাগল। এতদিন পরে সত্যকার বিদ্রোহী হয়ে উঠল রতন। মনে হল সমীর হাজরার কথাই ঠিক। নিরন্ন মানুষ আপন বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এইভাবেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দাসত্ব মেনে নিচ্ছে রঘু সরকারের মত। কেউ বুঝতে পারছে না কী ভীষণভাবে ওরা সকলেই শোষিত। এ ব্যবস্থা কোনদিন চলতে পারে না। শোষণের এ কারাগারে কৃষ্ণ জন্ম নেবেই, এখন শুধু অপেক্ষায় থাকা।

পাড়ার সীমানা পেরিয়ে আদুরি ঠাক্‌মার বাড়ি। ঠাক্‌মার ডাক শুনে দাঁড়ায় রতন। গান শোনার জন্যে নিজেই এসে ডেকে নিয়ে যায়। কেন জানি না বাধ্য শিশুটির মত রতন আসে। বসে, কিন্তু মুখে একটিও কথা নেই। শুকনো মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঠাক্‌মা অবাক হয়ে যায়। 'ঝোড়ো কাকের মত তোমার এমন দশা কেন গোঁসাই।'

সব কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল রতন। আশ্রয় দিতে চাইলেন ঠাক্‌মা। কিন্তু নতুন করে হারিয়ে যাবার ইচ্ছায় রতন যেন উন্মাদ। মিথ্যে হয়ে গেছে জীবন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাও এখন অর্থহীন। এবার সে পথ চলবে একেবারে একা, নির্জনে মরুভূমির সীমানা খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু গান, না আর

সে কোনদিন গাইবে না। বিড়ির নেশাটাও সে ত্যাগ করবে আজ থেকে। আদুরি ঠাক্‌মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে রতন।

ঠাক্‌মার চোখে জল।

গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে পিচঢালা পথ। অবসন্নতায় পা দুটো কেমন শিথিল হয়ে আসে। বিরাট বটগাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়। কেউ কোথাও নেই। চারপাশে সবুজ ধানক্ষেত, যেন হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় দূরের দিগন্ত রেখায়। উদাস চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়। একটা মোটা শিকড়ের উপর বসে পড়ে রতন।

আর তখনই চোখের সামনে যাকে দেখল তাকে দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। এ যে শান্তা! হাঁ, ধীর সংযত শান্তা দাঁড়িয়ে আছে তারই সামনে।

'এমন অপমান নিয়ে চলে যাচ্ছ গোঁসাই।'

কি উত্তর দেবে ভেবেই পেল না রতন। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'তুমি এখানে!'

'কোথায় আর যাব বলো। মরবার জন্যে এখানে এসেছিলুম। কিন্তু পারলাম না তোমাকে দেখতে পেয়ে। আর কোনোদিন আসবে না গোঁসাই?'

গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল রতনের মুখ। 'তুমি ফিরে যাও শান্তা। আমি আবার আসব। তুমি যে আমার কৃষ্ণকে বাঁচিয়ে দিলে নতুন করে। তোমার মত রাধাকে নিয়ে যে তার নিত্য লীলা।'

''আমি পথে পথে দিন কাটাব তোমারই আশায়। আর যে আমি ঘরে ফিরতে চাই না গোঁসাই।''

জীবনে এ এক মহালগ্ন। বেদনার মধুর আলোয় বৃন্দাবনের পথটুকু চিনে নিতে ভুল করল না রতন।

পুবের মাঠের ভোর
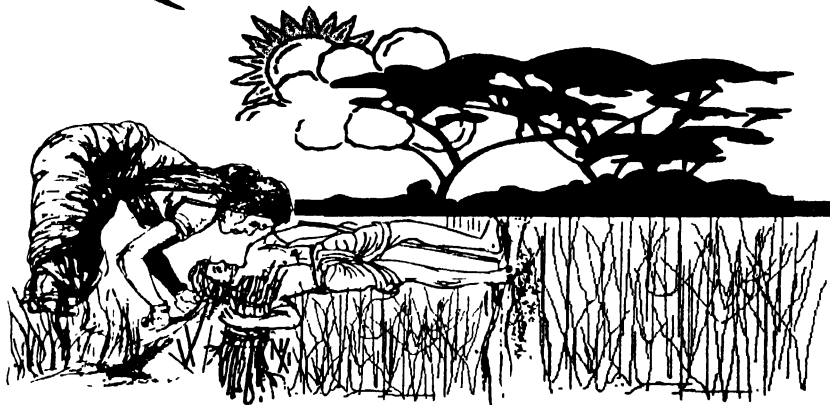
এত কিছুর পরেও কেষ্টকে হতাশ করল সরস্বতী। ঢিলের ঝুড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে বিল বাঁধের উপর দিয়ে হন্ হন্ করে একাই এগিয়ে চলল পুবের মাঠের দিকে। যাওয়ার সময় বেশ রাগের সঙ্গে শুনিয়ে দিল, "পুরুষদের সব ন্যাকামিই আমি জানি। সবাই এক একটা শয়তান।"

বিচিত্র রেকর্ডি গানের জমজমাট আসরটা স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। গায়ক ছিল কেষ্ট একাই। ধরা গলাকে চাঙ্গা করতে মাঝে মাঝে বিরতি ঘটেছে, কিন্তু সে আর কতটুকু সময়। একটা বিড়ি টেনে মৌজটাকে পূর্ণমাত্রায় আনতে যে সময়টুকু লাগে। মনে করেছিল এতেই মন পাবে।

বেশ কিছুটা আসার পর একবার পিছন ফিরে তাকাল সরস্বতী। না- আসছে না কেষ্ট। বোধ করি খুব মনে লেগেছে ওর। লাগুক, তাতে কি? আর সে ধরা দেবে না কাউকেই।

চাঁদের আলোয় গোটা মাঠ হাসছে। ঝির ঝিরে ভিজে বাতাসে কেমন নেশালাগা সুর। বিলের জলে শাপলা শালুকের নতুন করে ফুটে ওঠার কানাকানি। রাতের শরীরে এখনো সৃষ্টির উন্মাদনা।

বড্ড ভাল লাগে চারপাশটাকে একবার পরাণ খুলে দু'চোখ ভরে

দেখতে। মাঠের সীমানা পেরিয়ে রাতের আড়ালে ঐ পৃথিবীটা যেন অনেক বড় হয়ে ধরা পড়ছে। ছোট বলে মনে হলেও ছোট হয়ে থাকতে চাইছে না। ঠিক মানুষের জীবনে বেয়াড়া ঐ যৌবনটার মত। মন তখন সব বেড়াগুলো ভাঙতে ভাঙতে এই খোলা মাঠটার মত কেমন উধাও হয়ে যায়—ঠিকানা হারিয়ে ফেলে।

ভালবাসতে কার না ভাল লাগে। বিশেষত যৌবন যখন দুর্বার আবেগে আমন্ত্রণ জানায় কাউকে। অসংখ্য স্বপ্নের কাছে হার মানে বাস্তবের সকল বাধা। কিন্তু ভালবাসতে গিয়ে ভুল করেছে সরস্বতী। খেসারত দিতে হয়েছে অনেক। কুমারীত্বকে অক্ষত রাখতে পারেনি। ভোমরা হয়ে ফুলের মধু খেয়ে পালিয়ে গেছে মদন। কত সুন্দর কথা, কত আশ্বাস সে শুনেছে রাতের পর রাত। সরল বিশ্বাসে নতুন পৃথিবীর স্বপ্নে সেই সব রাত কত মধুর।

এত দিয়েও কিন্তু কি পেল সে। বিয়ে করার কথা দিয়ে মদন সেই যে গেল হাওড়ায় আর কোন খবরই নিলে না বছর খানেক, এমন কি বাড়িতেও এল না। বাড়িতে যখন ফিরল তখন সঙ্গে নিয়ে এল ফরসা টুকটুকে একটা বৌ। করবী বৌদির কাছে শুনেছিল বৌটা নাকি পাড়ার সেরা সুন্দরী। নিজের অত রূপ নেই বলে সেদিন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে কারণ রূপ না থাকলে ভালবাসাকে মানুষ বুঝি এমনি করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। অথচ মদনের কাছ থেকেই সে শুনেছিল—'তুই ঠিক আকাশের চাঁদটার মতন, তোর মত সুন্দর আর কেউ নেই।' এখন বুঝতে পেরেছে ও সব কথার কোন দাম নেই। সব কিছু যেন কলকাতার যাত্রা পার্টির অভিনয়ের মত। পালা শেষ হলে সবাই যেমন মুখের রঙ, চোখের কাজল তুলে ফেলে চলে যায়, অবিকল তেমনি। এই দুর্বলতার জন্য কোন অভিমান বা অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি সরস্বতী। সমস্ত কান্না বুকের ভিতর চেপে রেখেছে, সব কটি মিলন সুখ গভীর লজ্জা হয়ে মরমে বিঁধছে প্রতি মুহূর্তে। এমন ভাবে হেরে যেতে তৈরি ছিল না সে।

রাত বাড়ছে। চাঁদ ঠিক মাথার উপরে। ব্যাঙের ডাক, এখানে ওখানে সাপের ব্যাঙ ধরার শব্দ, ঝিঁঝির চিৎকার শোনা যাচ্ছে চার পাশে। নিশীথ

রাতের নির্জনতায় আপন আশ্রয় খুঁজে পায় সরস্বতী, দুঃখ শোকের মাঝেও কিছু আনন্দ। নিরন্ন মানুষের এমনি কষ্ট করে বাঁচা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তার মত এমন সোমত্ত মেয়ে এক ঝোড়া ঢিল মাথায় করে কখনো মাঠের পর মাঠ চষে বেড়াত না। রাতে একলাটি কেউ বেরোয় না সাহস করে। যদি বা বেরোয় নন্দর বিধবা বউটা, সে তার ছেলেকে সঙ্গে নেয়। দুটো বেশি মাছ পাবার আশায় কেউ কাউকে সঙ্গী করতে চায় না। পৃথিবীর নিয়মটাই বুঝি এই রকম।

কেষ্ট সঙ্গ নিয়েছিল কি কারণে সেটা ভাল করেই জানে। চাওয়ার জগতে মদন এবং কেষ্ট এক, নতুন করে আর একটা মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে কি লাভ। পাড়ায় মেয়েরা তো বুকের গতর মেপে কানাকানি করবে, শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ বলেই ফেলবে – 'হ্যালা নিতুই রাতে বের হোস্, কোন্ নাঙের সঙ্গে মজেছিস্ লো। খুব লুটোপুটি খাচ্ছিস্। ভয় কি, হাসপাতাল হয়েছে। সতী নামে কালি পড়তে দেবে না।' মদন বউ আনার পর সব কানাকানির শেষ হয়ে গেছে। আগে বঁটি কাটারি নিয়ে খানকির ঝি বলে কারুর পিছু ধাওয়া করতে পিছপাও হত না সরস্বতী। এখন মনের সে তেজটাই কোথায়। সব কেমন নেতিয়ে গেছে।

চার বছর ধরে তাকে একাকে চালাতে হচ্ছে সংসার। মা একটা অকেজো বুড়ি, কিছু মুখে তুলে দিলে খেতে পারবে এমন অবস্থা, আর ছোট ভাইটার বয়স মাঠ থেকে শামুক কুড়ানোর মতও নয়। দু' কেজি তুলতে পারলে রোজ তবু কিছু ঘরে আসত। বাপের আমলের এক চিলতে এমন জায়গাও নেই যে দুটো গাছপালা বসিয়ে খাবে। পুঁজির মধ্যে গতর।

শ্রাবণে ধান রোয়া, ভাদরের প্রথম দিকটা পর্যন্ত নিড়েন দেওয়ার কাজ জুটেছে মাঝে মাঝে। মজুরি খেটে দিন কেটে গেছে। কিন্তু এখন বস্তি হয়ে গেছে গোটা বাগদিমহল। পুরুষরাই যেখানে কাজ জুটাতে পারেনি সেখানে মেয়ে মজুরের অবস্থা আরো শোচনীয়। বসে থাকলে পেট কি কথা শোনে। আজ তাই ঘর থাকতে উধম মাঠ সঙ্গী করে কাটাতে হয় গোটা রাত। দিনেও কি নিস্তার আছে। জঁইতি পাতার রস ঢেলে কেঁচো ধরতে হয় গাদা গাদা।

তারপর সারা বিকেলটা ফুরিয়ে যায় ঢিলে কেঁচো গাঁথতে। সন্ধ্যে হলে মাকে খাইয়ে, ভাইয়ের জন্য রুটি চাপা দিয়ে রেখে নিজেরটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় সাত তাড়াতাড়ি। এ কষ্টে কিন্তু দুঃখ নেই, সব কিছু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এই রকম কষ্ট করতে দেখেছে বাবাকে, মরে তবে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অভাব এবং দুঃখ নিয়ে গোটা পাড়ায় কেউ কিন্তু তেমন ভাবে না। না কিছু জুটলে শালুক ডাঁটা চিবিয়ে ঝিমোতে থাকবে। গরিবের ঘরে জন্মালে দুঃখকে এমন সহজভাবে মানিয়ে নিতে হয় এটাই জন্মগত বিশ্বাস। যত অবিশ্বাস পাড়ার ছোঁড়াগুলোর উপর। পিরিতের গান গায়, কিন্তু পিরিত রাখে না।

আকাশে দু'এক টুকরো ভাদুরে মেঘ ছিল, জমাট হয়ে ওঠার মত এমন কিছু নয়। হঠাৎ মেঘের ডাক শুনে চমকে উঠল সরস্বতী। দক্ষিণ দিক থেকে মিশ্‌কালো মেঘটা উঠে আসছে হুমড়ি খেয়ে। গিলে ফেলছে চাঁদের আলো। মাঠে নামার আগে ঘর থেকে পরে আসা শাড়িটা ছেড়ে ফেলে। ভিজে যাবার ভয়ে পলিথিনের পেখের ভিতর ভরে রাখে। কারণ এটা পরেই ধরা মাছ নিয়ে বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াবে পাড়ায় পাড়ায়। মাঠে নামার কাপড়খানার শতছিন্ন রূপ দেখে হেসে ফেলে সরস্বতী। রাত বলেই কোন মতে পরা যায়। বুকের উপর দিয়ে আঁচলটা টান টান করে ঘুরোতে গিয়ে খানিকটা ফেঁসে যায়। নিজের চিকন কালো রূপটা আপন মনেই দেখল কয়েকবার, মন্দ কোথায়! দেহটার কোন কিছুই আগে এমন ছিল না, সময় যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খাতায় নতুন করে ঠিকানা লিখছে। বেশ মিষ্টি লাগছে। নিশ্চয়ই তারও দেবার মত এখনো অনেক কিছু আছে। রাঙা বউ না হতে পারুক সেও ফ্যালনা নয়। কেষ্ট তা না হলে পিছু নেবে কেন?

বিল বাঁধের দখিণ দিক জুড়ে জমাট বাঁধছে অন্ধকার। মেঘ ক্রমশ উত্তর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এখনো বৃষ্টি নামেনি। নাও নামতে পারে। ভয় দেখিয়ে দৌড় মেরে কোন্ কোণে গিয়ে ডেরা বাঁধবে কে জানে। উত্তর মাঠ জুড়ে এখনো কিন্তু চাঁদের নরম আলো। শিশির ভেজা ধান গাছ নুয়ে আছে পুজারির মত। রাতের এই পৃথিবী ঠিক এ সময়ে স্বর্গকে বুঝি খুব কাছে নামিয়ে এনেছে। গুন্ গুন্ করে গান ধরল সরস্বতী। জানে এ গান কেউ শুনতে পাবে

না। মনের কথাগুলো মেলে দিয়ে সে একাই শুনবে। শিরায় শিরায় জেগে উঠছে বাঁচার স্বপ্ন, চঞ্চল নেশা। সত্যিকার কেউ যদি ভালবাসত সেও এই মুহূর্তে কানের কাছে মুখ নিয়ে নীরব ভাষায় মনের সব কথা বলে দিতে পারত।

কেষ্টকে ভালবাসার কথা ভাবলেই মদনের ছবিটা সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। তখন মনে হয় মদনের রূপের কাছে কেষ্ট কিছুই নয়। বিশেষ করে চুল্লু খেয়ে ও যখন সরস্বতী বলে হাসে তখন সামনের উঁচু উঁচু দাঁতগুলো যেন গিলতে আসে। মদনের সঙ্গে পাল্লায় হেরে গেছে কেষ্ট। নচেৎ কতবার বলেছে—'তোকে আমি কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ঘরে আনব। মা কালীর নামে তিন সত্যি বলছি। তুই রাজি হয়ে যা মাইরি।'

মদনের সঙ্গে দিনের পর দিন নিবিড় হয়েছে, কেষ্ট কিন্তু আশা ছাড়েনি। একবার হলেও আড় চোখে তাকিয়ে একটু হেসেছে, ম্লান চোখের ভাষায় মনের কথা জানিয়েছে বারে বারে। তখনও কিন্তু নতুন স্বপ্নে ভেসে বেড়াচ্ছে সরস্বতী, কেষ্টকে এতটুকুও আমল দেয়নি। বাধ্য হয়েই কেষ্ট নীরব থেকেছে। আবার সব কিছুই যখন ওলট পালট হয়ে গেল তখন থেকেই মদনের ফাঁকা জায়গাটায় জাঁকিয়ে বসতে চেয়েছে কেষ্ট।

নিজের মনেই অবাক হয় সরস্বতী। কেন কেষ্টকে আর আগের মত মাতাল বা কুশ্রী বলে মনে হয় না। অনেক কিছুই যেন সুন্দর হয়ে ধরা দিচ্ছে তার চোখে। মদনের থেকে ওর ছাতিটা কত চওড়া, বাবরি চুল নামিয়ে দিয়েছে কাঁধ পর্যন্ত, চোখ দুটোর গড়ন কেমন ভীরু ভীরু অথচ সুন্দর। সরস্বতী আবিষ্কার করেছে কেষ্ট কথায় কাজে একরোখা। যা বলবে মরতে মরতেও করবে। শুধু বাইরেটা নয় মনের কৌটোয় কি লুকানো থাকে সেটাও এবার ভাল করে জানবে। জীবন দিয়ে বুঝেছে ভিতরের মানুষটাই আসল মানুষ।

একটা শিয়াল কাঁকড়া ধরে কড়মড় করে চিবাচ্ছিল একটু দূরে। আবার জলে নামল শিকার ধরতে। এই সামান্য ব্যাপারটার সঙ্গে বেশ একটা মিল দেখতে পেল সরস্বতী। বাঁচার প্রয়োজনে, দেহের প্রয়োজনে মানুষ জীবজন্তু সবার চিন্তাভাবনা এবং আচার আচরণগুলো প্রায় একরকম। আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবে সরস্বতীও নামল জলে।

মাঠের উপর দিয়ে চলে গেছে ইলেকট্রিক লাইন। সেই তার বরাবর কয়েকটা ধান গাছকে একসঙ্গে বেঁধে চূড়োর মত করে নিশানা রাখল সরস্বতী। প্রথম টিলটা কপালে ছুঁইয়ে থুৎকুড়ি ফেলে জলে ভাসাল আর অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, 'থুপড়ি মাকাল বুড়ি।'

প্রত্যেকটা টিলের দৈর্ঘ্য ৩০ সেমির মত। এতে বাঁধা থাকে সুতোর ডোর। শেষ প্রান্তে বাঁকানো কাঁটা আবার কোনটায় বা অপূর্ব কৌশলে তৈরি চটা কল। মাছ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেঁথে যাবে তীরের মত। নল খাগড়ার টুকরো বলে এগুলো কাজ করে ঠিক ভাসমান ছিপের মত। মাছ খেলে বড় জোর একটুখানি টেনে নিয়ে যেতে পারে, তারপর ধানগাছে জড়িয়ে যায় কিন্তু পালাতে পারে না।

প্রতি দশ হাত ছাড়া টিলগুলো ভাসাতে ভাসাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে সরস্বতী। মাঠে হাঁটু জল। অন্ধকারে আমলা ঘাসের বনে পড়লে পা দাগড়া দাগড়া হয়ে কেটে যায়। একটু সাবধানে এগোতে হয়, সময় লাগে। এইভাবে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার পথ তৈরি করে চলতে হয়।

মাঝে মাঝে সাপের ব্যাঙ্ ধরার শব্দ বুকের রক্তকে হিম করে দেয়। ও সবে কান পাততে নেই। অত ভয় করলে ঘরে বসে থাকতে হয়। সে কারণে সব ভয়গুলোকে অতি তুচ্ছ মনে করে নামতে হয় জলে। এর উপর আছে মশা এবং শ্যামা পোকার একটানা আক্রমণ।

জোর একটা বাতাস ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কালো মেঘটা লুফে নিল চাঁদটাকে। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। ধীরে ধীরে নেমে এল বৃষ্টি। অসহায় পৃথিবী যেন এককোণে গুড়িশুড়ি মেরে লুকোতে চাইছে। ভাগ্যিস্ টিলগুলো ভাসাতে পেরেছিল, নচেৎ কি নাকালটাই না হ'ত। টিলের খালি ঝুড়িটা মাথায় ছাতার মত করে ডাঙা পাবার আশায় সামনে এগোতে থাকল সরস্বতী।

একটানা কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর উধাও হল মেঘ। আবার আলো, হেসে উঠল আকাশ, মাঠ, চারপাশ। পরিচ্ছন্ন নীলের কী অপূর্ব স্নিগ্ধতা। দূরকে আড়াল করেছে মাটি ছোঁয়া লম্বা লম্বা কুয়াশার ফালি। বিল বাঁধের উত্তর

দিকে সেনের ডাঙায় উঠে এল সরস্বতী। হেলান তালগাছের গুঁড়ির উপর একটু বসবার আশায় পলিথিনের পেখেটা বিছিয়ে দিল। কোমর পর্যন্ত কাপড় ভিজে গেছে একেবারে। ক্লান্তিতে ঐ নিয়েই বসে পড়ল। এমন সময় একটা সুরেলা স্বর ছড়িয়ে পড়ল বৃষ্টি ভেজা ধান ক্ষেতের নুয়ে পড়া পাতায় পাতায়--'ও চকোরী চোখ মেলে দ্যাখ।' কেষ্টর গলা। এখনো মাঝ মাঠে পড়ে আছে। মনটাকে চ্যাঙ্গা করার জন্য এরকম গান গাওয়াটাই ওর স্বভাব। কোন দিকে টিলের লাইন পাতছে ভগবান জানে, তবে ওর পাশ থেকে উঠে আসার পর আর পিছু নেয়নি এটা স্পষ্ট।

সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা পেয়ে একটা ঘর বাঁধার স্বপ্ন জাগে বই কি সরস্বতীর। কেন এমনটা হয় তার কারণ খুঁজতে চায়নি কোনদিন, মনের অবাস্তব ভাবনার সঙ্গে সত্যিকার জীবনের মিল নেই দেখে অবাক হয়। হাসে নিজেরই বোকামির জন্যে। কারণ ভাল কিছুর মুখ সে হয়ত জীবনে কোনদিনই দেখতে পাবে না, শুধু নিশাচর জন্তুর মত ঘুরে বেড়াবে রাতের আনাচে কানাচে।

গানের সুর স্বর এবার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে, শেষে এখানেই কি উঠবে নাকি। ভয়ানক বিপদ তো। সত্যিই যদি ডাঙা পাবার আশায় উঠে আসে বলারও কিছু নেই। কিন্তু, পিছু লাগলে সেও ছেড়ে কথা কইবে না। বুঝিয়ে দেবে সেও বাগদির ঘরের মেয়ে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ংকর একাকিত্ব চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে। না-না-আসুক না, ক্ষতি কি? তবু আপদ বিপদের একটা সঙ্গী। কিন্তু এখানে তার অবস্থান যাতে বুঝতে না পারে সেকারণে চুপটি করে বসে রইল সরস্বতী।

না—একটা গানের পর আর নতুন করে কোন গান ধরেনি কেষ্ট। চতুর্দিকে প্রসন্ন নীরবতা। মাঠের চারপাশে একবার তাকাল কেষ্টর গতিবিধি অনুসরণ করতে। হঠাৎ একটা আলোক বিন্দু চোখে পড়ল। বিড়ি ধরিয়েছে কেষ্ট। আলোটা ধীরে ধীরে সেনের ডাঙার দিকে এগিয়ে আসছে। আর যাবেই বা কোথায়। ডাঙা বলতে কচ্ছপের পিঠের মত শুধু তো এইটুকু। এত ছোট

জায়গায় আত্মগোপন করার মত সুযোগ খুব কম। এ সব নিয়ে আর নতুন করে ভাববার চেষ্টা করল না সরস্বতী। যা হবার বা ঘটবার তা ঘটুক, ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চুপটি করে বসে রইল।

অনুমান ভুল হয়নি। এই ডাঙাতেই ঠাঁই নেবার জন্যে উঠে এল কেষ্ট।

উঠে এল জলে ডোবা শেয়ালের মত হয়ে। জল ঝরছে গা থেকে। কেষ্ট মনে করেছিল সে এখানের একমাত্র প্রাণি। কিন্তু এলো চুলে অমন এক জলজ্যান্ত মেয়ে মানুষকে বসে থাকতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল, ভূত নাকি। গোঁঙানির মত আড়ষ্ট স্বরে বলে উঠল, 'কে তুই?'

একটু মজা করতে নড়েচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল সরস্বতী। কোন উত্তর দিল না।

কেষ্ট ভয়েতে ছুটে মাঠে নামার উপক্রম করতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সরস্বতী। তখনো সমানে হাসছে।

কেষ্ট ছুটে এসে দু'হাতে সরস্বতীর মুখটা ধরে বেশ কয়েকবার ঝাঁকানি দিল। "কি দস্যি মেয়ে রে তুই। ভয় দেখাচ্ছিলি।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা চড় বসিয়ে দিল কেষ্টর গালে। "একলা পেয়ে মেয়ে ছেলের গায়ে হাত দাও, খুব যে ওস্তাদ।" মুহূর্তের মধ্যে কেন যে এসব কথা বলল, কেন যে এমন কাণ্ড করে বসল তার কারণ নিজেই খুঁজে পেল না সরস্বতী। নেমে এল মৃত্যুর মত নীরবতা।

সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়াল কেষ্ট। তারপর আপন মনে বলল, "এই উধম মাঠে আমরা খুনোখুনি করে মরলেও কেউ জানতে পারবে না। আমি কি সেই সুযোগ নিতে গেছি? এত স্পর্ধা ভাল নয়।" কোন আক্রোশ নেই, গলার স্বরটা যেন মরা মানুষের মত। গভীর বিষণ্নতা ফুটে উঠল সারাটা মুখে। "বিশ্বাস কর আমি তোর পিছু নিইনি।"

কথাগুলো শোনার পরেও কোন উত্তর দিতে পারল না সরস্বতী।

কেষ্ট ইচ্ছে করলে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই তুচ্ছ মেয়েটাকে এই মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। যে কোন রকমের অপমান বা অসৎ ইচ্ছা পূরণ-

সবই সে করতে পারে। কে বাধা দেবে এখন? কেউ না। কিন্তু কেষ্ট আদৌ তা করল না। মাথা নীচু করে সরে গেল অন্য দিকটায়।

সারা সময়টা চুপচাপ। কারুর সঙ্গে কোন কথা নেই। যে বিড়িটা ধরিয়ে কয়েকটা টান মেরেছিল, বেশ কিছুক্ষণ জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। অন্য সময় হলে টানতে টানতে সুতো পাইয়ে ছেড়ে দিত কেষ্ট।

এই আনমনা ভাবটুকু দৃষ্টি এড়াল না সরস্বতীর। রাত শেষ হয়ে আসছে। পূব আকাশে ফুটে উঠেছে শুকতারা। এখন থেকে জলে না নামলে রাত শেষ হবার মুখে ভাসান টিলগুলো তুলে আনা সম্ভব হবে না। সরস্বতীর সঙ্গ এড়ানর জন্যই আগেভাগে মাঠে নামল কেষ্ট। কেষ্টকে নামতে দেখেও ব্যস্ততার কোন লক্ষণই দেখা গেল না সরস্বতীর। জড়ের মতো বসে রইল একই স্থানে। দুঃখ, অভাব এসব এখন কিছুই নয়, গভীর ভাবনা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণ মৌনতায়। কিই বা দাম আছে তার। জীবনটা প্রতি মুহূর্তে হতাশার বোঝা মাথায় নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, সব আশা পিছু হটে যাচ্ছে। এ জীবনে ও সব থাকতে নেই। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে। চোখের সামনে দিনের পর দিন সম বয়সী মেয়েদের অনেক কিছুই করতে দেখছে। একই পাড়া থেকে কলেজে পড়তে যাচ্ছে যারা তাদের মুখেই শুনেছে ভালবাসার কত কথা। স্কুলে যাওয়ার দলটাও পিছিয়ে নেই। সেই শুধু পড়ে আছে সবার পিছনে। দেখেছে নিজের চোখে রায়গুণাকর সেতুর উপর বিকেল বেলার ছবি। হৃদয় দেওয়া নেওয়ার মনোরম সব বিজ্ঞাপন পোষাকে, আচারে ব্যবহারে, দেখেছে কেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে ওরা চাইছে একটুখানি নির্জনতা। জীবনকে এভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পাওয়ার সুযোগ তার নেই। একটুখানি আলোর মত প্রথম জীবনে যতটুকু বা এল তাও পাঁজরে বিঁধে রইল কাঁটার মত।

'সরস্বতী—স-র-স্ব-তী'। হঠাৎ তীব্র চীৎকারে আপন চিন্তার জগত থেকে উঠে এল সরস্বতী। সচেতন হয়ে উঠল কেন ডাকছে কেষ্ট সেটুকু জানার জন্য।

আবার সেই ডাক, ''শী গ্ গি রি আয় রে। মরে যাব, দারুণ দংশেছে

কালে।"

জল ভেঙে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলল সরস্বতী। ঝোড়া পেখে সব কিছু পড়ে রইল সেনের ডাঙায়।

পূব আকাশে লাল আভা ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। ইলেকট্রিক লাইনের তারগুলোও বেশ দেখা যাচ্ছে। শুধু গাঁয়ের সবুজ সীমানায় নেচে বেড়াচ্ছে রূপসী কুয়াশা। দূর থেকে শোনা শব্দ ধরেই ছুটছিল সরস্বতী। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছিল না।

আর একবার হাত তুলে কিছু বলা চেষ্টা করছিল কেষ্ট। কিন্তু পারল না।

অবস্থানটা বুঝতে পেরেছে সুতরাং পৌঁছাতে আর দেরি হবে না। নিশ্চয়ই কিছু ঘটে গেছে, যে কারণে দাঁড়াতেও পারছে না। সব ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ কি হাত ছাড়া করতে পারে? কখনই না।

দুরন্তবেগে কেষ্টর সামনে এসে দাঁড়াল। দেখেই ভেঙে পড়ল কান্নায়, 'একি হয়েছে তোমার।'

যন্ত্রণাকতর কেষ্ট তখনও সজোরে ধরে আছে ক্ষত স্থানটা। রক্ত বাঁধা মানছে না, ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। চারপাশের জল যেন লাল আবিরে গোলা। 'আর বাঁচব না রে, মনে হয় কেউটের ছোবল।' মরণের কালো ছায়া মুখের উপর। তবুও তাকিয়ে থাকে সরস্বতীর মুখের দিকে। চোখের কোণে টলমল করছে কয়েক ফোঁটা জল। "কিছু মনে করিস্ না। সব কিছু জেনেও আমি তোকে ভালবাসতে চেয়েছিলুম। এটা তুই বিশ্বাস কর। আমি জেনে গেছি ভালবাসা জোর করে হয় না। ভুলের জন্যে এই শেষ বেলায় মাফ করে দে।"

চোখে জল সরস্বতীরও। তবুও মনটাকে শক্ত করে বলে উঠল, 'অত ভয় করছ কেন। আমি তো আছি।'

কোমরের কাছ থেকে পরণের ছেঁড়া কাপড় খানা নিমেষে দু'টুকরো করে ফেলল। বুকের লজ্জাটুকু ঢাকবারও কোন প্রয়োজনবোধ করল না

সরস্বতী। তারপরই দংশান পাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বাঁধতে থাকল সকল শক্তিতে।

"সময় খুব বেশি হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ইন্‌জেকসন দিলে ভাল হয়ে যাবে।" ম্লান মুখে এই প্রথম ফুটে উঠল আশ্বাসের অপূর্ব হাসি।

কেষ্টর দেহটা তুলে নিল বুকের উপর। গলাটা জড়িয়ে ধরেছে কেষ্ট। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

চরমতম মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বাঁচতে চাইছে কেষ্ট, আর প্রবল তুফান থেকে জীবনের নৌকোটাকে বন্দরে নিরাপদে পৌঁছে দিতে চাইছে সরস্বতী। জীবনের কোন স্বপ্নই এখন ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে না। নারীর লজ্জা এবং ভয় তাকে আর কোন মতেই ছোট করতে পারছে না, পরিবর্তে সময়ের আয়নায় ধরা পড়ছে জীবনের অন্য এক রমণীয় রূপ। যদি ক্ষণস্থায়ীও হয়, এর চেয়ে মহৎ সত্য জীবনে সে কোনদিন খুঁজে পায়নি। না হলে এ যন্ত্রণা তার ভিতরে সমানভাবে বাজছে কেন?

দূরে মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশনের পাশে হসপিটালের সবুজ আলোটা এখনো ঠিক জ্বলেছে। দূরত্ব আর ভয় ধরাতে পারছে না মনে। মাঠ পেরিয়ে মোটর বাঁধে উঠতে পারলেই সমস্যা মিটে যাবে।

মনের অস্থিরতায় অতটা ভার নিয়ে টাল সামলে চলতে পারল না সরস্বতী। হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলের উপর। দেহের শক্তি হার মেনে গেলেও মনের শক্তি নিয়ে সে জিততে চায়। জিততে তাকে হবেই। নতুন একটা উপায় বের করে ফেলল। দু'হাত দিয়ে ধরে কেষ্টর দেহটা জলে ভাসানর মত করে পিঠ দিয়ে ধানগাছ সরিয়ে ঠিক পিছু হঠার মত বসে বসে চলতে লাগল রোড বাঁধের দিকে।

যন্ত্রণাকাতর কেষ্টর চোখেও ধরা পড়ছে জীবনের স্বপ্ন, রাত্রি শেষের অবিশ্বাস্য এবং পবিত্র সূর্যোদয়।

ওয়েসিস

নড়বড়ে তক্তপোষটার উপর ট্যুইস্ট নাচ নাচতে লাগল কবীর। বিরক্ত হল শঙ্কর। বলল, "রাত শেষ হলে কী খাবে সে চিন্তা নেই, কেমন নাচছে দ্যাখো।"

শঙ্করকে আরও বিরক্ত করার জন্য কবীর নাচে একটু বেশি উৎসাহ দেখাতে লাগল।

অন্যেরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল — এন্‌কোর ..... এন্‌কোর ..... এন্‌কোর। উচ্চ হাসির সঙ্গে একজন অপরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে উঠল। টালির ছাউনি দেওয়া ছোট একটা ঘরে উদ্দাম জীবনের বিচিত্রানুষ্ঠান এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগল। শঙ্কর শেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। "নে তোরা যা ইচ্ছে কর, আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না।

এমন সময় টলতে টলতে ঘরের ভিতর ঢুকল সুমন। "সাবাস্, এস

দোস্ত, আমরা সবাই এই ভাবেই রাতটা শেষ করে দিই।"

সুমন কবীরের হাত ধরে ব্যালে নাচ নাচতে শুরু করল, সেই সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া সুরে গাইতে লাগল চটুল হিন্দিগান। দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। "সাবাস, চালাও"। শঙ্করও শেষ পর্যন্ত হাসিতে যোগ দিল। নাচতে নাচতে হঠাৎ মেঝের উপর লাফিয়ে পড়ল কবীর। "এ শালা তক্তপোষটা মচাং করে উঠল কেন রে। ঘুন ধরা মালটা বোধ হয় এতদিনে দেহ রাখল।"

গান থেমে গেল। সবাই সচকিত হয়ে উঠল তক্তপোষটা ভেঙে যাওয়ায়। কড়া মদ গেলার মত মুখটা বিকৃত করে মনীশ বলল, "ভালোই হল, আমাদের মত বাউণ্ডুলেদের কাছে মেঝেটাই স্বর্গ। আস্তানা একটা মিলেছে এটাই ভাগ্যের ব্যাপার।" জামার পকেট থেকে গাঁজাটা বের করে দলতে দলতে একবার তাকাল শঙ্করের দিকে। "শুনছ ভায়া, এ সাধনায় একবার সিদ্ধ হতে পারলে যত সব পার্থিব বস্তু এক মুহূর্তেই মূল্যহীন হয়ে যাবে। তখন এই বেকারত্ব নিয়ে আর কোন ভাবনা থাকবে না। মার দম — হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

মনীশের সুরটা সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিল অমিত। নিভে যাওয়া আসরটা আবার জমজমাট করে তুলল। "দম — মারো দম ......।" সকলে আবার গলা মেলাল। রান্নার হাঁড়িটা নিয়ে কবীর মিলিত সুরের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতে লাগল মাথা নেড়ে নেড়ে — "ধিন ধেরে কেটে ধা।"

"রাত দশটা বেজে গেল এখনও তোমাদের খিদে পায়নি।" কথাগুলো বলতে বলতে পাশের বাড়ি থেকে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল মাসি সুধাময়ীর মেয়ে মন্দিরা। ঘরের ভিতরটা একবার উঁকি মেরে দেখে উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল, "আজ তাহলে তোমরা কিছু খাবে নাতো?"

মুহূর্তে বদলে গেল ঘরের পরিবেশ। সকলের মুখ অদ্ভুত আনন্দে মূর্ত হয়ে উঠল। মন্দিরা ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল যেন এক সম্রাজ্ঞীর মত।

আলোটা ঘিরে যে যার থালা আর জলের বোতল নিয়ে বসে পড়ল মেঝের উপর। গাঁজা দলা বন্ধ রেখে মনীশও খেতে বসল।

রান্না করা তরকারি এবং রুটি সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিচ্ছিল মন্দিরা। এই কাজের জন্য সবাই মিলে মন্দিরার একটা মাসমহিনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

পাঁচ জোড়া চোখ চেটেপুঁছে খাচ্ছিল মন্দিরার অর্ধআবৃত যৌবনটাকে। কালো রঙ, মাঝারি চেহারা, এক মাথা রুক্ষ চুল, পরনে একটা আধময়লা শাড়ি। ব্লাউজের ছেঁড়া অংশটা দিয়ে পেটের ভাঁজটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। খোঁপায় গন্ধরাজ ফুল, সব মিলিয়ে ওকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল, অনেকটা দেহাতি মেয়ের মত।

মন্দিরার রানি নামটা শঙ্করই দিয়েছিল। নবাগত মাধব এসেও মন্দিরাকে রানি নামেই চিনেছিল। শঙ্করের পিঠ চাপড়ে বলেছিল, "খাসা নামটা দিয়েছিস কিন্তু। ও আমাদের মাঝে ওয়েসিস্।" ওয়েসিস্ না হলেও এই বেকার বেদুইনের দল মনে করত রানি সত্যিই অপূর্ব। অতি অল্প দিনের পরিচয়, তবু কত আপন। এই ছোট ঘরটায় শঙ্কর প্রথম যখন এসেছিল তখন কত অসহায়। কাঁধ থেকে ঝোলা ঝুলি নামিয়ে রেখে চারপাশটা দেখছিল। নবাগত এই অদ্ভুত মানুষটাকে সেদিন সাহস যোগাতে এগিয়ে এসেছিল রানি। "কোন ভাবনা নেই, আপনি থাকুন। আমরা আপনার পাশে আছি।"

এই আশ্বাসটুকু নির্ভর করে এটা ওটার প্রয়োজনে শঙ্কর বারবার গেছে ওদের দোরগড়ায়। নিজেরা গরিব, তবু ওর অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পেরে সাধ্যমত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল মন্দিরা। প্রথম দিন থেকেই দুটি বাড়ি যেন এক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিলম্বিত লয়ে এ ঘরে পর পর ঠাঁই নিয়েছে মনীশ, কবীর, সুমন এবং অমিত।

মন্দিরা সবার কাছেই অতি আপন হয়ে উঠেছিল। মনের অভিন্নতার কারণে সম্বোধনটা তুমি থেকে তুই হয়ে গেল পাঁচটি প্রাণির কাছে। ওরা সবাই জানে এ এক আজব সংসার। কারণ এখানে যারা এসেছে তার প্রত্যেকেই বেকার। ভাগ্যের চাকাটা সচল করতে স্বপ্নের ভাঙাচোরা গাড়িটাকে বারবার স্টার্ট দিতে চেষ্টা করছে। সমস্ত ব্যর্থতা এবং হতাশা মুছে ফেলে সবাই চলেছে একই ছন্দে, একই তালে। কেউ হকারি করছে, কেউ চাকরি নিয়েছে মুদিখানায়,

কেউ বা ট্যুইশানি করছে।

রানিকে কাছে পেয়ে পাঁচটি প্রাণিই সতেজ হয়ে উঠল। প্রথমেই মশকরা শুরু করল মনীশ, — "রানিকে খাসা মানিয়েছে কিন্তু"। মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসিতে কমবেশি সবাই যোগ দিল।

মন্দিরা লজ্জামাখা হাসিটা ছড়িয়ে দিল আলোর চারপাশে। "এই সব বাজে কথা বললে পেটটা ভরবে তো?"

"দাঁড়া না, আর ছ'দিন বাদে দু-দুটো ট্যুইশানির টাকা পাই, তখন আমিই একটা ফিষ্ট দেব।" গর্বিত ভঙ্গিতে কথাটা বলে আপন পৌরুষ বজায় রাখার চেষ্টা করল মনীশ।

মাধবের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "ফিষ্ট দিয়ে কি হবে বাছাধন, ইলেক্সানে দাঁড়িয়ে এম.পি. হবে? কিন্তু তার আগে আমায় এক বোতল বিলিতি মাল দেবে তো দোস্ত?"

মাধবের কথায় উচ্চ হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল।

পরাজয়টা গায়ে মাখল না মনীশ, "দাঁড়াও পাই তো আগে তখন রানিকেও আমি মনের মত করে সাজিয়ে দেব।"

সামান্য একটি কথা কিন্তু মুহূর্তে সকচিত করে তুলল সকলকে।

"রানি শুনছিস্, তোকে আর মাসিমাকে কাজ করে পেট চালাতে হবে না। দোস্ত এখন অনেক টাকার মালিক। ওর কাছে আমরা সবাই এখন ফাঁসা বেলুন।"

প্রতিটা কথার ফাঁকে মনীশের দিকে চোখ রেখে বিদ্রুপের হাসি হাসতে লাগল মাধব। মনীশ কোন উত্তর করল না কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কিছু করার ক্ষমতা সে রাখে।

মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে বেপরোয়ার মত বলে উঠল, "ওদের কথা ছাড় তো, আমি যা জানতে চাইছি সেটা বল — তোর কত সাইজের ব্লাউজ লাগে রে?"

হাসল মন্দিরা, "খেয়ে নাও, আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। পকেটের নোটবইটা খুললে দেখতে পাবে আমার ব্লাউজের সাইজটা ছত্রিশ জায়গায় লিখে রেখেছ।"

"আসল কথা কি জানিস্, আমি কিনতে চাই খাঁটি রুবিয়া ভয়েল কিন্তু বাজারে ওটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না। দেরিটা সেই জন্যই।"

"ভাবতে হবে না, দশ বছর বাদে ঠিক মিলে যাবে।"

মন্দিরার পিঠটা আদর করে চাপড়ে দিল মাধব, "সাচ বাত, আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিস দেখছি।"

মৃদু উত্তেজনা এবং সরস আলোচনার গতিকে হঠাৎ স্তব্ধ করে দিল অমিত। একটা মহাভৃঙ্গরাজ তেলের শিশি সকলের সামনে ঠুকে বসিয়ে দিল, "এইবার রানি বল, সবার মত আমিও বোগাস মারি।"

মন্দিরার চোখে বিস্ময়টা হাসি হয়ে ফুটে উঠল, "খালি শিশি নয় তো!"

"অমন কথা বললি কি করে? সিগারেট খাওয়া কমিয়ে তবেই না কিনতে পেরেছি। পরখ্ করে দেখতে পারিস্।"

বাকি চারজনের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল শিশিটা। মন্দিরা খোঁপার ফুলটাকে ভালো করে গুঁজল।

সুমন অনাদরের ভঙ্গিতে শিশিটা এগিয়ে দিল মাধবের দিকে, "আরে ছোঃ! দেখছিস্ না লেখা আছে রিটেল প্রাইস নট্ টু এক্সসিড্ দ্যান ফোরটি রুপিজ। বুঝে নাও তাহলে কেমন ধরনের মহাভৃঙ্গরাজ।"

সমর্থন জানাল মনীশ, "ও কি আর খাঁটি মহাভৃঙ্গরাজ।"

ছোট ঘরখানির মাঝে এক টুকরো আলোকে ঘিরে ডানাগুলো ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল পাঁচ পাঁচটি প্রজাপতি।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল শঙ্করের অর্ধেক খাবার পড়ে আছে। ইঙ্গিতে রানিকে বলল, "এখানের কাজ মিটে গেলে এগুলো নিয়ে যাবি। আমি এঁটো করিনি।"

চোখের কোণে একরাশ কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল মন্দিরার। সেই প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনও এই রকম রান্না করে বেশি ভাতগুলো দান করে অশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করেছিল শঙ্কর। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো সামনে এসে দাঁড়ায়। জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে শঙ্কর টিউব ওয়েলের দিকে যাচ্ছিল। মন্দিরা ছুটে গিয়ে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে জল এনে দিয়েছিল। সেদিনের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন দিনগুলো এখনও মনের মাঝে আনন্দের তুফান তুলে।

চোখ উলটে মাধব তাকাল অমিতের দিকে। "দ্যাখ রে, আজ রানির বরাত খুলে গেছে। দোস্ত আজ বুঝিয়ে দিল ও ফিলিপ সিডনির মত সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে।"

"তুমি বুঝি কিছু দাওনি।" চোখ দুটো ডাগর করে মন্দিরা হাসল।

"সে দেওয়ায় কি আর মন ভরবে রে। একটু সবুর কর, আমি ভারতের প্রেসিডেন্ট হলে তোকে ফাস্ট লেডির পোষ্টটা দিয়ে দেব।" নিজেই হেসে ফেলল নিজের কথায়। এ হাসিতে সবাই যোগ দিল।

"ধ্যেৎ ....।" হাতের ধোয়া বাসনগুলো নামিয়ে পালিয়ে বাঁচল মন্দিরা। পাঁচ জোড়া চোখ আর একবার নেচে উঠল অপূর্ব উন্মাদনায়। মন্দিরা চলে যাওয়ার পরেও ওর হাসির সুবাসটুকু প্রত্যেকে নিজের মত করে উপভোগ করতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

মনীশ আবার গাঁজা দলতে শুরু করল। মাধব আধশোয়া অবস্থায় বলল, "আমাকে ভুলে যেও না দোস্ত, ওটাও আমার চলে।"

শঙ্কর মাধবকে বলল, "ইন্টারভিউটার কি হল?"

"এখনও জানতে ইচ্ছা করে! কুত্তার বাচ্চার মত সারাদিন শুধু ঘুরে ঘুরে হয়রান।"

"আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলি, থেমে গেলি কেন?"

'বলবো আবার হাতি, এ সব শোনার থেকে ঘুমিয়ে পড়, কাজ হবে। ভালো করে জেনে রাখ আমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না।"

মাধব এবং শঙ্করের কথা শুনে প্রতিবাদ করল সুমন। "হবে না কী

রে, আমাদের দ্বারা অনেক কিছুই হবে।'' এতদিন পরে কবীর তো সাকসেসফুল।''

পরের দিন সবাই জানল কবীর বিয়ে করছে, তাই বাসা ছেড়ে চলে গেছে।

শঙ্কর ব্যাপারটা সত্য বলে মানতে পারল না। বলল, ''আমাদের ভালো লাগত না তাই হয়তো চলে গেছে। নচেৎ চাকরি না পেয়েই বিয়ে! এটা পয়লা এপ্রিল নয় যে আমাদের সবাইকে এপ্রিল ফুল করার দরকার হবে।''

'বেশ, এটা দেখলে বিশ্বাস হবে তো?'' সুমন গোলাপী খামখানায় একটা কিস্ দিয়ে ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে।

মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তিনজনে দেখতে লাগল নিমন্ত্রণ পত্রটা। একবার, দুবার, তিনবার। দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না, আশ মিটছিল না। ''একেই বলে বরাত, অমন চাকরি করা বৌ কজনার ভাগ্যে জোটে।'' সুমন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, ''কী বিশ্বাস হচ্ছে এইবার? মাত্র একদিনেই কবীরের পরিবর্তনটা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। ফ্রাসটেশনের সব চিহ্ন কোথায় গেল কেউ জানে না। সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে উঠেছে, রঙটাও বেশ চেকনাই হয়ে উঠেছে। নাউ হি ইজ ফুললি এ জেন্টলম্যান। আমাদের এই আস্তানার স্মৃতি সে যেন ভুলতে পারলে বেঁচে যায়।''

সকলে গোগ্রাসে গিলতে লাগল সুমনের কথাগুলো। মনীশ অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখটা বিকৃত করে বলল, ''স্কাউনড্রেল, আমাদের সঙ্গে দেখাটা পর্যন্ত করল না।''

সুমন বলল, ''আমি কিন্তু ওকে বার বার রিকোয়েষ্ট করেছিলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে সবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার জন্য। ও বিছানাপত্র বাঁধতে বাঁধতে সংক্ষেপে উত্তর দিল হাতে আর সময় নেই।''

এবার সুমন সকলের মানসিক চিন্তাধারার গ্রামোফন ডিস্কটার উপর

পিন চড়াল। "মেয়েটি কিন্তু খুব লাভ্‌লি, রঙটাও ভালো, এপিয়ারেন্সটাও হ্যাণ্ডসাম্।"

মাধব এবার ফোড়ন কাটল, "আরে ছোঃ! রেখে দাও তোমার ফেয়ার কমপ্লেকসান। আমি যেন ওকে দেখি না। টেলিফোন এক্‌সচেঞ্জে কাজ করে করে গালটা একেবারে তুবড়ে গেছে। ওর বোনটা যেটাকে ও পড়াত সেটা হলে দারুন মানাত।"

অমিত কিন্তু বেশ গম্ভীর স্বরে বলল, "যতই নিন্দে করিস্ আমার কিন্তু ঈর্ষা হয় ওর লাক্‌টা দেখে।"

আবার নীরবতা, কেবল দু একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। হ্যারিকেনের জোরটা কমিয়ে দিয়ে সবাই ঢুকল যে যার মশারির মধ্যে। মাধব ঘুমায়নি। উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছিল সত্যিই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। মন্দিরাদের জানালা দিয়ে আসা ক্ষীণ আলোটা তখনো দেখা যাচ্ছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করল সুমন, "কি রে ঘুমাস্‌নি?"

"ঘুম আসছে না রে।"

"তুইও কার প্রেমে পড়লি নাকি?"

"প্রেম কি যার তার দ্বারা হয়, হয় একটা সার্ভিস, নয় মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সমেত একটি বিজনেস থাকতে হবে তবে যদি মলিরা কাছে ঘেঁসে।"

"ভালো করে বোমাবাজি শিখে একটা পার্টিতে যোগ দিয়ে দে, চাকরি হয়ে যাবে।"

"আরে ধ্যেৎ, হ্যাং ইউর পার্টি, পাঁচ বছর তেল্ দিলাম, কিছু হ'ল বলতে পারিস্। বাবুরা আগে প্যাঁকাটির মত ছিল এখন আমাদের মদতে ঘাড়ে গর্দানে সমান হয়ে গেছে।"

আবার মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় মাথা। মনীশের লাল চোখ দুটোয় গাঁজা টানার চিহ্ন স্পষ্ট, "আমি কিন্তু আর ওয়েলিফায়িং এ বিশ্বাসী নই। মারো ছুরি, করো লুঠ, চালাও স্ফুর্তি। সবাই মিলে দেশটাকে এক্‌সপ্লয়েট করছে, আমরাই বা বাদ যাই কেন। এই পলিসিতে যদি চলো তো

বাঁচবে, না হলে এইভাবে কাটাতে কাটাতে একদিন ফসিল হয়ে যাবে।"

ওদের আলোচনায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল শঙ্করের। ধমক দিল এবার। "তোরা আজ যা জুড়েছিস্ আর টিকতে দিবি না। হয় আমাকে ঘুমাতে দে, নয় তোরা ঘুমা। সকালেই পড়াতে যেতে হবে, দেরি হলে শেষে চাকরিটাই নট হয়ে যাবে।"

মাধব একটা সিগারেট ধরিয়ে গোটা কতক টান মেরে ছুড়ে দিল শঙ্করকে। "ওদের হানিমুনটা খুব জমবে নয়?"

"আজ কত ডিগ্রি চড়িয়েছ বাবা, হানিমুনের স্বপ্ন দেখছ। তোমাকেও আমরা খুব শীঘ্র হানিমুন করতে পাঠাব।" তিরস্কারের বাঁকা হাসিটা খেলা করতে লাগল শঙ্করের ঠোঁটে।

মাধব এ সব গায়ে না মেখে ঢুকে পড়ল মশারির ভিতর।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্তব্ধ নীরবতা নেমে এল। অনাদৃত যৌবনের স্বপ্নগুলো ঘুমিয়ে পড়ল একটা কামরার মধ্যে বন্দি হয়ে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, কেবলমাত্র স্তিমিত আলোটাকে ঘিরে মশাদের এ্যাসেমবিলি পুরাদমে চলছিল। অমিত এবং মনীশের নাক ডাকার শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল, সুমনও গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে মশারিটা জড়িয়ে নিয়ে একটা পোঁটলার মত মেঝের এককোণে পড়েছিল। নন্দিতাদের ঘর থেকে বাসন মাজার টুং টাং শব্দ ভেসে আসছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখাটা তখনও স্পষ্ট।

মাধব মশারির ভিতর থেকে খুব সতর্ক দৃষ্টি মেলে তিনজনকে দেখে নিল। ঠোঁটের কণায় স্বপ্নময় হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল। বালিশের ওয়াড়ের ভিতর থেকে একটা কাগজের মোড়া বের করল। যত্নে ভাঁজ করা একশ' টাকার তিনখানা নোট। হাতের মধ্যে ওগুলো নিয়ে চোরের মত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দরজাটা আধভেজানো অবস্থাতেই রইল। মাধব এসে দাঁড়াল বাইরে। বিকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ভিজে টালিগুলো চাঁদের আলোয় রূপার মত চক্ চক্ করছিল। আকাশে তখনো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ কিন্তু পরিস্কার

নীল। একরাশ স্বপ্ন যেন আলোর রং মেখে ছড়িয়ে পড়ছিল সারাটা পথের উপর। জানালার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখাটির দিকে তাকাল মাধব। ধীরে ধীরে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

"এই রানি ...... রানি, তোদের কুঁজোয় জল আছে?" চাপা গলায় খুব সতর্কতার সঙ্গে ডাকল মাধব।

দরজাটা খুলে গেল, "ঘুমাওনি এখনও?"

"না রে, কি করছিলি?"

"কী আবার করব। কাপড়ে জরি বসাচ্ছিলাম।"

"এত রাতেও।"

"তোমাদের হট্টগোলে বুঝি ঘুম হয়, বসে থাকার থেকে কাজ করা ভালো।"

"মাসিমা, ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"বাবা, মা তো সন্ধ্যে বেলাতেই বিছানা নিয়েছে। কার সাধ্যি জাগতে পারে। বয়স হলে ঘুমটা বুঝি একটু বেশি হয়।" হাসল মন্দিরা। চাঁদের আলোয় ওর মুখখানা স্পষ্ট করে দেখল মাধব।

"কি অত সব বলাবলি করছিলে গো?"

"কবীর বিয়ে করছে, তুই শুনিস্ না?"

'সত্যি!' মন্দিরার একুশ বছরের যৌবনটা মুষড়ে পড়ল মুহূর্তে। নিজেকে সামলে নিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, "ডলি দিদিমনির সাথে বুঝি?"

"তুই কি করে জানলি?"

"না জানলেও বুঝতে পেরেছিলাম।"

"কি করে?"

"খুব সহজেই আমাদের মেয়েদের মন দিয়ে। ওরা একদিন পার্কের কোণে কথা বলছিল। আমাকে দেখেই থেমে গেল। চোখ দেখেই বুঝেছিলাম এমনটা হবে।" আত্ম প্রত্যয়ের হাসি হাসতে হাসতে কুঁজো থেকে জল আনতে চলে গেল।

খানিক বাদেই জল নিয়ে ফিরে এল। গ্লাসটা হাত থেকে নিতে ভুলে গেল মাধব। মন্দিরার দিকে পুরুষের সেই আদিম দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। একটাও কথা নেই। "জল খাবে না?" মৃদু হেসে মাথাটা নীচু করল মন্দিরা।

"হ্যাঁ, কই দে।" গ্লাসটা হাতে নিয়ে নিমেষে শেষ করে দিল।

"রানি, ঐ ছায়াটার আড়ালে যাবি?"

"আবার নতুন কোন খেয়াল জাগল নাকি?"

"না রে, হাতটা ধরে ফেলে নোটগুলো তুলে দিল ওর হাতে। অনেক কষ্টে এই টাকাগুলো যোগাড় করেছি তুই রেখে দে। আরও কিছু যোগাড় করে তোর জন্যে বম্বে প্রিন্ট কিনব।"

"পাগল হয়েছ, অতগুলো টাকা দিয়ে শাড়ি কিনবে!" হেসে ফেলল মন্দিরা।

"না রে, তুই রেখে দে, আমার কাছে থাকলে হাওয়া হয়ে যাবে। কিছুতেই ফেরত নিল না মাধব। ফেরত দিল না মন্দিরার হাতখানা। নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে রইল। "তোকে পরতে নেই বুঝি? তোকে যে আমি আমার মনের মত করে সাজাতে চাই। কবীর যেমন ডলিকে পেয়েছে আমিও তেমনি তোকে আমার করে পেতে চাই।" মাধবের গলার স্বরটা কেমন কেঁপে উঠল।

হাতটা ছেড়ে দিয়ে আরও কাছ ঘেসে দাঁড়াল মাধব। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মন্দিরা। মাধবের কথাগুলো বুকের ভিতর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ তুলছিল। দারিদ্র এখন আর কোন বাধা নয়, জীবনের প্রবল জোয়ারে ভেসে যেতে ইচ্ছা করছিল এ মহাসন্ধিক্ষণে।

মন্দিরা ওর মুখখানার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। দু'চোখের নীরব ভাষায় ফুটে উঠল অনাস্বাদিত ভুবনের আহ্বান। এবার হাত শক্ত করে ধরল মাধব। মন্দিরা বাধা দিল না। মাধব ওকে জড়িয়ে নিল নিজের বুকের সঙ্গে। অন্ধকারের সামিয়ানার নীচে জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মাধব বলল, "এই বস্তিরই অন্য কোথাও কাল থেকেই আমরা সংসার পাতবো। ভালোবাসাই আমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেবে।"

মন্দিরার একুশ বছরের যৌবনটা উচ্ছ্বসিত আবেগে সম্মতি জানাল

এই প্রস্তাবে, ইতিমধ্যে শঙ্করও ঘর হতে বাইরে এসে আড়ি পেতে ওদের কথাগুলো শুনছিল। মনের ভিতরটায় আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। মন্দিরা এবং মাধব বেইমানি করল সবার সঙ্গে। চোরের মত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। মরুভূমির মত মনে হচ্ছিল ঘরখানা। আজ আর তাদের জীবনে কোন ওয়েসিস্ নেই। শঙ্করের জীবনে এ এক নিদারুণ পরাজয়। ইচ্ছে হচ্ছিল মাধব ঘরে ঢুকলেই বের করে দেবে। কিন্তু ক্ষণপরেই চিন্তা করল দুটি জীবনের মধুর স্বপ্নকে সার্থক হতে দেওয়াই বরং ভালো। নিজের বিছানা পত্তর গুটিয়ে নিল শঙ্কর। ঘুমন্ত মনীশ এবং সুমনের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ জলে ভরে উঠল। তারপর আপন মনেই হাসল শঙ্কর। মনে মনে বলল, "রানি, আমিও যে তোমাকে ভালোবাসতাম কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারলে না। আমার ভালোবাসা তারা হয়ে জ্বলবে আকাশের বুকে।" ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে নেমে এল শঙ্কর। কাউকে জানতে দিল না সে চলে যাচ্ছে ঠিকানাহীন নতুন পৃথিবীর পথে।

মাধব এবং মন্দিরা দেখল শঙ্কর চলে যাচ্ছে একা একা, উত্তেজিত হয়ে উঠল ওকে ফেরাবার জন্য। বাধা দিল মন্দিরা, "ওকে যেতে দাও। বাধা দিলে ওর সুন্দর মনটা ভেঙে একেবারে চুরমান হয়ে যাবে।"

কবীর চলে গেছে, শঙ্কর চলে গেল, তারাও চলে যাবে। সুমন এবং মনীশও একদিন চলে যেতে বাধ্য হবে। জীবনের দুঃখ দৈন্য হতাশা সব কিছু নিয়ে ডেরা বাঁধবে পৃথিবীর অন্য কোথাও অন্য কোন ওয়েসিসের সন্ধানে।

ঝড় ও বৃষ্টি

সমস্ত পৃথিবীটা এই মুহূর্তে নীরব, নিষ্কম্প। একবার জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকাল মণিকা। গাঢ় মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলো লুটিয়ে পড়ছে মাটির উপরে। হঠাৎ শুরু হল ঝড়। কয়েকটা ময়লা কাগজের টুকরো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মেঝের উপর ঘুরপাক খেতে লাগল। বাইরের দিকে আর তাকানো যায় না। চোখ দুটো ধূলো বালিতে ঝাপসা হয়ে আসছে। হুক টেনে তাড়াতাড়ি শার্সিগুলো বন্ধ করে দিল। কপালের ঘাম মুছে কিছুটা সুস্থির হতে চেষ্টা করল। এতক্ষণ ধরে কি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাকে। কেমন যেন উন্মাদের মত একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কিংশুক। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, গোটা মুখটা চুলদাড়িতে ভর্ত্তি, ঢিলে পাঞ্জাবিটার ভিতর দিয়ে বুকের পাঁজরাগুলো দেখা যাচ্ছে। দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠেছিল মণিকা — 'কে?'

'চিনতে পারছ না, আমি কিংশুক।' কথাগুলো ইস্পাতের মত শক্ত, দাঁড়িয়ে রইল আরও শক্ত হয়ে।

'তুমি!' বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে প্রথম কথা বলল মণিকা।

'চিনতে পেরেছ তাহলে?' -- চোখের উপর চোখ রেখে হাসল কিংশুক।

'হ্যাঁ, কিন্তু আবার জ্বালাতন করতে এসেছ কেন? আমার স্বামী এখন বাড়িতে নেই জান। 'মণিকার দুচোখের ভিতর থেকে ঠিকরে পড়ছিল আগুন।

'আমি সেটা জেনেই এসেছি, আরও কিছু শোনাতে চাও?' ধীর স্থির কিংশুকের কণ্ঠস্বর।

'না, আর কোন কথা শুনতে চাই না।' রাগে ফুলতে ফুলতে দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না। শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই।

'আজ আমি তোমার কেউ নই, কিন্তু তবুও শুনতে হবে কয়েকটা কথা। তোমার না প্রয়োজন থাকলেও আমার প্রয়োজন আছে। যদি শুনতে চাও ......।'

'বলো।' অসহায়ভাবে কথাটা বলল মণিকা।

'আমাদের হাসি ভীষণ অসুস্থ। নার্সকে মা মনে করে মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে, যাবে তুমি একবার দেখতে। একটিবার, খুব গোপনে। আমি ফিরে আসার সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'চিন্তার কারণ নেই, হাসি ভাল হয়ে উঠবে।'

'না তুমি জান না, ওর অবস্থা আদৌ ভাল নয়, আমার ভীষণ ভয় করছে। শেষবারের মত যদি .....।' কথাগুলো শেষ করতে পারল না কিংশুক। চোখে কাতর প্রার্থনা নিয়ে তাকিয়ে রইল মণিকার দিকে।

সারা মুখখানা থম্ থম্ করছিল মণিকার। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব। দেওয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দটা শুধু শোনা যাচ্ছিল।

'বিয়ে করনি আর?' মণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'না, আর প্রয়োজন হয়নি।'' নির্লিপ্ততার ভঙ্গিতে উত্তর দিল কিংশুক।

'তবে আদালতে ডিভোর্সের কেস তুলতে গিয়েছিলে কেন?' বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে সোজা হয়ে দাঁড়াল মণিকা।

বিরক্ত হল কিংশুক। 'সে প্রশ্নের উত্তর কি এখন তোমাকে দিতে হবে?'

'উত্তর দিতে হবে কেন, কেমন করে দিন কাটাচ্ছো সেটা জানতে ইচ্ছা করে না?'

'তুমি বিদ্রুপ করছ! যাবে না তা হলে? বেশ, আজ আবার নতুন করে জানলুম তুমি তার মা নও।'

'সে অধিকার আমার নেই। তুমি আসতে পার। আমার শান্তিটুকু কেড়ে নিতে আর এস না।'

'তোমার ধারণা ভুল, হাসিকে বাঁচাতে তোমার সহায়তা চাইতে এসেছিলাম, আমি তোমার ক্ষতি করতে আসিনি।'

আর দাঁড়ায়নি কিংশুক। চলে গিয়েছিল। যাওয়ার সময়ে আর ফিরে তাকায়নি।

পা দুটো টলছিল মণিকার, মাথার ভিতরটায় যেন এক লাখ ঝিঁ ঝিঁ পোকা বিরাট চীৎকার করছিল। কী দারুণভাবে তাকে রিক্ত করে দিয়ে গেল কিংশুক। কী বিরাট রকমের প্রতিশোধ নিয়ে গেল। কী শোচনীয় অক্ষমতা তার জীবনে, একথা একবারও যদি সে ভাবত তা হলেও কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যেত। আজ সে সেখানে গেলেও দাঁড়াত কি নিয়ে, কোন পরিচয়ে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে নতুন জীবনকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। সে না হয় গেল, কিন্তু ঘুমন্ত মিন্টু, বাবলু যদি জেগে ওঠে। এই নির্জন ঘরে কে সামলাবে ওদের। যদি এসে পড়ে গৌতম, যদি জানতে পারে ঘটনাটা কোন রকমে, তাহলে সে কীভাবে নেবে বিষয়টাকে। যদি ওর মনেও জেগে ওঠে সন্দেহ এবং সংশয়, যদি ভুল বোঝে, তাহলে যে আত্মরক্ষার আর কোন পথই খোলা থাকবে না। কিন্তু 'হাসি' — সেই হাসিকে কি সত্যিই ভুলতে পেরেছে মনিকা? চোখের সামনে ভেসে উঠল যন্ত্রণাকাতর একটি মুখ। চোখ দুটো জলে ভরে উঠল মণিকার। দশ বছর আগেকার সুন্দর অথচ ছোট একটি মুখ। যেন ফোটা একটি ফুল। অথচ কিংশুকের মত মনের কি তেজ। এখন সে নিশ্চয়ই বড় হয়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই বুঝতে শিখেছে সব কিছু। হয়ত জেনেও গেছে তার মায়ের পুরো ইতিহাসটা। আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে তার সম্পর্কে সকল

আগ্রহ। সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে কিংশুক।

বাতাস আরও জোরে বইতে শুরু করেছিল। বাইরের অন্ধকারটা মনে হচ্ছিল বড় ভয়ংকর। নিশ্চয়ই কিংশুক বেশি দূর যেতে পারেনি, অন্ধকারে এলোমেলো পথ হাঁটছে। হয়ত খুব দ্রুত। মনে করেছিল খোঁচা দিয়ে কিংশুকের দ্বিতীয় বারের সংসারের কথাটা জেনে নেবে। জেনে নেবে তার স্ত্রী হাসিকে ভালোবাসে কিনা। কিন্তু তাকে ভীষণ ভাবে আশ্চর্য করে দিয়ে গেল কিংশুক। আর সে সংসার পাতল না! আদালতে সেই তো প্রথম কেস দায়ের করেছিল। কেন সেদিন ক্ষমা করতে পারল না। ভালোবাসা কি এতই পাপ? কেন এত বেশি সন্দেহ করেছিল তাকে। স্বামী হিসেবে জোর করে কাছে টেনে নেওয়ার অধিকার ছিল তার। কিন্তু তা সে করেনি, সন্দেহ করেছিল। নতুন করে সংসার না পেতে এখনও এই কৃচ্ছ্র সাধনের অর্থ কি? সে তো তার মত নারী নয় যে অদৃষ্টের কাছে সহজে আত্ম সমর্পণ করবে। ও রকম স্বাধীনতা থাকলে তার জীবনে কি কোন রকমের বিপর্যয় ঘটত? নিশ্চয়ই কিংশুককে সে প্রতারিত করত না। প্রথম থেকেই গৌতমকে নিয়ে ঘর বাঁধত।

কিন্তু সে দিন তারা তা পারেনি। মনের আশাকে সফল করে তুলতে সেদিন কি চেষ্টাই না করেছে তারা। চাকরির জন্যে তখন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল গৌতম। শুধু একটা চাকরি, একমুঠো অন্নের সংস্থান হলেই ঘর বাঁধবে দুজনে। কতদিন পার্কের পড়ন্ত রোদ্দুরে ছাতিম গাছটার নির্জনতায় বসে যুক্তি করেছে। প্রতিদিন তারা দেখা করেছে পরস্পরের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে। সকল সমস্যাকে ছাপিয়ে অনাগত দিনগুলোর স্বপ্নে গভীর প্রসন্নতায় ভরে উঠত দুটি হৃদয়। একটার পর একটা করে ইন্টারভিউ দিয়েছে গৌতম, আর আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করার জন্য সান্ত্বনা দিয়েছে তাকে। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারেনি। দিনগুলো ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে গেছে পুরো একটা বছর। শেষের দিকটায় গৌতম যেন কেমন হয়ে গেল। কথা বলত কম, উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত দূরের শূন্য মাঠটার দিকে। তারপর কিছু না বলে হঠাৎ একদিন উধাও। কোথায় গেল তার কোন ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে গেল না। কি দারুণ তখনকার মানসিক অবস্থা। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা

করল গৌতম? মনকে কোন মতে শান্ত করতে পারছিল না। দুর্জয় অভিমান নিয়ে কতদিন গিয়েছে সেই ছাতিমতলার কাছে, কিন্তু দেখা পায়নি।

এরপর জীবনটাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাড়ির জিদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। বিয়ে হয়ে গেল কিংশুকের সঙ্গে। যে কোন নারীর শ্রদ্ধা আদায় করার মত অনেক কিছু ছিল কিংশুকের। সব সময়ে একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত আচারে ব্যবহারে। কোন কিছুর অভাব নেই, সুখী হবার মত সকল উপাদানই কিংশুকদের ছিল। দু'বছর বাদে কোল আলো করে এর 'হাসি'। একটা পরিপূর্ণ সুখী জীবন। কিন্তু তার উপর কিংশুকের অগাধ আস্থা মাঝে মাঝে জ্বালা ধরিয়ে দিত মনের ভিতর। কেন এত বেশি বিশ্বাস করে কিংশুক। যদি কোনদিন জানতে পারে গৌতমের সঙ্গে তার প্রথম জীবনের সম্পর্ক, তা হলে কি আর ভালোবাসবে, এই রকম মানসিক উদারতা দেখাবে। একটা অজানা ভয় চারদিক থেকে ঘিরে ধরে মানসিক শান্তিটাকে নষ্ট করে ফেলতো। কিংশুকের কাছে মানসিক দৈন্যকে চাপা দেওয়ার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছে।

ধীরে ধীরে অবস্থাটাকে অনেকখানি মানিয়ে নিতে পেরেছিল মনিকা। কিন্তু হঠাৎ একদিন গৌতম এল নিরুপদ্রব জীবনের বুকে ঝড় তুলে ধূমকেতুর মত। হাসি খেলতে চলে গিয়েছিল। কিংশুক তখন অফিসে। ঘরে একা, আবার কোনদিন গৌতম আসবে এ রকম চিন্তা কোনদিনও মনে আসেনি। ভয়, আনন্দ, বিস্ময়ের মিশ্রণে তখন সে কী মানসিক অবস্থা। প্রথম সম্ভাষণটুকুও করতে ভুলে গেল মনিকা। সে সবের প্রয়োজন মনে করেনি গৌতম। লেদার কেসটা মেঝের উপর রেখে বসে পড়ল চেয়ারের উপর। 'নাই তুমি বসতে বল আমি কিন্তু আর একটুও দাঁড়াতে পারছি না। সারা রাত ট্রেন জার্নি। বড় ক্লান্ত লাগছে।'

ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল মণিকা। না — বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, তবে খুব স্মার্ট।

'কি দেখছ অমন করে, অতিথি হয়ে এলাম, বসতে পর্যন্ত বললে না।' উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিল গৌতম।

বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল মনিকার। নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়ে মুখে হাসি এনে বলল — 'কোথা থেকে আসছ?'

'মৃত্যু থেকে জীবনে। সব কথাই বলব আগে এক কাপ চা খাওয়াও দিকি, ঝিমুনিটা কাটিয়ে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠি।'

সিঁথিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল গৌতম। নজর ফেরাল না।

মৃদু হেসে চায়ের সরঞ্জাম আনতে চলে গিয়েছিল মণিকা।

ঘরের ভিতরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে উঠেছিল, সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বেদনাগুলো বন্দি হয়ে মুক্তির আকুলতায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চেয়ারের উপর তেমনিভাবে বসেছিল গৌতম। হয়ত বা অতীতের পৃষ্ঠাগুলো উলটে পালটে দেখছিল এক এক করে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে চলল নির্বাসিত জীবনের কাহিনি — 'ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে সে সময়ে মনের যে কি অবস্থা সেটা তো তুমি জান। অনিশ্চিতের ঘরে ধরলাম শেষ দান। তোমাকে না জানিয়ে পালিয়ে গেলাম। জানিয়ে যাওয়ার উপায়ও ছিল না। কোথায় যাবো তাও জানতাম না। শেষে এক তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে এলাহাবাদে নামলাম। তাদের সঙ্গে দিন দুই বেশ কাটল। তারা এক ভোরে কিছু না জানিয়েই চলে গেল অন্য কোথাও। আবার আমি নিরাশ্রয়, টাকা নেই পয়সা নেই, পেটের জ্বালায় ঘুরতে লাগলাম পথে পথে। শেষে কাজ জোটালাম গুপ্তবাবুর ওখানে। চোরাই চালানের কাজ। নেপাল থেকে মাল আমদানি এবং রপ্তানি করা। প্রথমে মনে মনে ঘেন্না করলেও শেষের দিকটায় হয়ে উঠলাম একেবারে বেপরোয়া। তখন আর জীবনের উপর মমতা নেই। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। লাখ টাকার বামাল সমেত। পুলিশকে বাধা দেবার জন্য গুলি চালালাম। লাভ হতে পুলিশের গুলিতে পাটা জখম হ'ল। জেলে গেলাম। প্রমাণের অভাব হ'ল না। বিচারে সাত বছরের জেল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌতম।

'একটাও চিঠি দিলে না কেন?'

'কোন মুখে লিখব বলতে পার। জীবনটাকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে মনে করেছিলাম এইটাই আমার পক্ষে ভাল।' স্বরটা কেমন ভারী হয়ে উঠল গৌতমের।

ফ্যানটা মাথার উপরে বন বন করে ঘুরছিল। মনিকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনে। চোখের কোণে জলের ফোঁটা চিক্ চিক্ করছিল।

লেদার কেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আসি তা'হলে।'

'সে কি? কেন এলে তবে এখানে? একটা দিনও থাকবে না? রাত কাটাবে কোথায়?'

'হোটেলে।' নির্বিকার ভাবে কথাটা বলল গৌতম।

ঘড়ির কাঁটাটা টিক্ টিক্ শব্দে পাঁচটার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে এল পায়ের শব্দে। কিংশুক ফিরে এসেছিল অফিস থেকে। নিকট আত্মীয়ের পরিচয় পেয়ে সৌজন্য দেখানোর ত্রুটি করেনি কিংশুক। হোটেলে উঠতে দেয়নি গৌতমকে।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে কাজ পেয়েছিল গৌতম। প্রায়ই আসত বাড়িতে। কিংশুকের উদাসীনতা তাকে বেশি করে ঠেলে দিয়েছিল গৌতমের দিকে। অবশ্য কিংশুক এই মেলামেশাটাকে কোনদিন সন্দেহের চোখে দেখেনি। মনের পালে তখন নতুন করে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। গৌতম বাড়িতে এলেই কি অসম্ভব রকমের মানসিক তৃপ্তি। বাঁধন যখন আলগা হয়ে যায় তখন সতর্ক হওয়ার সুযোগটুকুও থাকে না। সেই দুপুরটাকে এখনও স্পষ্ট মনে আছে। প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছিল ঘরের ভিতরটা। স্পষ্ট জবাব দিহির জন্যে তখন একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে গৌতম।

'কি ঠিক করলে আজ আমাকে জানাতেই হবে।'

'বলছি তো আরও কয়েকটা দিন আমাকে অপেক্ষা করতে দাও।'

'কি পেলাম আমি বলতে পার? তুমি সব কিছু পেয়ে তৃপ্ত হতে পার কিন্তু আমি ....'

'তোমার বিবেকে বাধছে না? সংসারটাকে এমন করে ভেঙ্গে দিয়ে যাবে?'

'বিশ শতকের এই সমাজে বিবেকের আশা করবে আমাদের কাছ থেকে?' অত্যন্ত বিদ্রূপের সঙ্গে কথাটা বলল গৌতম।

মণিকার কেমন যেন সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। গৌতমকে এড়িয়ে যাওয়ার মত আর একটা কথাও যোগান দিতে পারছিল না। বর্তমানটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে অতীতের অনাস্বাদিত যৌবনের স্বপ্নগুলো ধেয়ে এল চারপাশ থেকে।

'বেশ আমি যাব, কিন্তু আমাকে নিয়ে উঠবে কোথায়?'

সাফল্যের আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠল গৌতমের মুখখানা। প্রবল উত্তেজনায় দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এঁকে দিল প্রথম চুম্বন।

'আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব অনেক দূরে।'

'না — তোমরা যাবে জাহান্নামে।' পাশ থেকে ধ্বনিত হল কিংশুকের বজ্রকণ্ঠ, গায়ে অফিসের পোষাক। কোন এক জরুরি প্রয়োজনে এসেছিল বাড়িতে। অপ্রত্যাশিত এ দৃশ্যে একেবারে হতবাক।

আলিঙ্গন মুক্ত করে নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল গৌতম।

অপরিসীম ঘৃণায় কিংশুক তাকাল। 'এতদূর এগিয়েছ তোমরা! বিশ্বাসঘাতক। তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। আর এক মুহূর্ত্তও তোমাদের এখানে স্থান নেই। দূর হয়ে যাও সামনে থেকে, বেইমানের দল ....। তোমাদের আমি গুলি করে মারব।'

রাগে থর থর করে কাঁপছিল কিংশুক। প্রতিটি কথা যেন তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বজ্রের মত। মণিকার দিকে তাকাল জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মত। 'না — তোমাকে আমি মারব না। তোমার মত জঘন্য মনোবৃত্তির জীবকে আমি স্ত্রী হিসাবে মানতে রাজি নই। তুমি ওর সঙ্গে যেতে পার।'

চিৎকার শুনে ভয়ে ছুটে এসেছিল হাসি। হাতটা ধরে টেনে নিল কিংশুক। 'যেও না মামণি ওই ডাইনিটার কাছে।'

অবুঝ শিশু হেসে উঠেছিল — 'তুমি যা তা বলছ বাপি, মামনি কখনো ডাইনি হয়?'

কি অদ্ভুত পরিবর্তন! হাসির মাথায় হাত দিয়ে আদর করল কিংশুক। 'তোমার যে মা সে অনেকদিন আগে মারা গেছে মামণি।'

আর তাকাল না ওদের দিকে। মেয়েকে নিয়ে চলে গেল বাইরে।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌতম। ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছিল মণিকা। এমন অসময়ে কিংশুক যে হঠাৎ অফিস থেকে বাড়িতে চলে আসবে এটা আদৌ অনুমান করতে পারেনি। আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না গৌতম। একটা কথাও বলল না। যেমন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি মাথা হেঁট করেই চলে গেল। একা দাঁড়িয়ে রইল মণিকা।

এর পর থেকে শুরু হয়েছিল কি নিদারুণ উপেক্ষা, অনাদর, প্রতিটি মুহূর্ত্ত কেটেছে ভয়ে। মেয়েটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল কাছ থেকে। সমস্ত দিনে রাতে সে কী নিঃসঙ্গ নির্বাসন। একটাও কথা নেই বার্তা নেই। মনের উপর প্রচণ্ড চাপ উন্মাদের মত করে তুলেছিল তাকে। সব কিছু সহ্য করেও হাসিকে পাওয়ার জন্য মনের ভিতরটা আকুলি বিকুলি করত।

অফিস থেকে ফিরে এসে হাসিকে নিয়ে খেলা করছিল কিংশুক। গ্যাস দেওয়া বেলুনগুলো শূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছিল দু'জনে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ওদের। উড়ন্ত বেলুনগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসছিল। মেয়ে কি শুধু ওর? মাথার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল। কেন সে হতে পারে না ঐ হাসির ভাগীদার? সে কি সত্যিই তার কেউ নয়? মেয়ের উপর অধিকার জানাতে ঘর ছেড়ে বাগানটার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল পায়ে পায়ে। 'হাসি ....!'

বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল কিংশুক। 'এখানে কেন?' চোখে সেই আগুন, সেই রকম ঘৃণা।

'কোন কথা শুনতে চাই না। হাসি আমার, ফিরিয়ে দাও আমাকে, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

উত্তর দিতে হ'ল না কিংশুককে। হাসি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল, 'বাপি গো, ডাইনি এসেছে।' ভীতি বিহ্বল চোখ দুটো আঙ্গুল তুলে বার বার দেখিয়ে

দিচ্ছিল মণিকাকেই।

অসহ্য — একেবারে অসহ্য। রাগে, লজ্জায়, ঘৃণায় মুখখানা লাল হয়ে উঠল মণিকার।'

'বেশ আজই চলে যাচ্ছি, মুক্তিই আমি নিলাম।'

'মুক্তি' হাসল কিংশুক, 'সে ব্যবস্থাটা আমি তাড়াতাড়ি করে দেব। শুভ বুদ্ধির জন্যে ধন্যবাদ। আসতে পার।'

চলে আসছিল মণিকা। পিছন থেকে ডাকল কিংশুক — 'শোন, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কোনদিন তুমি আর হাসির কাছে তোমার পরিচয় নিয়ে দাঁড়িও না।'

সেই দিনই ছেদ টানা হয়ে গিয়েছিল আট বছরের দাম্পত্য জীবনের! আশ্রয় নিয়েছিল গৌতমের কাছে। উভয় পক্ষই সম্মত হওয়ায় ডিভোর্স কেসটা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ছ'মাস। আদালতের রায়ে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত মেয়েকে কাছে রাখার অধিকার পেয়েছিল মনিকা। আইনের আশ্রয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে পারতো কিন্তু সাহস হয়নি। কিংশুকের গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাসছিল হাসি। একটি বারের জন্য ফিরেও তাকাল না তার দিকে। দূর হতে শুধু একটি বারের মত দেখে শূন্য অন্তরে একরাশ বেদনা বুকে নিয়ে ফিরে এসেছিল। বার বার চোখের জলে ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে হাসির কথা।

কিন্তু সত্যিই কি ভুলতে পেরেছে আজও সেই সুন্দর মুখখানা। ভুলে যেতে পেরেছে কি সেই চরম পরাজয়, অনাদর, উপেক্ষা, মাতৃত্বের নিদারুণ লজ্জা। এখনও অতীতের বুকে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় নিজের সেই আবেদন — 'হাসিকে দিয়ে দাও, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।' অতীতের সেই অপমানের সে প্রতিশোধ নিয়েছে। কিংশুকের সকল গর্ব ভেঙে খান্ খান্ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে ধূলার উপর। কিন্তু তবুও বুকের ভিতরটা এমন করে মোচড় দিয়ে উঠছে কেন?

প্রচণ্ড বেগে সোঁ ..... সোঁ শব্দে — ঝড় বইছিল। আবার আকাশটা

ডেকে উঠে ঘরের শার্সিগুলোকে কাঁপিয়ে দিল। কেঁপে উঠল ঘরের ভিতরটাও। বাবলু পাশ ফিরে শুল। মিন্টু তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার চিন্তার মাঝে ডুবে গেল মণিকা। কিছু ভাল লাগছিল না। বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। জানালার একটা দিক খুলে দিল। উঃ কি ভীষণ অন্ধকার! কিংশুক বাড়ি ফিরবে কি করে। এখনও মনে হয় ক্যানাল ব্রীজটা পেরিয়ে যেতে পারেনি। নিজের মনেই হাসল মণিকা। আজ কেমন শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছ কিংশুক। তুমিও সমান শাস্তি ভোগ কর। আমি এত সহজে ভুলে যাব না সেদিনের অপমান। না - না, আমি আর কোনদিনও যাব না তোমার ওখানে, একটি বারের জন্যও না।

গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল হাতের উপর পড়তেই চমকে উঠল মণিকা। একি! সে কাঁদছে কেন? মানস চক্ষে দেখতে পেল অসহ্য যন্ত্রণায় এখনও তাকিয়ে আছে মার আসার অপেক্ষায়, নার্সটা কেমন অসাবধানে ঝুলে পড়া হাতটাকে সরিয়ে দিল। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে হাসি। নার্সকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল মণিকা, 'না - না, আমি এসে গেছি, তুমি ওকে আর ছুঁতে পারবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাও বলছি।' এ কি! কোথায় সে! নিজের ঘরে কাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল অমন করে! কেউ তো নেই! মিন্টু, বাবলু ঠাণ্ডার আমেজ পেয়ে কেমন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

সারা আকাশটা সার্চ লাইটের মত আলো ফেলে আবার ঝিকমিকিয়ে উঠল। কিংশুক এতক্ষণে বোধ হয় খুব জোরে হাঁটছে। কী তেজি মানুষ, কেমন ভিখিরির মত এসেছিল আজ। সে না হয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু সব মেয়েই কি তাই করে? স্বচ্ছন্দে সে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করতে পারত। এমন নিঃসঙ্গতার জীবন বেছে নিল কেন? এখনও দূর থেকে কী ভীষণ শাস্তি দিচ্ছে কিংশুক। হানা দিচ্ছে তার গড়ে ওঠা সুখের দরজায়। আজ সে অপরের স্ত্রী জেনেও কেন এল তার কাছে? কোন দাবিতে, কোন অধিকারে? ভেসে উঠল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিংশুকের ছবিটা। কেমন রোগা, রুক্ষ চুল, পিঠের দিকটা একটু বেঁকে গিয়ে কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে। বোধ হয় আজও কিংশুক ভুলতে পারেনি তাকে। এমন অনাদর করে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে সে ঠিক করেনি।

আজ কোন অধিকার না থাকলেও সে যাবে। একটিবারের জন্যও সে হাসির পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। হয়ত সে মনে এখনও আঁকা আছে মায়ের পবিত্র চিহ্ন। তাকে সে অশ্রদ্ধা করতে পারে না। হাসিকে কোলে নেবার এই তো সময়।

গোটা জানালাটা খুলে দিয়ে আরও ভাল করে দেখতে চাইল আকাশটাকে। এক ঝাঁক বৃষ্টি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের উপর। তবুও তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। সোঁ ...... সোঁ ...... ঝম্ ...... ঝম্ শব্দ। প্রবল ঝড়, দারুণ বৃষ্টি। জানালা বন্ধ করে দিল মণিকা।

এ ঝড় থামবে না। একবার আমাকে যেতেই হবে। দরজার দিকে পা বাড়াল। বাইরে থেকে ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠল মণিকা। আবার এসেছে কিংশুক!

'কে?'

'এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না। আমি ....। তাড়াতাড়ি দরজা খোল।

যন্ত্রচালিতের মত দরজাটা খুলে দিল মণিকা। ঘরের মধ্যে ঢুকল গৌতম।

'বাঁচলাম বাবা, আকাশ যা বেহিসেবি না, দ্যাখ দেখি অবেলায় কেমন মাতামাতি শুরু করেছে।'

জামাকাপড় ছাড়তে গিয়ে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল গৌতম।

'তোমার চোখে জল কেন? কাঁদছিলে বলে মনে হচ্ছে। শরীর খারাপ নাকি?'

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখটা মুছে ফেলল মণিকা। ম্লান হাসল স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে, 'দরজা খুলবার সময় মনে হয় ঝাপটা এসে লেগেছে মুখে।'

'তাই ভাল অসুখ করেনি জেনে আশ্বস্ত হলাম।'

'অসুখ করবে কেন।' কেন জানি না কিছুই যেন ভাল লাগছে না। পিছন ফিরে উত্তর দিল মণিকা।

চোখের জল ফেলার অধিকার টুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। চরম রিক্তার মত দাঁড়িয়ে রইল গৌতমকে তেমনি পিছন করে। চোখের সামনে

ভাসতে লাগল হাসির করুণ মুখখানা। এখনও মা মা শব্দে শেষবারের মত তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

বাইরে সোঁ .... সোঁ .... ঝম্ .... ঝম্ শব্দ। বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে ঝড় আছড়ে পড়ছিল রাতের চত্বরে। জগতে কেউ জানল না অন্য এক ঝড়বৃষ্টি কেমন করে ছুঁয়ে যাচ্ছে মণিকাকে।

আমরা বাঁচতে চাই

গাছের পাতার উপর খেলা করছে বিকালের সোনাঝরা রোদ্দুর। রাস্তার দুপাশে আকাশমণি গাছের সারি। মাত্র বিশ বছর আগে বনসৃজন প্রকল্প কার্যকরী করতে ঐ সব গাছ লাগানো হয়েছিল। এই ক'বছরেই ওরা পৌঁছে গিয়েছে যৌবনে। এখন ওদের দৃষ্টিনন্দন রূপ। দেবজ্যোতিবাবু ইজিচেয়ারে বসে একাকীত্ব ঘোচাতে দূর বিস্তৃত প্রকৃতিকে আপন মনে দেখছিলেন। জানালার ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছ নীলাকাশ, অতি প্রশস্ত জাতীয় সড়ক এবং ঐ গাছের সারি আপন আত্মীয়ের মত ধরা পড়ছিল মনের ক্যানভাসে। সময়ে সময়ে আশ্চর্য উদাসীনতার মাঝে, পৃথিবীর দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের মাঝে, সব কিছুর ধ্বংসের মাঝে একটা ছন্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন।

ভাবছিলেন জন্মমৃত্যুর আসল ছবিটা ঐ মহাকাশের মত শুধুই অন্ধকারে ভরা। জন্মক্ষণের স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে না জানলেও জীবিত থেকেও মৃত্যুর প্রায় আশি ভাগ স্বরূপ জেনেছিলেন জীবনের একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যখন রিক্‌শার ধাক্কায় পথের উপর পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ফেটে গিয়েছিল তখন চোখের সামনে নেমে এসেছিল গাঢ় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে খেলা করছিল লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের অসংখ্য গোলাকৃতি

আলো। সে সময় ধর্ম, ঈশ্বর, পাশে বসে থাকা স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন বা কোন প্রিয়জনের কোন কথা একবারও মনে পড়েনি। শুধু মনে হচ্ছিল অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে তিনি এক অন্ধকার মহাসমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছেন। আজ মনে হয় মুক্তির অপর নাম মৃত্যু। কোন বন্ধন তখন আর থাকে না। ধর্মে যে সব দেবদর্শনের কথা বলা হয় ওগুলো সূক্ষ্ম স্নায়বিক আলোক সন্নিবেশে চিন্তার রূপ অনুযায়ী প্রতিরূপ তৈরি করে, এর বেশি কিছু নয়। ধর্ম আপন মাহাত্ম্য সৃষ্টির জন্য এবং জন মানসে প্রভাব বিস্তার করার জন্য অতিপ্রাকৃত ঘটনা, রহস্যময়তা এবং অযাচিত মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ধর্মের মার্জিত ব্যবহারিক রূপ সমাজের কল্যাণ করে কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র যখন তীব্র অহংকারের জন্ম দেয় তখন প্রবল উন্মাদনায় মানব দানবে পরিণত হয়।

নানা বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন দেবজ্যোতিবাবু। আর মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিলেন গাছের হলুদ বরণ পাতাগুলোর দিকে। দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে পড়ছিলেন। স্ত্রী চা দিতে এলে বললেন, "দ্যাখো, দ্যাখো ঐ হলুদ বরণ পাতাগুলো আজ না হয় কাল ঝরে পড়বে। তারপর ওরা পচে গিয়ে আবার মাটিতে রূপান্তরিত হবে। মনে হয় এরই মাঝে নিহিত আছে সৃষ্টিতত্ত্ব।"

স্বামীর কথায় হাসলেন দীপশিখা দেবী। "তোমার মত দার্শনিক চিন্তা আমার মাথার ভিতর নেই। আমার গুরুদেব হচ্ছেন ঐ সূর্য। উনি যেমন প্রতিদিন ওনার কাজ সেরে পাহাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন, আমিও তোমাদের সেবা করে তেমনিভাবে ঘুমাই। মৃত্যু নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন বোধ করি না, যখন সে আসবে তখন কি আমি তাকে প্রতিরোধ করতে পারবো?"

স্ত্রীকে বোঝাতে গিয়ে দেবজ্যোতিবাবু কিছুটা বাস্তবতার আশ্রয় নিলেন, "তোমার বাবা মা গত হবার পর তুমি তাঁদের জন্য আজও আগের মত ভাবো কি? প্রথম প্রথম চোখের জল ফেলতে, ধীরে ধীরে সে শোকের বেগ কম হল। তারপর ভুলে গেলে। শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে তোমার নাতি নাতনি। আমি কিন্তু এটাকে ভুলে যাওয়া বলবো। এ ঠিক হলুদ পাতাগুলো ঝরে যাওয়ার মত। নতুন কিছু আসছে পুরানোদের বিদায় জানাতে। এমনি করেই আমরা

সেই চিরন্তন ছন্দের অনুবর্তী হচ্ছি।"

"তোমার ঐ প্রফেসারি কথাবার্তা শুনে কিছু লাভ হবে কি? দুঃখ ভুলে যদি আনন্দটাকে নিতে না পারি তাহলে বাঁচার প্রয়োজনটা শেষ হয়ে যায়।"

ইতিমধ্যে দেবজ্যোতিবাবু চা খাওয়া শেষ করেছিলেন। শূন্য কাপ প্লেট হাতে তুলে নিয়ে দীপশিখা দেবী হাসতে হাসতে বললেন, "সময়ে চা না পেলে বাবুর ঐ সব চিন্তাগুলো নিশ্চয়ই নির্বাসনে যেত।"

"কথাটা খুবই সত্য। জৈবিক জীবনটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা এ সব তো থাকবেই। সৃষ্টি চরাচরে মানুষের মনটাই হচ্ছে রত্ন খনি। অন্য কোন প্রাণির এটা নেই। এর থেকেই এসেছে সৌন্দর্যবোধ। সেই সুন্দরকে চিনতে বা জানতে না পারলে জীবন সাধনা কখনই পূর্ণ হতে পারে না।"

এবার দেবজ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর কিছুটা ভারী হয়ে উঠল, "আমাদের সময় তো ফুরিয়ে গেছে। তুমি আমি অজানা সেই মৃত্যুর অপেক্ষায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক এলেই চলে যেতে হবে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের আগে দুঃখের বোঝাটা নামিয়ে রাখতে একটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে, সেই জন্যই ভাবি।"

হয়ত কিছু বলার ছিল, কিন্তু বলা হ'ল না। বৌমার ডাক শুনে দীপাশিখা দেবী চলে গেলেন।

আবার আপন চিন্তার মাঝে হারিয়ে গেলেন দেবজ্যোতিবাবু। আকাশমণি গাছের বিবর্ণ পাতাগুলোর সঙ্গে আপন জীবনের দারুণ মিল খুঁজে পেলেন। সবুজ পাতার কোলে থোকা থোকা ফুল। বাতাসে হেলছে দুলছে। মনে হ'ল গোটা দৃশ্যটাই আপেক্ষিক, গোপনে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর চিরন্তন প্রাণ প্রবাহ।

কিছুক্ষণ বাদে স্বামীর কাছে ফিরে এলেন দীপশিখা দেবী। দেখলেন দেব্যজ্যোতিবাবু তখনও গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। গাছের সারির দিকে প্রসারিত দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ। এ দৃশ্য দেখে একটু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন দীপশিখা দেবী, "তোমার কী হল বলো তো? রিটায়ার্ড লাইফে আবার কোন থিসিস লিখবে নাকি?"

উত্তেজিত হলেন না দেবজ্যোতিবাবু, শুধু হাসলেন। "ভাবতে ভাল লাগে তাই ভাবি, আমি তো সংসারের কাউকে এজন্য ডিসটার্ব করছি না।" হঠাৎ আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন, যেন অমূল্য কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন এমনি একটা ভাব। "জানো দীপা আমাদের পৃথিবীটা সুন্দর এবং কল্যাণমুখর করে তোলার প্রধান হাতিয়ার হল ধর্ম। কারণ ধর্মই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভালোবাসা জাগায়।"

"আমি বলি ধর্মকে না এনে অন্য ভাবেও কাজটা করা যায়। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। রাজনৈতিক দলগুলো উলঙ্গ তোষণ নীতি অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার তালে কাজ করে চলেছে। ধর্ম এবং রাজনীতি কোনদিন মানুষকে ভালো হতে দেবে না।"

"তুমি যে কথাগুলো বলছো ওগুলো বুদ্ধিমান মানুষের কারসাজি। ধর্মের নামে গোঁড়ামি বা অন্ধত্ব ঘুচাতে পারলে এই দুর্বৃত্তগিরি বন্ধ হয়ে যাবে, আসবে চেতনার মুক্তি। তখন ধর্ম কেবলমাত্র প্রথা বা সামাজিকতার মধ্যে বদ্ধ থাকবে না।"

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন দীপশিখা দেবী। বললেন, "সে না হয় মানলাম কিন্তু আত্মা, পরলোক এসব সত্যিকারের আছে কি? থাকলেও বাস্তব প্রমাণের অভাবে যুক্তিবাদীরা আজকাল এ সব স্বীকার করছেন না।"

"নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। সত্যি না হলে শাস্ত্রে এ সব কথা থাকবে কেন? আমি নচিকেতার মত হলে যমপুরী থেকে ফিরে এসে নিহিলিষ্টদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম।"

"আচ্ছা, তুমি তো শ্রীঅরবিন্দ দর্শন পড়েছ। উনি কি বলেন?"

এ প্রশ্নে খুবই আনন্দিত হলেন দেবজ্যোতিবাবু। "শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভগবান তাঁর সৃষ্টি নিয়ে নিরন্তর খেলা করে চলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সৃষ্টিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবেন। যেমন তিনি কাদা দিয়ে একটা পুতুল তৈরি করলেন। মনোমত হল না বলে ভেঙে ফেললেন। আবার নতুন করে গড়লেন। এইভাবে গড়ার নাম সৃষ্টি, ভাঙার নাম মৃত্যু। প্রতিক্ষেত্রে পুতুল তৈরির উপাদানগুলি অক্ষত থেকে যাচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা এইভাবে সৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে

চলেছেন। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মানব মনে জাগিয়ে তুলছেন অতিমানস চেতনা।”

নিজস্ব চিন্তাগুলো বোঝাতে গিয়ে দীপশিখা দেবী বললেন, “শ্রীঅরবিন্দ দর্শন আমি মানি। জন্ম আছে, জীবন আছে, এটা যেমন সত্য, মরণও সমানভাবে সত্য। রূপান্তর মানেই নবজন্ম।”

“তুমি তো ভালোই বুঝেছ দেখছি। দুঃখ কোথায় জানো, কোনো কোনো ধর্ম কোনো কোনো নির্দেশকে ঈশ্বরের নাম দিয়ে অভ্রান্ত বলে চালায়। এক্ষেত্রে মানুষের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। ভক্তজন অন্ধভাবে চললে মানব সমাজে এর সুফল এবং কুফল অবশ্যই ফলবে। ধর্মের অন্ধকার দূর করার জন্য চাই সংস্কারমুক্ত মন।”

কথার ফাঁকে দেবজ্যোতিবাবু বাইরের গাছগুলোর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। দেখলেন প্রবল বাতাসে বেশ কিছু হলুদ বরণ পাতা ঝরে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে উঠলেন। স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, “ধরো আমি নেই, তখন পৃথিবীটা কেমন হবে?”

হাসলেন দীপশিখা দেবী। “অকারণে মনটা ভারী করছ কেন। তুমি আমি মারা গেলে পৃথিবীর কিছুই হবে না, এমন কি রাজা বাদশা মারা গেলেও না। সে তার আপন গতিতেই চলবে। বিশাল পৃথিবীর কাছে মহাকালের নিরিখে তুমি আমি এতই ছোট যে আমাদের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কোন মূল্যই নেই।”

দেবজ্যোতি বাবুর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্ত্রীকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, “জীবনের গোধূলিতে মানুষের মনে এ ভাবনা আসে। তার আগে নিজস্ব অহংকারে সে মোহাচ্ছন্ন থাকে। অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা হিসাবে আমরা জীবনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলাম। অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা তা পেয়েছিলাম। পরবর্তী জীবনে এ পাওয়ার গুরুত্বও ফিকে হয়ে গেল। সব কিছু হারাতে হারাতে শেষ পর্যায়ে আমরা এখন দিশাহারা।”

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা চলছিল অলসমন্থর গতিতে। এমন সময় উভয়েরই নজরে পড়ল একটি ট্রাকের উপর সুসজ্জিত শবযাত্রার দৃশ্য। চলেছে শ্মশানের দিকে। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে দেবজ্যোতিবাবু বললেন, “দ্যাখো, আর

মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই ঐ মানুষটার জাগতিক সমস্ত চিহ্ন মুছে যাবে। অথচ যখন বেঁচে ছিল তখন আমাদেরই মত পৃথিবীর হাসিকান্নার হাটে কত না বিকিকিনি করেছে।"

উচ্চ শিক্ষিত এই দুই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার প্রতিদিনের জীবনটাই ছিল গৃহকোণে সীমাবদ্ধ। নানারকম আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে সময় কাটত। শবযাত্রার দৃশ্যটি দু'জনার মনকে ভালোভাবে নাড়া দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি জীবনে শান্তি পেয়েছ?"

"আমাকে এ প্রশ্ন কেন, আমার হয়ে তুমি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার। মন ভারমুক্ত হলে এ জিনিস আপনি মেলে।"

"আমার মন বলে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করতে না পারলে মন ভারমুক্ত হয় না। সমস্ত মানুষের জন্য সত্যিকারের কিছু করতে হবে। তবেই শান্তি মিলবে। মরণ তখন বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে মনটাকে কোন মতে কাবু করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে জীবন কোন প্রতিদান আশা করে না, মানুষকে ভালোবেসে নিজেকে ধন্য মনে করে।"

দীপাশিখা দেবী বললেন, "আমি তোমাকে জীবন থেকে তুলে আনা এক কাহিনি শোনাতে পারি। কলেজের কাজে একবার বাগনান হাওড়া স্পেশাল ট্রেনে উঠেছিলাম। এক ভদ্রলোক পাশের সহযাত্রীর কাছে বেশ আনন্দ এবং গর্বের সঙ্গে জীবনের সাফল্যের অঙ্কটা মেলে ধরছিলেন। বললেন, 'আমার বড় ছেলে এবং বড় বৌমা বিলেত ফেরত ডাক্তার। ছোট ছেলে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়র, আমেরিকায় পি.এইচ.ডি. করছে। মেয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। মাটির বাড়ি ভেঙে চারতলা বিলডিং করেছি। কলকাতাওে বাড়ি কিনব। দু'খানা মারুতি আছে। একটা লোক জীবনে এর চেয়ে বেশি কি আর করতে পারে।'

পাশের অন্য এক ভদ্রলোক ওনার কথাবার্তা বেশ আগ্রহ সহকারে শুনছিলেন, এবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি দেশের মানুষের জন্য কিছু করেছেন কি?'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'দেশের মানুষের কাছে আমি

দায়বদ্ধ নই, আমি কিছু করতে যাবো কেন?'

'তাহলে তো মশাই জীবনে কিছুই করেন নি দেখছি। সামান্য একটা জীবজন্তুও তার সন্তানের জন্য অনেক কিছু করে থাকে।'

ভদ্রলোক একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। যাত্রীরা নীরবতা ভেঙে এ হেন জবাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমালোচককে সমর্থন জানালেন।"

দেবজ্যোতিবাবু কাহিনি শুনে অনেকখানি মানসিক শক্তি ফিরে পেলেন। "হাঁ, আমিও বলি সবার জন্য ত্যাগ চাই। আমার আমিটা তখন মুছে যায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। তখন সে সেবা পরায়ণ হয়ে উঠে। সেবার ভিতর দিয়ে জীবন সার্থকতার পথ খুঁজে পায়।"

দীপশিখা দেবী এবার অন্যকথায় এলেন, "আচ্ছা, মানুষ এত দুঃখ পায় কেন?"

"আমাদের এই পৃথিবীটা আলো আঁধারে ভরা। এখানে সুখ-দুঃখ তো থাকবেই। জয় থাকলে যেমন পরাজয় থাকে ঠিক তেমনি এ সব থাকবে। আলো ঘিরে যেমন ছায়া থাকে তেমনি করেই সুখ-দুঃখ একই অঙ্গে বর্তমান। আমরা চাহিদার অঙ্কটাকে যদি সীমিত রাখতে না পারি তাহলে দুঃখের পাল্লাটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠবেই।"

দীপশিখা দেবী এর সঙ্গে যুক্ত করলেন কিছু নিজস্ব চিন্তা, "এখন শুধু নেই নেই রব। আরও চাই, আরও চাই বলে মানুষ ছুটছে। শেষ পর্যন্ত একরাশ ব্যর্থতা নিয়ে ঘরে ফিরছে। চাওয়ার জগতটাকে সীমিত রাখতে পারে না বলেই দুঃখ তার ছায়াসঙ্গী।"

গোধূলির আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল। সন্ধ্যা নামার আগেই শ্রাবণের ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। মেঘ গর্জনে কেঁপে উঠল পৃথিবী। দেবজ্যোতিবাবু বললেন, "এটা পৃথিবীর আর এক রূপ। নিদাঘের সমস্ত দহনচিহ্ন মুছে ফেলে প্রাণের বাণী নিয়ে ফিরে এসেছে মেঘদূত। এ রূপ শতবার দেখেও যেন আশ মেটে না।"

রিম ঝিম বৃষ্টির গানে দু'জনেই নষ্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হলেন।

কৈশোরে গ্রাম্য জীবনের স্মৃতি ঘিরে দু'জনায় এঁকে চললেন একের পর এক ছবি। এ যেন জীবনকে নতুন করে পাওয়া। মন নামক বস্তুটি জীবনের মূল্যবান কোন কিছুকেই হারাতে চায় না।

কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর আকাশে আলোর দীপ মেলে ধরল শ্রাবণী পূর্ণিমার চাঁদ। বর্ষণ স্নাত পৃথিবীর সে রূপের কোন তুলনাই মেলে না। দেবজ্যোতিবাবু উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন এ রূপ দেখে। "জানো দীপা, মনে হয় দেবলোকও আমাদের এই পৃথিবীর মত এত সুন্দর নয়। এ পৃথিবীকে অনন্তকাল ধরে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।"

দীপশিখা দেবী বললেন, "তবুও মরণ অতর্কিতে হানা দিয়ে আমাদের জীবনটা ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত। এ এক মস্ত ট্রাজেডি।"

"আমি এখন আর ও সব কথা ভাবতে পারছি না। বরং আমি আছি এটাই সত্য। আমি দু'চোখ ভরে আমার ভালোবাসার পৃথিবীটাকে দেখতে চাই।"

আকস্মিক সমস্ত আলো নিভে গেল। কিছুক্ষণের জন্য কান্নার মত রব উঠেই মিলিয়ে গেল। কোন কিছু জানবার বা ভাববার আগেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল ছ'জন দুষ্কৃতী তাঁদের ঘিরে ধরেছে। অত্যন্ত দ্রুততায় দু'জনেরই কপালে ঠেকিয়ে ধরেছে লোডেড পিস্তল। "একটুও চেঁচামেচি করবেন না। কেউ আসবে না আপনাদের বাঁচাতে, সবাই যে যার ঘরে বন্দি। যদি বাঁচতে চান তাহলে ভালোয় ভালোয় আমাদের সব কিছু দিয়ে দিন, নচেৎ জীবনের ইতি টেনে দেব।"

টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবির গোছাটা বের করে ওদের হাতে তুলে দিলেন, 'নাও, তোমরা আমার যথা সর্বস্ব নিয়ে যাও, শুধু আমাদের প্রাণে মেরো না। আমাদের বাঁচতে দাও, আমরা বাঁচতে চাই।"

দীপশিখা দেবীও আর্তকণ্ঠে সেই একই মিনতি জানালেন।

চক্রব্যূহ

দগ্‌দগে দুপুর। বটের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল হাসেনা। পাশে গোবরের ঝোড়া। ছাড়ান দেওয়া গোরুগুলোর পিছনে তখনও ঘুরছিল নসু। যদি আরও কিছু গোবর কুড়িয়ে পায়।

মাত্র দশ বছরের ছেলে। পড়াশোনা ছেড়ে এরই মাঝে মার সুখ দুঃখের সাথী। কিন্তু এই রোদের কষ্ট সহ্য করা বড়ই কঠিন। স্থির থাকতে না পেরে নসুকে হাসেনা ডাকল, "পালিয়ে আয় নসু, কড়াপানাঁ রোদে ভিরমি যাবি শেষে।"

মায়ের ডাকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। তারপরই হারিয়ে গেল শীলাবতীর তীর বরাবর কুশপাতা অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে, লক্ষ্য নদীতীরের গরুগুলো।

ছেলে কথা না শোনায় রেগে গিয়ে আপন মনেই বকতে লাগল হাসেনা। "কি দজ্জাল ছেলে রে বাবা। কোন মতেই শুনল না মোর কথা।

মরুক না এবার, মোর হাড়মাস জ্বাইলে খেল। একেবারে বাপের মত গোঁয়ার।"

মাঠের মাঝ বরাবর সিঁথির মত সরু রাস্তাটা চলে গেছে বাজারের দিকে। রূপনারায়ণের টাটকা ইলিশ কিনে ফিরে আসছিল খুরসেদ মিয়া। হাসেনাকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, "শুকনো মাঠের পানে তাকিয়ে মন্তর আওড়াচ্ছ নাকি বিবি? ওতে কি তেয়াস মেটে।"

"মুয়ে আগুন, কথার ছিরি দ্যাখো না।" কথাগুলো খুব আস্তে বলল হাসেনা, যাতে খুরসেদ মিয়া শুনতে না পায়।

কালো দাড়ির ভিতর থেকে হাসিটা আরও বুনো হয়ে উঠল খুরসেদ মিয়ার। "পুরুষ না ঘরে থাকলে মন ভাল থাকে। তা, ওকি আর ফিরবে?"

কেমন যেন উদাস হয়ে উঠল হাসেনা। অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "সবই নসিব মিয়া। কোথা দিয়ে কেটে গেল চার চারটে বছর। সামনের ঈদ পরবের আগে কি আর ফিরবে। ছেলেপিলে নিয়ে মুই শুধু জ্বলে মরছি।"

"আরে দূর দূর, তুমি বলে এখনও ওর কথা ভাব। ওর আক্কেল বলতে কিছু আছে নাকি? শুধু ডাকাতি আর ডাকাতি, কেন বাবু সংসার পেতেছিলি। মুসলমানের ঘরে কোন মেয়ে এমন করে ঘর করে। এ রকম হলে চার বছর তো দূরের কথা, দু চার মাসও কেউ অপেক্ষায় থাকত না, এ মুই কসম খেয়ে বলতে পারি। যে কোন মেয়ের এমন রূপ যৌবন থাকলে আবার কাজ করে ফেলত।"

কথাগুলো মিথ্যা নয়, প্রতিবাদ করতে পারে না হাসেনা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।

জুল জুল চোখে হাসেনার দিকে তাকায় খুরসেদ মিয়া। হাসে, অর্থপূর্ণ হাসি। এ হাসির অর্থ বোঝে হাসেনা, রাগলেও বুঝতে দেয় না। সামলে নেয় নিজেকে, কারণ তারা গরিব। হাসতে হাসতে বলে, "ঘর যাও মিয়া, মাছ পচলে দু বিবি মিলে তোমায় ধরে ঠ্যাঙাবে।"

"পচুক না, ক্ষতি কি, আবার দু'টো নিয়ে আসবো। এটা নেবে নাকি?" হাসতে হাসতে ইলিশটা এগিয়ে দেয়।

তাড়াতাড়ি পিছু হটে যায় হাসেনা। "সাবধান মিয়া, লোভ দেখাতে এসো না। এ গোবর কুড়োনি সিদ্দিকী সেখের বিবি। জিন্দেগি বরবাদ করলেও কোনদিন আমাকে পাবে না।"

"এত দেমাক!" খুরসেদ মিয়া বাঁকা হাসি হাসল, "আচ্ছা দেখা যাবে।"

রাগে ফেটে পড়ে হাসেনা, "আরও এগোলে কিন্তু খারাবি হবে। দেখছো সামনে ঐ গোবরের ঝোড়া। এক্ষুনি গোবর দিয়ে মুখখানা লেপে দেব।"

বদলা নেয় মিয়া, "এমন জাঁহাবাজ মাগী না হলে ডাকাতের বউ হয়। ভাঙবে তবু মচকাবে না। ইজ্জতের বড়াই মারাচ্ছে, তবু যদি না সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরত। রেতের খবরও মোর অজানা নয়।"

এবার সত্য সত্যই একদলা গোবর তুলে নেয় হাসেনা। এমনই ভাব দেখাল যেন এখনই ছুঁড়ে মারবে মুখে। "যে শয়তানের বাচ্ছা অমন কথা বলে তাকে মুই ছাড়ব না।"

"বড়াই যে খুব, শেষে মিসকিনদের মত একদিন বাকসী হাটে বিকোবে বিবি। আর ঐ সিদ্দিকি ডাকাতের জানটা একদিন কয়েদ ঘরেই খতম হয়ে যাবে।" বেশ ভারিক্কি চালে কথাগুলো বলে খুরসেদ মিয়া। আর দাঁড়ায় না। সামনের পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

লজ্জা এবং অপমানে ভেঙে পড়ে হাসেনা। ধোঁয়াটে মাঠটার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। ঘরের মানুষটার বাজে কাজের জন্য বাইরের মানুষ অপমান করতে সাহস পায়। না, পোড়া নসিবে আরও কত দুঃখ আছে কে জানে। ওর নামে কেস তো দু একটা নয়, একগাদা। একটা ফয়সালা হলেই আবার একটা কেস উঠবে, আবার লটকে দেবে। কিন্তু এমনই মানুষ ওসবের পরোয়াই করে না। জেল থেকে ফিরে এলে চার ছ'দিন এলাহি কারবার, দুদিনের আমির, তারপর দুনিয়ার ফকির, তবু কি শুনবে একটা কথাও। সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাতের বেলা হারিয়ে যাবে বুনো নেকড়ের মত। কি যে নেশা আল্লাই জানে, মেহনত করে কত জনের সংসার চলছে, আমাদের চলবে না কেন?

যতই বল না কেন, হাসতে হাসতে সব প্রতিবাদ মুছে ফেলে সিদ্দিকি। বলে, "ও মোর রক্তের দোষ বিবি, তুই দূষলেই কি শুধরে যাব। মোদের চার পুরুষ ধরে ঐ ব্যবসা চলে আসছে, এখন মুই কি রাতারাতি পীর বনে যেতে পারি।"

শেষ আঘাত হানতে ছাড়ে না হাসেনা, "মোর মাথার কিরা, আর যেও না অমন খারাবি করতে।"

মুখটা চেপে ধরে সিদ্দিকি, "কসম খাওয়াস নি বিবি, বুকের আশমানে তুই মোর রমজানের চাঁদ। অমন করে দাগা মারিস্ না মনটার ভিতর। কুত্তার মত বেঁচে থেকে বেহস্তে গেলেও এঁটোপাতা খুঁজতে হবে। খারাবিটা মুই করি, না মোদের যারা লুটে খায় তারা করে?"

"মনে মনে কাজির বিচার করে বসে আছ দেখছি, তুমি যে মহাপুরুষ, তুমি কি কখন খারাবি করতে পার।" মৃদু ভৎসনা প্রকাশ পায় হাসেনার কথায়।

"হায় আল্লা, বিসমিল্লায় গলদ। আচ্ছা বল্ দিকিন, দশটাকা হাওলাত করলে তিন মাসে যারা তিরিশ টাকা নেয় তারা কি শয়তান নয়। মোরা ওদেরই টাকা লুটি। মজা কি জানিস্ কাঁনদে কাঁনদে ওরা মোদের টাকাগুলো মোদেরই হাতে ফিরিয়ে দেয়।"

এ ভাবে টাকা ধার নেওয়ার সঙ্গে অপরিচিত নয় হাসেনা। তাই যুক্তি খাড়া করতে পারে না। হার মানতে হয়। 'যা খুশি তাই করো, কিন্তু পুলিশের লোকে বেঁধে নে গেলে বেজায় সরম লাগে মোর।'

"আরে ধ্যেৎ, রেখে দে শালার পুলিশ। ও শুয়োরের বাচ্চাদের আমি কি রেয়াত করি। তাহলে যে মোর জাত যাবে। বেঁধে নে যায় লোক দেখানো, কিন্তু খুব পেয়ার করে মাইরি। থানায় ঢুকলেই দেখতে পেতিস্।"

"হায় আল্লা, তোবা তোবা, মোরে বলো থানায় যেতে।" ঘেন্নায় থুতু ফেলে হাসেনা।

"দূর, কথাটা তুই অমন করে নিচ্ছিস কেন?" হাসেনার রকম সকম দেখে হাসে সিদ্দিকি।

"মুই বুঝিনি যেন, ঠ্যাঙায় তবে কাদের?"

"বলেছিস্ ঠিক, নতুন লোককে ঠ্যাঙায় প্রথম প্রথম। তারপর কনট্যাকটা হয়ে গেলে পেয়ার করবে সব্বাই। বড় বাবু থেকে সেপাই পর্যন্ত। মিষ্টি থেকে চা, পান, সিগ্রেট সবকিছু, মোট কথা ঢালাও। ওরাই এনে দেবে।"

"হাঁ, পেয়ার করবে না, কয়েদ ঘরে এবার থেকে বিবি এনে দেবে।" স্বামীর সঙ্গে দুষ্টুমি করে হাসেনা।

"তামাশা নয়, মাইরি বলছি, তোয়াজ ওরা করবেই। ভুল করে কেউ একবার দলে ভিড়ে গেলে ওরাই তাকে পাকাপোক্ত ডাকাত বানিয়ে ছেড়ে দেবে। এতে মজা আছে রে, বিনি খাটনিতে কেউ কি আধাআধি বখরা ছাড়ে। কখনো চেয়ে বসবে সবটাই, মোদের দেবে শুধু রোসনাই খরচ। আমরা যেন কলুর বলদ।

"তবে যাও কেন?" প্রশ্ন করে হাসেনা।

"যেতে হয় বাধ্য হয়ে, ডাকাতকে কি কেউ কাজে নেয়। এ বড় ভীষণ দাগা।" খিঁচখিঁচে বদ রক্তের মত জমে থাকা কথাগুলো বলে কিছুটা হালকা হতে চায় সিদ্দিকি।

চাপা অসন্তোষ এবং দুঃখে স্বরটা ভারী হয়ে আসে "কি জানিস ওরা শয়তান, মানুষের জাত নয়। গতবারের জেলটা তো বড়বাবুর জন্যি। ডাকাতি করতেও পাঠালে আবার জেলখানাতেও ঢুকালে। মেয়ের বিয়ের জন্যে বাইশভরি সোনার চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঘটল আন টানাটানি। কাছেপিঠে সব লোকই তো চোট খেকো। কোথা পাব এ্যাতো মাল। শেষে বড় বাবুর রাধুনি উড়িয়া বামুনের সুপারিশে যেতে হল বালেশ্বরে। মাল জুটল ঠিকই কিন্তু খদনু জখম হল। ওকে বাঁচানোর জন্যে রাখনুন কিছু। ওতেই গোঁসা। মুই নাকি আরও সোনা গায়েব করেছি। নাও কথা, ধাপ ধাড়া গোবিন্দপুরের উটকো একটা কেসের আসামি করে পাঠালে হাজত ঘরে। সেখেন থেকে জেলে। ও শালা যদি বদলি হয়ে না যেত দেখে নিতুন একবার। মোদের নিয়ে বাঁচবে আবার উলটে চোখও রাঙাবে।"

স্বামীর কথাগুলোর উত্তাপ অনুভব করে হাসেনা। পুলিশের লোকের উপর রাগে জ্বলে উঠে বলে, "শুধুই বড়াই করতে পার, শায়েস্তা করতে পার না জাহান্নেমেগুলোকে।

ম্লান হাসে সিদ্দিকি। "তা কি হয়, ওরা সরকারের লোক। তা না হলে শয়তানগুলো মোর এক রেতের জলখাবার। ওরা কি কাউকে ভাল হতে দেবে।"

"যারা এমন ব্যাভার করে তাদের ছেড়ে দেবে? ওরাও তো ডাকাত, সরকারের নোক তো কি হবে?"

"তুই মোর মগজটারে ওলট পালট করে দিচ্ছিস। ওদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে কে?" সিদ্দিকির রাত্রির মত মুখখানায় রুদ্ধ প্রতিহিংসা বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে।

স্বামীকে বেশি ঘাঁটাতে সাহস করে না হাসেনা। কখনও মিথ্যে বলতে শোনেনি একটি কথাও। শুধু স্বভাবে একটু বেশি রকম বুনো। এই বন্যতাই ওকে আকৃষ্ট করে বেশি। অগাধ আস্থাও রাখে, কারণ বড় মন, বড় ছাতির পরিচয় ও পেয়েছে বিয়ের আগে থেকেই।

সেই রাত, মিশমিশে রাত। গোটা বাড়ি জেগে উঠল বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দে। বিরাট একটা ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতেরা ভাঙছে সদর বাড়ির দরজা। শব্দ উঠছে দমাস্ দমাস্। রঙমশালের আলোয় আশমান লাল। বেপরোয়া হাতবোমাগুলো সশব্দে আছড়ে পড়ছে রাস্তার উপর। বাইরের কোন লোক এগিয়ে আসতে সাহস করছে না। সবাই যেন ভয়ে ঢুকে পড়েছে মুরগীর খোল্লায়। আরও আতঙ্ক বাড়াচ্ছে মাঝে মাঝে বন্দুকের ফুঁকো আওয়াজ। প্রতি রস্তার মোড়ে রণ দিচ্ছে চারজন করে। এগোয় কার সাধ্যি। দোতলায় বারান্দা থেকে প্রাণপণ চিৎকার করে তখনও গাঁয়ের মানুষদের ডাকছিল হাসেনা। কিন্তু বিফল সব, একটা মানুষও এল না। ওরা ঢুকল বিনা বাধায়। প্রচণ্ড মার খেয়ে কান্না থেমে গেল অনেকের, কেউ বা ভয়ে অজ্ঞান। যার যা ছিল দিয়েও নিষ্কৃতি নেই, মেরে থেঁৎলে ফেলছে এক একটাকে। হাসেনার বাবাকে ওরা দড়ি বেঁধে উঠোনে ফেলে চাবুক লাগাচ্ছিল। শেষে কোতল করার জন্য একজন

খাঁড়াটা তুলল ঠিক মাথার উপরে। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় হাসেনা ভয়ে চোখ বুঝল কিন্তু তারপরেই, — শুনল পালটা চিৎকার। এগিয়ে আসছে কিছু লোক। নতুন এক আলোর সারি। সাবর আগে মহড়া দিচ্ছে সিদ্দিকি আর ওর বাবা ইয়াকুব।

ওদের সর্দার বাইরে কান পেতে কি যেন শুনল। তারপরেই ভীষণ ত্র্যস্ততা। "এ শালা মাছি লাগে গা। জলদি ভাগো।"

মুহূর্তের মাঝে উধাও হল গোটা দল। সব কিছু নিয়ে গেলেও তবু পেরাণে বাঁচল বাড়ির মানুষগুলো। এ উপকারের প্রতিদান দিতে কয়েকমাস পরে হাসেনার বাবা হাসেনাকে তুলে দিয়েছিল সিদ্দিকির হাতে। বেজায় খুশি হয়েছিল হাসেনা। এমন ছাতিওয়ালা পুরুষই সে চায়।

মশালের আলোয় সিদ্দিকির সেই ছবিটা আজও ভুলতে পারেনি হাসেনা, জীবনভোর পারবেও না। কিন্তু আজ তারা কোথায়? এই ভাবেই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে, সংসারের হাল ফিরবে কবে। লুটে আনা টাকার পাঁচ দশ বিশ অনেককেই দিয়েছে, কী উপকার হয়েছে তাতে। যেমনি তাঁতিপাড়া, তেমনি কশাইপাড়া। চোখের পানি বন্ধ হল কি। দেশে বড় বড় রাস্তা হল, বিদ্যুতের আলো এল, ফোন হল, আরও কত কি হল কিন্তু তাদের জগতের কোন পরিবর্তন দেখতে পায়নি এই বত্রিশ বছরের জীবনে।

তবুও সন্দেহের দোলাতেই প্রশ্ন করে, "অবস্থা ফেরার কথা একটু আগে বলছিলে, সে আবার কেমন করে? মুই আঁচাত নারি।"

"তুই অবিশ্বাস করিস হাসেনা, তোরা বুক ধরলে মোরা কিন্তু পারি। যেখানেই দেখব মিসমার হচ্ছে সেখানেই হানা দেব মোরা।" সিদ্দিকির চোখে মুখে জেগে ওঠে আশ্চর্য প্রত্যয়।

"বিশ্বাস তো করি গো, কিন্তু ডাকাত দল দিয়ে মানষের অবস্থা ফেরাবার কথা মোর জনমে শুনিনি।" আপন হাসিতে গড়িয়ে পড়ে হাসেনা।

"তুই হাসছিস্, এই ভাবে বাঁচতে তোর ভাল লাগে?" কিছুটা দমে যায় সিদ্দিকি।

"মুই চেয়েছিনু মানুষটারে, তার অবস্থার কথা তো ভাবিনি।"

"ও তাই বল।" ভালবাসার প্রদীপটা হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠে সিদ্দিকির মুখের উপর। "সে ঠিক আছে, একদমই যখন তোর মন নারাজ, তখন ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে ঘরে থাকব মুই। সামান্য ঐ জমিটুকুন চাষ করব, জন মজুর খাটব। রিক্‌শা চালাব, চলবে না?"

"কি বলো গো, একবেলা উপোস করলেও ভাল থাকব মোরা।" খুশিতে উপচে ওঠে হাসেনা। "বল, সত্যিই ডাকাতি ছাড়বে?"

"হাঁ রে হাঁ, সিদ্দিকি কি মিথ্যেকথা কয়।" ধীর স্থির সিদ্দিকি। শুধু ওর ছায়াটা দেওয়ালের উপর কয়েকবার কেঁপে ওঠে।

এ সব লক্ষ্য করে না হাসেনা, উচ্ছ্বাসে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে। "বড়পীরের কাছে মোর সিন্নি মানত সার্থক হল গো। মুই যে কতবার জাইনেছি।"

সেই রাতে নতুন সরু চালের পিঠে করে স্বামী এবং ছেলেদের পেট ভরে খাইয়েছিল হাসেনা। আধলা মুরগীটার রসুই বানাতেও ভোলে নি। জীবনে সে এক নতুন রাত। সোয়াদে তুলনা করা যায় না আর পাঁচটা রাতের সঙ্গে। স্বামীকে অপবাদের বোঝা আর বইতে হবে না। দুঃখের ভাত সুখ করে খাবে, তাতে কি? অনেক দেখেছে হাসেনা, ডাকাতির টাকা এলে দু'চার দিন লবর চবর, তারপর যখন জেল খাটতে যায় তখন পেট চালাতে কারুর বউ তৈরি করে চোলাই মদ, আর কেউ নেয় গোবর কুড়োনির কাজ। এর থেকে এক মুঠো ভিজে ভাতে দিন কাটলেও অনেক সুখ, পোলাও বিরিয়ানির আশা করতে যাবে কেন?

আলতো করে পিঠের উপর আঙুলগুলো বুলিয়ে দিতে দিতে হাসেনাকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে সিদ্দিকি বলেছিল, — "দ্যাখ, কসম্ যখন খেয়েছি তখন আর ডাকাতি করব না মুই। মোর কি কাজের অভাব হবে। শেষ পর্যন্ত কোলাঘাটের করাত কলে চলে যাব। কিন্তু কি জানিস পুলিশের লোক ভীষণ খারাপ। গোটা দলকে লেলিয়ে দেবে পিছনে। কিছুতেই ছাড়বে না কাউকে।"

"না গো না, তুমি অত ভাবছ কেন। তাদেরও মাগ ছেলে আছে। সবার উপরি খোদা।"

সিদ্দিকির ম্লান হাসিটা অন্ধকারে দেখতে পায় না হাসেনা। তবু বুঝতে পারে ঐ বিশাল বুকটাতে কি যেন আতঙ্ক এখন থেকেই উঁকি দিচ্ছে।

"ছেলেপিলেগুলো মানুষ করতে পারবি তো হাসেনা, বল রে, মাঝে মাঝে মোর ভীষণ ভয় করে।"

স্বামীর কথায় চমকে ওঠে হাসেনা। "ছিঃ, কি যা তা বকছ, অমন সর্বনেশে কথা কইতে আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে আল্লার দোয়ায়।" মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দেয় হাসেনা।

"ঠিকই বলেছিস, আল্লার দোয়া, মুই এমনি করে কোনদিন ভাবিনি রে। ভুলেই গেসনু মজিদের ধাপ ভেঙ্গে নমাজ পড়তে যাওয়ার কথা। এ খোদারই দোয়া, না হলে আজও ডাক ছিল বাইরে যাবার। ভীষণ ঘেন্না করল। তাড়িয়ে দিলাম ওদের। মহম্মদ খাঁ সাসিয়ে গেল যাবার সময়। বয়েই গেল, তোরে আমি তোয়াক্কা করি না।"

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসেনা তার খেয়াল নেই। মাঝ রাতে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাল সিদ্দিকি। কানের কাছে মুখটা এনে চাপা গলায় বলল, "শব্দ করিস্ না, মোদের বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে শালারা। বাইরে ফিস্‌ফাস শব্দ শুনতে পাস্ না? কিছু একটা ঘটিয়েছে মহম্মদ খাঁ।"

"সে কি!" তখনও ঘুমের ঘোর কটেনি, সেই সঙ্গে বিস্ময়ের। ধড়্‌পড়্ করে উঠে বসে হাসেনা।

মাঝে মাঝে টর্চের আলোয় চমকে উঠছে চারপাশের অন্ধকার, বুটের আওয়াজে গম্ গম্ করছে। এ রকম ঘেরাও এর সঙ্গে অপরিচিত নয় সিদ্দিকি।

"এ শালা সিদ্দিকি, বিবি ছেড়ে বাইরে আসতে এত দেরি কেন?" গলা ছেড়ে বেশ জোরের সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণ জানালেন থানার মেজ বাবু চিত্ত মিত্রির।

বাইরে হঠাৎ যেন হাসির বান ডেকে গেল।

জেগে উঠল নসু কোলের মেয়েটাও। তাকিয়ে রইল বাপের মুখের দিকে।

"শোন হাসেনা, আর ধরা দেব না মুই। জান যায় সেও বি আচ্ছা।"

মাত্র কয়েকটি কথা। তখনও শব্দটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের চাল ফুঁড়ে আধখানা দেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সিদ্দিকি।

কিন্তু পালিয়ে যেতে পারল না, টর্চের আলো পড়ল ঘরের চালে। সেই দিকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে উঠল বন্দুকের নল। "হ্যাণ্ডস আপ, এক পা নড়লে বের করে দেব ম্যাজিক দেখানো।"

বিকট হাসিতে কেঁপে উঠল স্তব্ধ রাত। "মুই ধরা না দিলে ধরে কোন শূয়োরের বাচ্চা।"

ঘরের ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হাসেনা, "তোমরা মোর বাপ, ওরে জানে খতম করনি গো।"

কিন্তু ততক্ষণে চাল থেকে লাফিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিয়েছে একজনের বন্দুক। ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাতের শের, "মরবার আগে এক শয়তানকে নেবই। আজেবাজে খিস্তি ছাড়লে সিদ্দিকি সেখ জানের পরোয়া করে না।"

সবাই হতভম্ব, ভীতও। গভীর নিস্তব্ধতায় যেন ভীষণভাবে জেগে রইল কতকগুলি আতঙ্কিত প্রাণ। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কাজ হল রঘুনাথ কনষ্টেবলের কথায়, "আমার কথা রাখ সিদ্দিকি, তুই ধরা দে না বাবা। অকারণ রক্ত ঝরিয়ে কি লাভ।"

ভিতরে কান্না, বাইরে রঘুনাথের আদেশ, কোনটাকেই অবহেলা করতে পারে না সিদ্দিকি। রঘুনাথের কথা শুধু সে কেন, কোন মানুষই অমান্য করতে পারবে না। এমন আত্মভোলা মানুষ দুনিয়ায় কটা, ডাকাতকেও কজন এমন ভালবাসা দিতে পারে। ঘুষ নেয়নি কোনদিন, বরং দুঃখের কথা শুনতে শুনতে চোখ মোছে। তবুও বলে এ সব ছেড়ে দিলে মানুষ ভাল হবে। কি অগাধ আত্মবিশ্বাস এবং মানুষের উপর বিশ্বাসও কম নয়।

রঘুনাথের কথা স্বামীর কাছ থেকে শুনেছিল হাসেনা। পা দুটো জড়িয়ে

ধরে, "তুমি মোর বাপ্, দেখো বাবা যেন খারাবি না করে।"

"নিয়ে চোল মোকে, কিন্তু গাল দেবে না।" বন্দুকটা নামিয়ে রেখে হাত তুলে সিদ্দিকি।

যাদু করে দিল সিপাইটা, অবাক সেকেন্ড অফিসার। তখনও বাক নেই মুখে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল হাসেনা, "বাবু, মুই কসম খেয়ে বলতে পারি ওকে তো কোথাও যেতে দিইনি।"

ঘেন্নায় নাক সিঁটকে ধমক দিলেন মেজবাবু। "চুপ কর বিবি। সব যেন জেনে বসে আছিস। ডাকাতি করার জন্য জয়পুরে দল পাঠালো কে? ডাকাতের হয়ে সওয়াল করলে তোকেও বাঁধবো।"

প্রতিবাদ করতে গিয়েও স্বামীর চোখের নিষেধে থেমে গেল হাসেনা।

সেই দিকে লক্ষ্য করে হাসলেন মেজবাবু। তারপরই পিস্তল উঁচিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন সবাইকে।

যাবার সময় ক্লান্ত চোখে তাকাল সিদ্দিকি, "ঘরে যা হাসেনা, মুই হেরে গেলাম রে।"

ভোরের শিশির তখনও ঝরছে রাং চিতার বেড়ার উপর। ধোঁয়াটে রাস্তায় অন্ধকার আরও ঘন। ওরা মিলিয়ে গেল।

সেই থেকে আজও ছাড়া পায়নি সিদ্দিকি। কবে পাবে তাও জানে না হাসেনা। বছর ঘুরলে একবার জেলে দেখা করতে গিয়েছিল। দেখা হয়েছিল অনেক কষ্টে, থোক চার টাকা বকশিস্ দিয়ে। দেখা করার সময় আসতে মানা করেছিল সিদ্দিকি, "বড় বেআক্কেলে জায়গা, কেন এখানে এসেছিস তুই।"

কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়, হাজারটা শয়তানি চোখ যেন গিলতে আসছে চারপাশ থেকে। লজ্জা শরম বলতে কিছু নেই। তার উপর গা টেপাটেপি করে হাসাহাসি।

স্বামীর কথা ঠেলে আর যায়নি হাসেনা। সেই থেকে ঘুরে গেছে তিনটে বছর, কোন খবর নেই, কেবল গেল পরবে একটা চিঠি এসেছিল।

মৌলভী সাহেব চিঠি পড়ে বলেছিল হয়ত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেতে পারে সিদ্দিকি। দিনক্ষণ না জানলেও সেই আশাতে দিন গুনছে হাসেনা।

কিন্তু এক এক করে কতদিন পার হয়ে গেল। শুধু চিন্তা, আর চিন্তা। কবে সে ফিরবে। ঝোড়া হাতে গোবর কুড়োচ্ছে হাসেনা। এতে লজ্জা নেই, দুঃখু হয় শুধু ছেলেপিলের জন্যে। প্যান্ট জামার অভাবে ওরা ঘুরে বেড়ায় ল্যাংটা ফকিরের মত, নিজেরও আব্রু রাখা দায়। এত কষ্টেও বুক বাঁধে, ভাবে এ দিনের শেষ হবেই। রোদে ঘুরতে ঘুরতে মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে। ছায়ায় এসে জিরোতে হয় বাধ্য হয়েই। আপন মনেই হাসেনা হাসে, জেল থেকে এসে যা রূপ দেখবে মোর, এসেই না চোখ কপালে তুলে।

হাসেনা দেখল রাজনৈতিক মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্যে গাঁয়ের পথ ধরে দলে দলে মানুষ শহরের দিকে চলছে গনগনে সূর্যের নীচে দিয়ে। শুকনো পাতার মত চোখ, ফাটা মাঠের মত বুক নিয়ে ওরা চলছে, হাতে পোষ্টার, মুখে মিনে মিনে শ্লোগান। "অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। শোষকের কালো হাত ... ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।" ...... এসব কথার অর্থ বুঝতে পারে না হাসেনা। গোবরের ঝোড়া মাথে ল্যাংটো নসুর দিকে তাকায়।

মিছিলের পরিত্যক্ত একটা কাগজের ফ্ল্যাগ নিয়ে ফিরে আসছে নসু। মুখে উলঙ্গ সূর্যের হাসি। "মা, ওরা যাচ্ছে কোথায়? শুনলাম এই যাওয়ার জন্য চার কিলো করে গম দেবে।"

"যাচ্ছে জাহান্নেমে, তুই পালিয়ে আয়। আদা ব্যাপরীর বেটা, অত জাহাজের খবর কেন?"

ছেলেকে নিয়ে বকতে বকতে বাড়ির দিকে রওনা হয় হাসেনা। মাথাটা সমানে দপ্ দপ্ করে। সকালে বেচেছে চার ঝোড়া ঘুঁটে। পাওনা টাকায় পাঁচশো আটার চারটে প্রাণীর দানাপানি। এ ছাড়া তার আর কি করার আছে। যার বোঝা সেই বইবে ঘরে ফিরে, কিন্তু তার আগে গোরে গিয়েও শান্তি নেই।

ঘরে ফিরে অবাক হয় হসেনা। এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। গোবরের ঝোড়াটা নামিয়ে রেখে ছুটে আসে "ও নসু ছুটে আয়, দ্যাখ রে কে এয়েচে।

তোর আব্বা।”

আনন্দে বেদনায় হাসেনার দু'চোখে আষাঢ়ের ঢল। রোদ্দুর যেন মেঘ ঠোঁটে করে হাসছে।

হাসে সিদ্দিকি। “খুব অবাক হলি যে বিবি, মনে করেছিলি মুই আর ফিরব না। দু মাস আগেই ছাড়া পেলুম বাবুর দোয়ায়।”

একবার কাছে এসেই আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকাল নসু। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকে যেমন দ্যাখে ঠিক তেমনি ভাবে।

আদর করে ডাকল সিদ্দিকি। “বেটা কি মোকে ভুলে গেলি নাকি।”

কোন কথা না বলেই ছুটে পালাল নসু, হাতে সেই কুড়িয়ে পাওয়া পোষ্টার।

সব কথা হারিয়ে ফেলেছে হাসেনা। নির্বাক, নিথর, শুধু তাকিয়ে রইল মুখখানার দিকে। চোখগুলো কেমন ঢোকা ঢোকা, মাথার অর্ধেক চুলে পাক। বয়স যেন বেড়ে গেছে দশটা বছর। সেই মানুষটাকে যেন আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

পুরানো স্মৃতি মনে করে জিজ্ঞাসা করে হাসেনা, “ওরা আবার আসবে নে তো?” সেই রাতের আতঙ্ক নতুন করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখে। রাতে কোনদিন বের হব না। এখানের থানার কথা জানাতে বাকি রেখেছি নাকি। জেলবাবু কথা দিয়েছেন, আঁচড়টি কাটতে পারবে না ওরা।”

“মুই কিন্তু এ যুগকে বিশ্বাস করতে পারিনি।” স্বামীর কথাতেও প্রত্যয় জন্মে না হাসেনার।

রান্না ঘরের আগল খুলে দুটো মুরগীর এ্যাণ্ডা এনে সিদ্ধ করতে বসে। ও গুলো বেচে চলত সন্ধ্যাটা। ছেলেদেরও চোখ রাঙিয়ে রেখেছিল উপোস বাঁচাবার জন্যে। আজ আর সে প্রয়োজন নেই।

ডিমের লোভে কলিম বাপের কোল ঘেঁসে বসে। কানের কাছে মুখটা এনে চুপি চুপি জানায়, “দ্যাখো ঐ ডিম মোদের খেতে দ্যায় নি একদিনও।”

হো হো করে হেসে ওঠে সিদ্দিকি। “দূর বেটা, মুরগী এ্যাণ্ডা পাড়লে

এবার থেকে রোজ খাবি।”

চোখ কপালে তুলে কালিম। “মুরগী মোদের আছে নাকি! কালো মাদিটাও বেচে দিলে জ্বরের ওষুধ কিনতে।”

ঝাঁট দেওয়া বাঁশ পাতার আগুনে ফুঁ দেয় হাসেনা। একরাশ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে চোখের জল।

“কি এনেছি দ্যাখ।”

অতবড়ো একটা ইলিশ সামনে দেখে প্রথমটা আশ্চর্য হলেও রাগে ফেটে পড়ে হাসেনা, “ঘরে চাল নেই, নুন নেই, ইলিশটা রাঁধব কি দিয়ে?”

“চটিশ কেন তুই। জেলে কি এ সব দ্যায়।” আনন্দে হাসিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

“বাদশাহী চাল তো ঠিক আছে, আর কি আনলে দাও।”

“আবার কি আনব রে, টাকা কোথা! বারো শালাকে দিতেই সব শেষ।”

“হাসেনা অবাক হয়ে গালে হাত রাখে, “হায় আল্লা। চাল মেঙে এনে ইলিশ রাঁধতে হবে।”

অভিযোগ করলেও শেষ পর্যন্ত হাসেনা পাড়ায় চাল ধার করতে বেড়িয়ে পড়ে।

সিদ্দিকি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কলিমকে নতুন করে দেখায় ইলিশটা, “বাব্বা, তোর মা রেগেই আগুন, ভাল করে একবার দ্যাখ দিকিন।”

আকস্মিক ভাবেই বাড়িতে ঢুকে খুরসেদ মিঞা। কথায় আত্মীয়তার নিবিড় স্পর্শে সিদ্দিকি গলে যায়। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি সব বলে। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা হাসি। সে হাসি অবিশ্বাসের বেড়া ভেঙ্গে দিতে পারে।

রাগে লজ্জায় সিদ্দিকি ফুলতে থাকে, “ওকে আমি আজই তালাক দেব। কোন বাপের বেটা রুখতে পারবে না মোকে। দেখে নিও, ও মাগীকে মুই ভিটে ছাড়া করবই।”

"মুইও তাই বলি, এজ্জোতের দাম বাড়া। যা ভাল বোঝ কর, চললুন এখন।" তেমনি হাসতে হাসতে বিদায় নিল খুরসেদ মিঞা।

এই তিনচার বছরে কারও কাছে হাত পাতেনি হাসেনা। যায়নি অবস্থার কথা মনে রেখে। আজ অনেক আশা এবং সাহস নিয়ে চাল ধারে আনতে গিয়েছিল। বিফল হয়নি। দুদিন পরে টাকা শোধ দেবার প্রতিশ্রুতিতে পেয়েছে এক কেজি চাল। একেই বলে মানুষ ঘরে থাকার এমনি দাম। অন্য সময় হলে কেউ দিত না। চাল নিয়ে হাসেনা হাসি মুখে বাড়ি ফেরে।

হাসেনাকে দেখেই ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠে সিদ্দিকি। "এই মাগী তুই সত্যি করে বল তোর পিরিতের নাগর কটা। সত্যি কথা না বললে উঠোনেই মুখটা থুবড়ে দেব।"

"কি যা তা বকছো তুমি, তোমার কি মান ইজ্জতের ভয় নেই!" স্বামীর ভয়ংকর মূর্তির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় হাসেনা।

"ইজ্জতের ভয় থাকলে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াস্।"

"কি রেখে গিয়েছিলে আমাদের জন্যে খেয়াল নেই। সরম থাকলে কেউ এভাবের কলঙ্ক দেয়। সারা কুশপাতায় এমন একজনও নেই যে আমার নামে কলঙ্ক দিতে পারে।" চেঁচিয়ে ওঠে হাসেনা। কাঁপতে থাকে সমস্ত শরীর। চালগুলো মাটির উপর পড়ে যায়।

ছুটে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মারে সিদ্দিকি। "তোকে তালাক দেব, খুন করব মুই। তুই বেইমানি করেছিস মোর সাথে, তোর সব কাহিনি মুই জেনে গেছি।

কান্নায় ডুকরে ওঠে হাসিনা, "মার না যত ইচ্ছে, মার। হারামি না হলে বিনা দোষে কেউ অমন করে লাথি মারে। যে মুখপোড়া আমার নামে বদনাম দেয় তার মুখে মুইও লাথি মারি।"

"লাথি মারবি, আজ থেকে তোকে তালাক দিনুন মুই, আল্লার কসম।" বেজায় জোরে চেঁচিয়ে ওঠে সিদ্দিকি।

"মেরে ফ্যালো সে ভালো কিন্তু বেল্লিকের মত অমন কথা বলবে না

আর। নিশ্চয়ই ঐ লোভী শয়তান খুরসেদ মিয়ার কাজ। সুযোগ বুঝে কান ভারী করে গেছে। বেশ আমি চলে যাচ্ছি, তুমি বাচ্চাদের নিয়ে সুখে থাকো।"

মা চলে যাচ্ছে দেখে নসু এবং কলিম ছুটে আঁচল ধরে ফেলে।

চরম অভিমানে অন্য মূর্তি ধরে সিদ্দিকি। "আবার ডাকাতি করব, জেল খাটতে যাব। আর কোন দিন ঘরে ফিরব না। চললুন মুইও।" কথাগুলো বলতে বলতে চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

কান্না থামে না হাসেনারও, "যাও না যেখানে খুশি, তোমার সুখের পথে কোনদিন কাঁটা হয়েছি কি? মোর আল্লা জানে গো, ছেলেদের নিয়ে কী ভাবে দিন গেছে সে আল্লা জানে। আমি মজিদে ঢুকে আল্লার নামে বলতে পারি মোর চরিত্রে কালি নেই।"

বিবেক ফিরে পায় সিদ্দিকি, "যাস্‌নি কোথাও, যা ঘরে যা।"

"আর তো বিবিকে ঘরে রাখতে পার না মিয়া। তুমি তো তালাক দিয়েছ। আমি শুনেছি, সবাই শুনেছে।" মিটি মিটি হাসতে লাগল খুরসেদ মিয়া।

এবার শিরাগুলো ফুলে উঠল সিদ্দিকির, "রাগের মাথায় তালাক দেওয়া কখনো সত্য হতে পারে না শয়তানের বাচ্ছা।" ছুটে গিয়ে টুঁটিটা ধরল, "আমাকে দিয়ে বাজে কথা বলানোর চক্রান্ত করেছিলিস্‌ নয়, এখন তার ফায়দা তুলতে এসেছিস্‌। সেটি হচ্ছে না জেনে রাখ, তোর মুখ দেখতে চাই না। আমরা গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। যাবার আগে শুনে যা, "শাস্ত্র মানুষকে বাঁচার পথ দেখায়, গোরে যাবার পথ দেখায় না।"